১৯৭১

উত্তর রণাঙ্গনে

বিজয়

আখতারুজ্জামান মন্ডল

১৯৭১ উত্তর রণাঙ্গনে বিজয়

আখতারুজ্জামান মন্ডল

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

উৎসর্গ

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ আব্দুল আজিজ, আব্দুল খালেক, লেফটেনান্ট সামাদ, মিত্রবাহিনীর মেজর জেমস এবং সম্প্রতি দুর্ঘটনায় নিহত মুক্তিযোদ্ধা রওশন-উল-বারীসহ সকল শহীদদের উদ্দেশে

লেখকের কথা

বহু বছরের জুলুম-নির্যাতন, আর পর্যায়ক্রমে সংঘটিত আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের পরিণতিতে ঊনিশ বছর আগে ঘটে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধের গৌরবান্বিত দিনগুলো উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করছে। বারে বারে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় সেই ভয়াল আর গৌরবের সমাচার পর্ব-একাত্তরে। চোখ বন্ধ করলেই মনে হয় আমি যেন সেই একাত্তুরের দিনগুলোর প্রান্তে। কি ভাবে, কোন্ প্রত্যাশার আলো জ্বালিয়ে চলে গেল সেই দিনগুলো। বার বার প্রশ্ন জাগে, স্বাধীনতা, তুমি কি স্বাধীনতা, না মরীচিকা? এই কয়েকটি বছরে কোথা দিয়ে কি যেন হয়ে গেল! এলোমেলো হয়ে গেলো সবকিছু! কারো অবদান কেউ স্বীকার করে না। মিথ্যের বেসাতির পর বেসাতি করে ক্রমাগত সত্য থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি আমরা। আর বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে ছটফট করে কাটাচ্ছি দিন। কেননা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে তিলে তিলে, ক্রমান্বয়ে মুক্তিযুদ্ধ এসেছে। আর সেই মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র-কৃষক-খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। হানাদার পাকিস্তানী সামরিক জান্তা অতর্কিতে বাঙালি হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে প্রথমত সীমান্তে ই.পি.আর বাহিনী এবং পরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কিছু বাঙালি সদস্য ও অফিসার প্রতিরোধ গড়ে তুলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি ছাত্র এবং কৃষক সমাজও ব্যাপকভাবে এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধ-কৌশলের স্বল্প প্রশিক্ষণ নিয়ে লড়াইয়ের যে কিংবদন্তী কাহিনী, বাংলার মানুষ ঘরে ঘরে আজো তা স্মরণ করে থাকে। কিন্তু চরম পরিহাসের ব্যাপার এই যে, ইতোমধ্যে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যে সব ইতিহাস লেখা হয়েছে এবং '৭৫ সালের পর থেকে যেসব প্রচারণা চলেছে, তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কেবল ইউনিফরম্ পরিহিত সাথী বন্ধুরাই যেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রধান কৃতিত্বের দাবীদার। দামাল ছেলেদের রচিত ইতিহাসকে উপেক্ষা করে বাস্তব সত্যকেই পাশ কেটে যাওয়া হচ্ছে। এলাকাভিত্তিক কোন ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা এখনো নেয়া হয়নি। এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলে নিশ্চিতই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তথ্য সমৃদ্ধ এবং পরিপূর্ণতা লাভ করতো। আমি, রওশন, আমিনুল ইসলাম, মঞ্জু মন্ডল ও আব্দুল কুদ্দুছ নানু ভাই এবং কিছুকাল পর ই.পি.আর হাবিলদার আনিস মোল্লা কুড়িগ্রাম মহকুমার (বর্তমানে জেলা) বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ও তার সক্রিয় পরিচালনায় শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেলেও এই এলাকার একাত্তরের সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোর কথা কেউ কালো অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে রাখলো না। ভেবেছিলাম, সরকারিভাবে অন্তত এই ইতিহাস

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লেখা হবে, লেখার প্রয়াস নেয়া হবে, কিন্তু তা স্বপ্নই রয়ে গেলো। যেহেতু আমি জীবন বাজি রেখে এই মরণযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম, সেহেতু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের এই অঞ্চলের মহান দিনের ঘটনা লিখে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন মনে করলাম। তা না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই আমাদের ক্ষমা করবে না। এ ছাড়া ভেতর থেকে একটা কর্তব্য বোধের তাড়া একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় নিক্ষেপ করে আমাকে অহরহ অশান্ত করে চলেছিলো। আমার অন্তর-গভীরে গুমরে ওঠা সেই যন্ত্রণারই ফসল সহজ-সরল ভাষায় লেখা এই গ্রন্থ।

আমার এই রচনার সূচনাকালে অনেকেই আমাকে সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সর্বজনাব শামছুল হক চৌধুরী, ফ্লাঃ লেঃ (অবঃ) ইকবাল রশীদ, নিজামউদ্দিন আহমেদ, খায়রুল বাসার এবং এ.কে.এম. শামছুদ্দিন আহমেদ। এছাড়া আমাদের সেক্টর কমান্ডারের স্ত্রী মিসেস এম. কে. বাশারও আমাকে প্রেরণা ও কয়েকটি ছবি দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখার প্রয়াসকল্পে জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মফিদুল হকের সহযোগিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই বইটির বানান ও ভাষাগত সম্পাদনা করেছেন সুলেখক জনাব আখতার হুসেন। এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি পেশাদার লেখক নই, তবু আমার এই সামান্য প্রয়াস পাঠক সমাজে সমাদৃত হলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

মহান আল্লাহর দরবারে হাজারো শুকরিয়া। জয় বাংলা। জয় বাংলাদেশ।

ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ আখতারুজ্জামান মন্ডল

৬ সেক্টরের রণাঙ্গন ১৯৭১
সাংকেতিক চিহ্ন
মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান
পাকিস্তানী নরপশু বাহিনীর অবস্থান
আন্তর্জাতিক সীমারেখা
জেলা সীমারেখা
উপজেলা সীমারেখা
জেলা সদর
উপজেলা সদর
রেলপথ
পাকা সড়ক
কাঁচা সড়ক
নদী
তেতুলিয়া
ভারত
পঞ্চগড়
আটোয়ারী
বোদা
ভারত
বালিয়াডাঙ্গি
ঠাকুরগাঁও
দেবীগঞ্জ
রাণীসংকাইল
পীরগঞ্জ
বীরগঞ্জ
খানসামা
হরিপুর
কাহারোল
বোচাগঞ্জ
দিনাজপুর
বিরল
চিরিরবন্দর
ভারত
হলদিবাড়ী
পাটগ্রাম
ডিমলা
ডোমার
জলঢাকা
নীলফামারী
কিশোরগঞ্জ
সৈয়দপুর
তারাগঞ্জ
বদরগঞ্জ
পার্বতীপুর
ফুলবাড়ী
নওয়াবগঞ্জ
বিরামপুর
হাকিমপুর
ঘোড়াঘাট
পীরগঞ্জ
মিঠাপুকুর
হাতীবান্ধা
কালীগঞ্জ
আদিতমারী
গঙ্গাচরা
লালমনিরহাট
রংপুর
কাউনিয়া
রাজারহাট
পীরগাছা
উলিপুর
কুড়িগ্রাম
চিলমারী
রৌমারী
চররাজীবপুর
গাইবান্ধা জেলা
ভারত
শাহেবগঞ্জ
গিতালদহ
বামন হাট
ভুরুঙ্গামারী
গোলকগঞ্জ
ধুবরী
নাগেশ্বরী
ফুলবাড়ী
পানবাড়ী
গৌরীপুর
ভারত
০ ৪ ৮ ১২ মাইল
০ ৬ ১২ কিলোমিটার

গ্রাফোসম্যান

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা কোনো একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাজ নয়। মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক ও সামরিক সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অগণিত মানুষের সর্বোচ্চ আত্মদান, চরম নির্যাতন বরণ এবং জীবনবাজি রেখে দেশমাতার বন্দীত্ব মোচনের দুঃসাহসী যোদ্ধায় রূপান্তরের কাহিনী। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ ভূখন্ড জুড়ে সাধারণ মানুষ ও ছাত্র যুবার দল কোনোরকম প্রশিক্ষণ কিংবা পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই দেশের ডাকে অস্ত্র হাতে তুলে যেভাবে সশস্ত্র ও সুদক্ষ দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তা' এখন প্রায় অবিশ্বাস্য কীর্তি-কাহিনী মনে হয়। তদুপরি মুক্তির লড়াইয়ের গৌরব-স্মৃতি জাতি যেন বহন না করে, মুক্তিযুদ্ধ যেন শুধু কথার কথায় পরিণত হয়, সজীব প্রাণময় জাগর অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত না হয় সেই আয়োজনেও তো কোনো ঘাটতি নেই। মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গোটা জাতির পরম অর্জন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন বহুমাত্রিক ও ব্যাপক আয়োজন। অগণিত যোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এক মানুষ থেকে আরেক মানুষে, এক প্রবংশ থেকে আরেক প্রবংশে চালিত না করা ব্যতীত এটা অর্জন সম্ভব নয়। এই বিপুলায়তন কর্মযজ্ঞে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস সর্বতোভাবে যোগ করতে আমরা আগ্রহী এবং সেই লক্ষ্য থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে বর্তমান গ্রন্থ : বাংলাদেশের উত্তর ভূখন্ডে এক তরুণ যোদ্ধার সংগ্রামী অভিজ্ঞতার বিবরণী।

লেখক আখতারুজ্জামান মন্ডল একাত্তরের কর্মচঞ্চল ছাত্রনেতা থেকে পরিণত হয়েছিলেন পোড়-খাওয়া মুক্তিযোদ্ধায়, এবং তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুবাদে আমরা কেবল যুদ্ধজয়ের ঘটনাক্রম জানতে পারি না, পেয়ে যাই মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাসের চমকপ্রদ উপাদান। এই গ্রন্থ যে প্রত্যক্ষ বিবরণী তুলে ধরেছে আমাদের বিশ্বাস তা পাঠকদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারবে ইতিহাসের সেই উত্তাল দিনের হৃদস্পন্দন। গ্রন্থকারের মূল্যায়নের প্রয়াসের সঙ্গে কারো দ্বিমত থাকতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞতার শরীক হবেন সকলেই; এই আশাবাদ নিয়ে নিবেদিত হলো বর্তমান গ্রন্থ।

ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ — মফিদুল হক
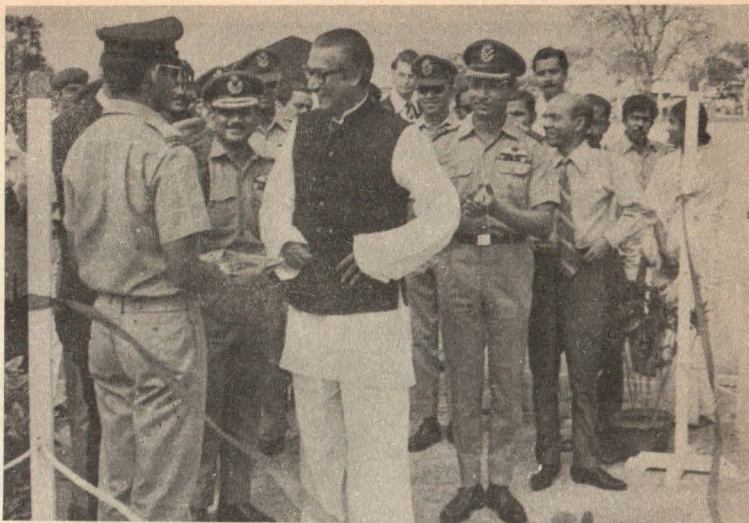
সদ্য মুক্ত স্বাধীন দেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে এম. কে. বাশার ও এ. কে. খন্দকার।

৬ নম্বর সেক্টরের হেড কোয়ার্টার পাটগ্রামের মুক্ত এলাকায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর তদানীন্তন উপ–অধিনায়ক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারের সাথে ৬ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক উইং কমান্ডার এম. কে. বাশার ও জনৈক সামরিক অফিসার।

ই.পি.আর হাবিলদার আনিস-মোল্লা
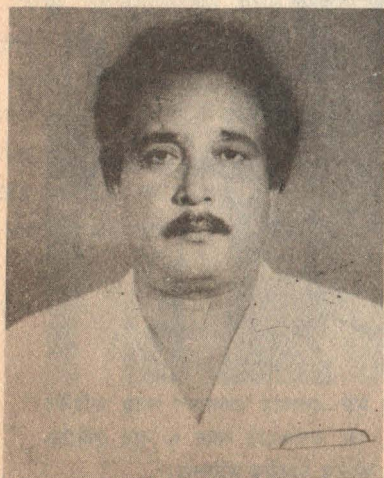
মুক্তিযোদ্ধা রওশন-উল-বারী
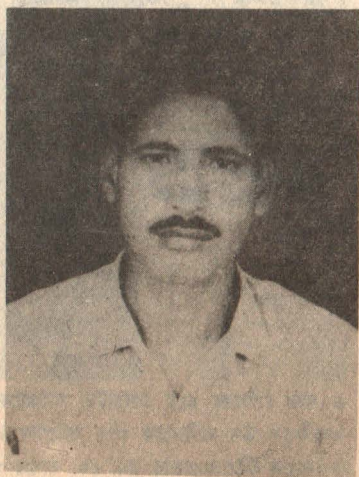
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর

লেখক/ কুড়িগ্রাম মুক্ত হওয়ার পর ধরলা নদীর পাড়ে
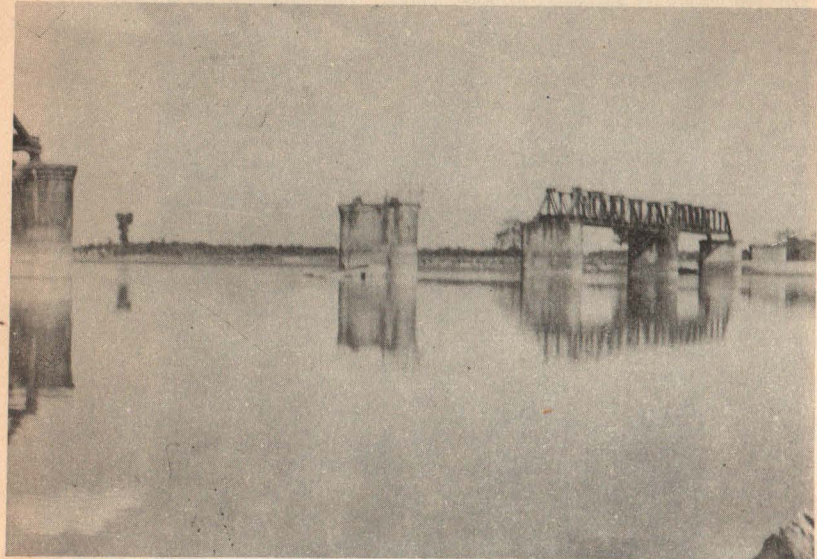
২৭ মে '৭১ ভেঙ্গে দেয়া সোনাহাট পুল

কুড়িগ্রাম মুক্ত হওয়ার পর পুরাতন রেল স্টেশনে হর্ষোৎফুল্ল মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল (লেখক মাঝখানে)।

দিনহাটাস্থ (কুচবিহার) কুড়িগ্রাম মহকুমা বি.এল.এফ-এর প্রধান ঘাঁটি।

ভুরুঙ্গামারীর মুক্ত এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটিতে ভারতীয় নেতা কমল গুহ, বাংলাদেশের নেতা এইচ. এম: কামারুজ্জামান ও অন্যরা।

শহীদ লেঃ সামাদের কবর
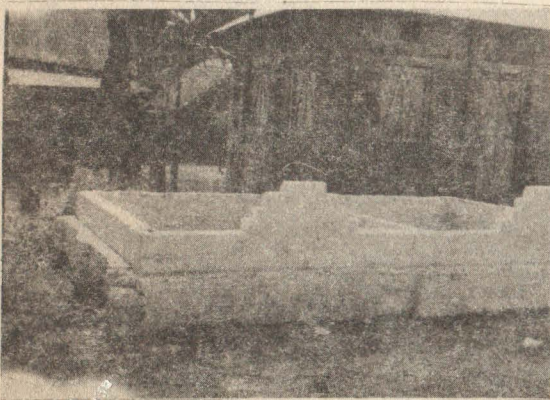
শহীদ [illegible] আব্দুল আজিজ ও শহীদ আবুল হোসেনের কবর

শহীদ মহসীনের কবর

এক
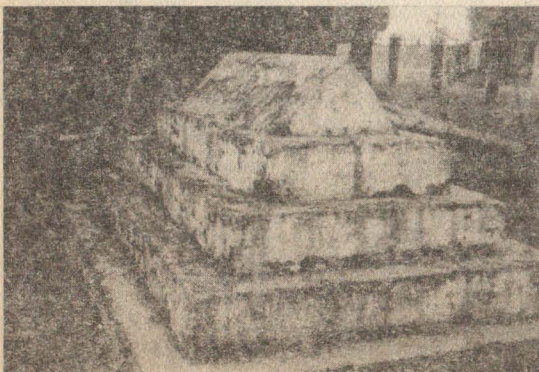
কৈশোরে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান বিপ্লবীদের কাহিনী ও আত্মত্যাগের কথা শুনেছি, পড়েছি এবং আত্মবিহ্বল হয়ে সেই সব মহানায়কদের জীবন আর ঘটনার সঙ্গে এক হয়ে গেছি। বিপ্লবীদের কথা জানতে ইচ্ছা করতো, শুনতে ভাল লাগতো। ক্ষুদিরাম, অভিরাম, বিনয়, বাদল, দীনেশ, বাঘা যতীন, রানী ভবানী, হাজী শরিয়তউল্যা, ফকির বিদ্রোহ, সন্ন্যাস বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ ও বাঁশের কেল্লার কথা, ঈসা খাঁ, মীরজুমলার বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, মঙ্গল পান্ডে, তাঁতিয়া তোপী, ঝাঁসির রানী, চট্টগ্রাম বিদ্রোহ, মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ঢাকার অনুশীলন সংঘ, রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, আসামের কৃষক বিদ্রোহ, নেতাজী সুভাষ বোস, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, ইংরেজ বেনিয়াদের নীল চাষ নির্যাতন, জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম পৈশাচিকতা, সম্রাট বাহাদুর শাহের করুণ পরিণতি, পলাশী প্রান্তরের ব্যর্থতা, কর আদায়, লুণ্ঠন, শোষণ–বঞ্চনা, ১৯৫০ সালে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের খাপড়া ওয়ার্ডে নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড--এমনি সব হাজারো অত্যাচারের নির্মম কাহিনী মনে গভীর ছাপ রাখতো আর জাগিয়ে তুলতো বদলা নেয়ার এক দুর্বার স্পৃহা।

দু'শ' বছরের ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করে অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বিশাল ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে একটি উদ্ভট দেশের সৃষ্টি হলো। এক হাজার মাইল দূর থেকে পূর্ববাংলার মনিব সেজে বসলো পাঞ্জাবি বেনিয়া চক্র। অথচ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে বাঙালির অবদান কোন অংশে কম নয়, সঠিক বিচারে অনেক বেশি। অথচ সেই পাকিস্তানের বয়স এক বছর না পেরুতেই ১৯৪৮ সালে বাঙালির প্রাণের ভাষা বাংলা ভাষার ওপর সর্বপ্রথম উলঙ্গ আক্রমণ, আঘাত এলো। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের বিজাতীয় উর্দু ভাষায় লিখতে, পড়তে ও বলতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তথাকথিত পাকিস্তানী নেতা মিঃ জিন্নাহর মুখের ওপর তরুণ ছাত্র নেতা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার দামাল ছেলেরা প্রতিবাদী কণ্ঠে গর্জে উঠলো,না–না, আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা হবে রাষ্ট্র ভাষা। আন্দোলন চলতে থাকে। নেমে আসে পাকিস্তানী নির্যাতন। ছাত্র নেতা শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হলো। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, ৮ ফাল্গুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া মিছিলে পাকিস্তানী স্বৈরাচারী সৈন্যদের গুলির আঘাতে

সালাম, বরকত, জব্বার, রফিকসহ আরো অনেক নাম না–জানা দামাল ছেলের বুকের তাজা রক্ত ঝরলো, শহীদের রক্তে রঞ্জিত হলো ঢাকার রাজপথ। মায়ের ভাষা বাংলা ভাষার জন্য মহান ইতিহাস সৃষ্টি করলো বাংলার দামাল ছেলেরা।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাংলার মানুষ রায় দিল বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু পাকিস্তানী হীন ষড়যন্ত্রের ফলে বাঙালির রায় টিকলো না। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানী চক্রান্তে স্বৈরাচারী সামরিক জান্তা আয়ুব খানের সামরিক আইনে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা হলো অত্যাচারিত, নিষ্পেষিত, নির্যাতিত।

কৈশোরের এমনি সন্ধিক্ষণে বাঙালির বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা পাকিস্তানী কুচক্রী বেনিয়াদের শোষণ, লুণ্ঠন ও অত্যাচার এবং ১৯৬২ সালে গঠিত কুখ্যাত হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্র বিদ্রোহের সাথে জড়িয়ে পড়লাম। ১৯৬৩ সালে এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তখন আমি ভুরুঙ্গামারী হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। ভুরুঙ্গামারীতে চাচা ও বড় ভাইদের সাথে থাকতাম। এই আন্দোলনে আমার সরাসরি অংশগ্রহণের পেছনে সম্ভবত আমার চাচা জনাব শামছুল হক চৌধুরী সাহেবের মৌন সম্মতি ছিল। কেননা ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

১৯৬৪ সালে স্বৈরাচারী আয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহকে নিয়ে গঠিত সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষে এই এলাকায় আমরা গণ–জোয়ারের সৃষ্টি করি। এই সময় মশিউর রহমান যাদু মিঞা ভুরুঙ্গামারীতে জনসভা করতে আসেন। জনসভাশেষে তাঁর সাথে নিয়ে আসা মেগাফোনটি (ছোট মাইক) আমাদের কাজে ব্যবহারের জন্য আমি দিয়ে যেতে অনুরোধ করি। মেগাফোনটি দিতে সম্মত না হওয়ায় আমরা প্রায় জোর করে নিয়ে সরে পড়ি। এই মেগাফোন সাথে নিয়ে আমরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের হাটে–বাজার চষে বেড়িয়ে আয়ুব শাহীর কুকীর্তি জনসমক্ষে তুলে ধরেছি এবং সম্মিলিত বিরোধী দলকে সাহায্য করার জন্য কুপন বিক্রয় করেছি। এই নির্বাচনকালে প্রথমত নাগেশ্বরীর আয়ুব শাহীর দালাল হাজী সাইফুর রহমানের আহূত ভুরুঙ্গামারীর জনসভা ভেঙে দেই। এর কয়েকদিন পর আয়ুব খানের কুখ্যাত দালাল কুড়িগ্রামের পনিরউদ্দিন আহমেদের আহূত জনসভা শুরু হওয়ার আগেই আমরা তার মাইক ও জীপ ভেঙে চুরমার করে দেই। ফলে সভা পন্ড হয়ে যায়। এ কারণে সোনাউল্যা ও অন্যান্যসহ আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করা হয়। কিন্তু ভুরুঙ্গামারী হাই স্কুলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল হক ও অন্যান্য শিক্ষকের সহায়তায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হই। দুধকুমার (সঙ্কোষ) নদী পার হয়ে ধানক্ষেত, কাশবন ও খয়ার বনের মধ্য দিয়ে পালাবার সময় আমাদের শরীর ক্ষত–বিক্ষত এবং কাঁটার পর কাঁটা বিঁধে পা থেকে রক্ত ঝরতে থাকে।

এই সময় পূর্ববাংলার মানুষের দৃষ্টি তাদের নিজেদের অধিকার আদায় ও আন্দোলন থেকে অন্যদিকে সরিয়ে নেয়ার জন্য এবং এর ভেতর দিয়ে পাকিস্তানী শোষণ–নির্যাতন বহাল রাখার জন্য সূক্ষ্ম কৌশলে পূর্ববাংলা তথা সাধের পাকিস্তানকে ভারত দখল

করছে--এ জাতীয় জোর গুজব তুলে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ভারতের সাথে হঠাৎ করে যুদ্ধ বাধিয়ে বসে। এই গুজব এবং যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা এবং বাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা প্রবলভাবে বৃদ্ধি করা। পাকিস্তানী স্বৈর সামরিক জান্তা এতে দু'ভাবে ফললাভের আশা করেছিলো। প্রথমত ভারতের প্রতি বাঙালি মুসলমানদের অবিশ্বাস সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়ত বাঙালিদের নিজেদের মধ্যে আত্মকলহে নিমজ্জিত এবং পাকিস্তানী স্বৈরাচার ও তাদের দোসরদের পূর্ববাংলায় শাসন-শোষণ বজায় রাখার পথ প্রশস্ত করা।

দুই

পাকিস্তানী শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনার নাগপাশ থেকে পূর্ববাংলার মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে লাহোর বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালির মুক্তি সনদ ছয়-দফা দাবি উত্থাপন করেন। বাংলার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দুর্বার বেগে ছুটে বঙ্গবন্ধু ছয়-দফার মর্মবাণী বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলেন। এই ছয়-দফার আলোকে কুড়িগ্রাম মহকুমার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পাকিস্তানী দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙার জন্য আমরা দুর্বার আন্দোলন গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করি।

১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে ইকবাল হলের (বর্তমানে সার্জেন্ট জহরুল হক হল) ক্যান্টিনের দোতলায় ছাত্রলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের কাছে তৎকালীন রংপুর জেলা থেকে "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের" সদস্য হিসেবে আমি শপথ গ্রহণ করি। রংপুর জেলা থেকে সম্ভবত আরো একজন গাইবান্ধার শামসুল আলম হীরু বিপ্লবী পরিষদের সদস্য ছিলেন।

১৯৬৯ সাল বাংলার হাজারো বছরের ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন উত্থানের বছর। এই বছর বাঙালি বারুদে পরিণত হয়ে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত করে। স্বৈরাচারী সামরিক জান্তা পাকিস্তানী বেনিয়া আয়ুব শাহীর পতন ঘটে। ইসলামী খোলস পরা পাকিস্তানী শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের ভিত শতছিন্ন হয়ে যায়। এই বছর ২০ জানুয়ারি ঢাকায় আসাদুজ্জামান, ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ শামসুজ্জোহা ও ২১ ফেব্রুয়ারি খুলনায় ছাত্রলীগ কর্মী হাদিসুর রহমানের বুকের তাজা রক্ত বাঙালিদেরকে পথ নির্দেশ করলো এবং সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হলো। বাঙালিরা বুকের লাল টকটকে তাজা রক্ত ঢেলে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানী হায়েনাদের বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে আনলো।

সংগ্রাম ও গণ-অভ্যুত্থানের অন্য একটি দিক ছিল পাকিস্তানী প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দেয়া, হয়েও ছিল তাই। আমরা কুড়িগ্রাম মহকুমার রৌমারী থেকে ভূরুঙ্গামারী পর্যন্ত প্রশাসন অচল করে দিয়েছিলাম। সমগ্র পূর্ববাংলায় আয়ুব শাহী প্রশাসন অচল হয়ে

গিয়েছিল। পুলিশ, ই.পি. আর, সরকারী কর্মচারি ও কর্মকর্তাদের শতকরা ৯০% ভাগ এই গণ-সংগ্রামের পক্ষে ছিল। প্রশাসন ভেঙে দেয়ার অন্যতম কর্মসূচী ছিল শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত আয়ুব শাহীর বি.ডি. মেম্বার, চেয়ারম্যান, দালাল অর্থাৎ সংগ্রামের বিপক্ষ এবং সমাজ-বিরোধী লোকদের, নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত করা। মাত্র অল্প কয়েকটি স্থানে তারা আন্দোলনকারী কর্মীদের হয়রানি ও হত্যা করেছে। বি.ডি. মেম্বার ও চেয়ারম্যানদের দখলে আগ্নেয়াস্ত্র এবং পোষা গুন্ডা বাহিনী ছিল। অন্যদিকে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আন্দোলনকারীদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। মহল্লা ও পাড়ায় পাড়ায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয়েছে। এই সময় থেকেই পাকিস্তানী প্রশাসনের বিরুদ্ধে পাল্টা বাঙালি প্রশাসনের উদ্ভব ঘটে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রদত্ত আওয়ামী লীগের ছয়-দফা ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফাভিত্তিক সংগ্রাম ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালের প্রথমদিকে কুড়িগ্রাম মহকুমাকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করি। উলিপুর, চিলামারী ও রৌমারী থানার দায়িত্ব রৌশনের ওপর ন্যস্ত হয়, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট থানা নান্নু ভাই ও মঞ্জু এবং ধরলা নদীর উত্তর পাড় ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী ও ফুলবাড়ি থানার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়। তবে উল্লিখিত সব থানায় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে কুড়িগ্রামে আমরা এক সাথে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী একজনের পরিবর্তে অন্যজন সংগ্রাম সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করি। ভুরুঙ্গামারীতে কোন শহীদ মিনার না থাকায় আমি গিয়াস, সোনাউল্যা ও অন্যান্য কর্মীদের সাথে নিয়ে ১৯৬৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির দিন ও রাতের মধ্যে বাজারের কলেজের মোড়ে প্রথম শহীদ মিনার তৈরি করি। হাই স্কুলের পেছনে বাঁশের জঙ্গলে রক্ষিত পুরনো ভুরুঙ্গামারী থানার বিল্ডিং ভাঙা ইট নেয়া হলো। সংগ্রাম সমর্থনকারী ব্যবসায়ী ও ব্যক্তিদের কাছ থেকে সামান্য চাঁদা ওঠানো হলো। আর রাজমিস্ত্রি মনুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে শহীদ মিনার তৈরি করা সম্ভব হলো। পরদিন অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি ভোর রাতে প্রভাতফেরী করে পালন করা হলো মহান ভাষা ও শোক দিবস।

'৬৯-এর ২০ মার্চ সকাল এগারোটায় খবর পেলাম ভুরুঙ্গামারীর উত্তর সীমান্তে ধলভাঙ্গায় সমাজ-বিরোধীরা তিনজন হাই স্কুল ছাত্রকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ধরে নিয়ে গেছে। সাথে সাথে গিয়াস ও সোনাউল্ল্যার নেতৃত্বে প্রায় দু'শ' ছাত্র-যুবক ধলভাঙ্গা প্রেরণ করলাম। এর ফলে ধলভাঙ্গা, শিলখুড়ী, পাগলাহাট, ধামেরহাট, থানা ঘাট, মইদাম, বাশজানী, তিলাই, ঝাউকুটি, শালঝোরসহ প্রায় ১৪/১৫টি গ্রামের শত শত মানুষ যে-যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই নিয়ে ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে সমাজ-বিরোধীদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে ধৃত তিনজন ছাত্রকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

পরদিন শুক্রবার কালীহাট, শিংঝাড়, মানিক কাজী ইত্যাদি জায়গায় সমাজ-বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হলো। ২৪ মার্চ বহালগুড়ি সীমান্ত এলাকায় সমাজ-বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযানে সোনাউল্ল্যা ও গিয়াসসহ প্রায় পঞ্চাশজনকে প্রেরণ

করলাম। সেখানে দু'দিন অভিযানশেষে ২৫ মার্চ সবাই ফিরে আসলো। এই অভিযানে উক্ত এলাকার সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এরপর নাগেশ্বরী ও ফুলবাড়ির সমাজ-বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর কথা ছিল। কিন্তু সে সুযোগ আমরা পেলাম না। কেননা ২৫ মার্চ মঙ্গলবার রাতে পশ্চিমা সামরিক জান্তার শিরোমণি আয়ুব খান সাধের মসনদ ত্যাগ করলো এবং নরঘাতক ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করে জারি করলো সামরিক আইন। এই ২৫ মার্চের শেষ রাতে পুলিশ, ই.পি.আর এবং পাক সেনাবাহিনীর সম্মিলিত কয়েকটি দল ভুরুঙ্গামারী থেকে আমাকে, সোনাউল্ল্যা, গিয়াস, আজিজুল, গোপালসহ অনেককে গ্রেফতার করলো। ধলডাঙ্গা থেকে ৭০ বছর বয়স্ক হাজী মোহাম্মদ আলী, নায়েব আলী, সোনাহাট থেকে রহিমউদ্দিন মন্ডল এবং বহালগুড়ি থেকে স্কুল শিক্ষক ওসমান আলী, আজিজুর রহমান, দেলোয়ার হোসেন, প্রাক্তন ইউ.পি চেয়ারম্যান জনাব সোলায়মানসহ অনেককে গ্রেফতার করা হয়। ২৬ মার্চ বুধবার থেকে ২৮ মার্চ শুক্রবার পর্যন্ত আমাদেরকে ভুরুঙ্গামারী থানার ছোট একটি সেলে থাকতে হলো। এই তিনদিন গিয়াস, সোনাউল্ল্যা ও আমার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হলো। জনাব রহিমউদ্দিন মন্ডল এই এলাকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। তিনি আমার বাবার বড় ভাই। বৃহস্পতিবার রাতে থানার একটি কক্ষে তাঁর সামনে আমাকে এবং আমার সামনে তাঁকে অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন করা হলো। ২৮ মার্চ শুক্রবার কুড়িগ্রাম জেলে স্থানান্তর ও আমাদের বিরুদ্ধে সামরিক আইনের আওতায় রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং হত্যা মামলাসহ ১৬টি মামলা দায়ের করা হলো। আমাদের জেলে আসার পর ফুলবাড়ির আওয়ামী লীগ নেতা ইউনুস আলী, লালমনিরহাটের ন্যাপ নেতা চিত্তরঞ্জন দেব, কুড়িগ্রামের সঞ্জীব করনজাই, চিলমারীর ন্যাপ নেতা ফিরোজ মোঃ ফারুক, উলিপুরের শিক্ষক আব্দুল হক ও রৌমারীর নিজামউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে কুড়িগ্রাম জেলে নিয়ে আসা হলো। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ফলে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম। চিকিৎসার জন্য পুলিশ প্রহরায় আমাকে কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালে নেয়া হলো। প্রায় বিশদিন পর কিছুটা সুস্থ হয়ে জেলে ফিরে এলাম। এ সময় এইচ.এস.সি পরীক্ষা শুরু হলো। জেলের বাইরে থাকলে আমার পক্ষে হয়তো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হতো না। যাইহোক জেলের মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে আমরা এইচ.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলাম। বিশেষ সামরিক ট্রাইবুনালে বিচারের জন্য আমাদেরকে রংপুর জেলে নিয়ে আসা হলো।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঞ্জাবি পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ জোহাকে গুলি করে হত্যা করার পর রাজশাহীস্থ পাক সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যগণ এই জঘন্য হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ এবং অনেকে ছুটি চেয়ে দরখাস্ত করেন। নরপশু ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করার সাথে সাথে প্রতিবাদকারী ৭২ জন সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যকে গ্রেফতার করে রংপুর জেলে নিয়ে এসে সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে বিচার করে তাদের প্রত্যেককে এক বছর সশ্রম কারাদন্ড ও পাঁচবার বেতমারার দন্ড দেয়া হয়। অন্য এক ঘটনায় রংপুরের মহিমাগঞ্জের কাছে আউলিয়া নগর

স্টেশনে ট্রেন থেকে সেনাবাহিনীর চারজন পাঞ্জাবি সদস্যকে কিছুসংখ্যক ছাত্র ও যুবক ধরে পার্শ্ববর্তী গ্রামে নিয়ে গিয়ে বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তবে পাঞ্জাবিরা প্রাণে বেঁচে যায়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আউলিয়া নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে দশজন ছাত্র ও যুবককে গ্রেফতার এবং রংপুর সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে তাদের বিচার করা হয়। বিচারে পাঁচ বছর, দুই বছর ও এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং প্রত্যেককে পাঁচটি বেতমারার দন্ড দেয়া হয়। রংপুর কারাগারে সকল সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী ও বিচারাধীন আসামীদের সম্মুখে বেতমারা হয়। সে এই নির্মম করুণ দৃশ্য।

ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করার পর পূর্ব পাকিস্তানকে ৪টি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর জেলাকে নিয়ে একটি অঞ্চল। এই অঞ্চলের হেড কোয়ার্টার ছিল রংপুর। রংপুরের বিশেষ সামরিক আদালতে আমাদের বিচার শুরু হলো। এই আদালতের চেয়ারম্যান ছিলেন একজন পাঞ্জাবি কর্নেল, সদস্য একজন মেজর ও একজন ম্যাজিস্ট্রেট। ৩ মাস ধরে আমাদের ট্রায়াল হলো। এর মধ্যে জানতে পারলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বাংলার মানুষ বুকের তাজা রক্ত ঢেলে মুক্ত করেছে। ২২ অথবা ২৩ অক্টোবর '৬৯ জেলে বসে খবর পেলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রংপুর এসেছেন। তখন ঘরোয়াভাবে রাজনৈতিক সভা করার অনুমতি ছিল। বঙ্গবন্ধু রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী ভবনে সভা করেন। এই সভায় হাজার হাজার মানুষের ঢল নেমেছিল। মানুষের প্রচন্ড ভিড়ে লাইব্রেরী ভবনের দরজা-জানালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় এবং তা' এক বিশাল জনসভায় পরিণত হয়।

রংপুর বিশেষ সামরিক ট্রাইবুনাল কোর্টে আমাদের বিচার পর্ব শেষে বিচারের রায় প্রকাশ করা হলো না। সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য মামলার নথিপত্রাদি উচ্চপর্যায়ের সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে ইসলামাবাদ প্রেরণ করা হয়। অনেকেই বলাবলি করতো আমাদেরকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। ১৯৭০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে মামলার নথিপত্র ইসলামাবাদ থেকে ফেরত আসার পর সাতদিন ধরে মামলার রায় প্রকাশ করা হয়। গিয়াস, সোনাউল্ল্যা, আজিজুল, দেলোয়ার প্রমুখকে যথাক্রমে ১২, ১০ ও ৮ বছর ইত্যাদি মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হলো। আমি জেল থেকে মুক্তি পেলাম।

এই ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে কুড়িগ্রাম নতুন শহর বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে কুড়িগ্রামের এস.ডি.ও মামুনুর রশিদ কর্তৃক অফিসার্স ক্লাবের ওপরে নির্মাণাধীন রেস্ট হাউসের কাজ বন্ধ করার জন্য আমরা অনুরোধ জানালাম। এতে এস.ডি.ও সাহেব ক্ষেপে গিয়ে আরো বেশি করে বিল্ডিং তৈরির কাজ করতে থাকেন। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম রেস্ট হাউস ভেঙে দেব। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজ, হাই স্কুলের ছাত্র ও স্থানীয় যুবকদের নিয়ে ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে প্রায় সমাপ্ত রেস্ট হাউস ভেঙে ইট নিচে ফেলে দেয়া হলো। এ ব্যাপারে কুড়িগ্রাম শহরের প্রায় সর্বশ্রেণীর মানুষের সমর্থন আমরা পেয়েছিলাম। আমাদের ১৫/২০ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী নির্দেশ জারি করা হলো। তৎকালীন এস.ডি.পি.ও আমাকে অন্য জায়গায় আত্মগোপন করে থাকার জন্য গোপনে খবর পাঠালেন। কুড়িগ্রাম পুরাতন হাসপাতালের পাশে কলেজের অধ্যাপক জনাব হায়দার

আলীর বাসায় আমি, মঞ্জু, রওশন, নান্নু ভাই ও আওয়াল আত্মগোপন করে থাকলাম। রংপুর যাওয়ার পথে পুরনো রেল স্টেশনে সাজু ও সামাদকে গ্রেফতার করা হলো। এস.ডি.ও মামুনুর রশিদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ও গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দেয়ার জন্য আমরা হরতাল আহ্বান করলাম। কুড়িগ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি হলো। স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক ও সর্বশ্রেণীর মানুষ বিশাল মিছিল বের করে। উকিল, মোক্তার, কর্মচারিগণ অফিস-আদালত বর্জন করে মিছিলে যোগদান করেন। দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, রিকশা-গাড়ি সব বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় ডিতীয় অফিসার আবদুল হালিম ও ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ আমাদেরকে গোপনে সহায়তা করেন। কেবল কিছুসংখ্যক পাঞ্জাবি পোষ্য দালালরা বিরোধিতা করার চেষ্টা করে. কিন্তু ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে এদের কূটচাল ভেঙে যায়। এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সামনে টিকতে না পেরে এস.ডি.ও মামুনুর রশিদ মামলা প্রত্যাহার ও গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন।

তিন

১৯৭০ সালের ১১ আগস্ট থেকে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকাস্থ বলাকা ভবনে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কুড়িগ্রাম মহকুমা ছাত্রলীগের পক্ষে আমি ও আমিনুল ইসলাম মঞ্জু মন্ডল এই সভায় যোগদান করি। এই সভায় মূলত বাংলাকে স্বাধীন করার কার্যক্রম পরোক্ষ আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে গৃহীত হয়। জনাব আ.স.ম. আব্দুর রব ও স্বল্পসংখ্যক নেতা এবং প্রতিনিধি বর্ধিত সভায় আসন্ন নির্বাচন বর্জন করে স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটানোর জন্য আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে এবং বর্ধিত সভার সর্বসম্মত প্রস্তাবে প্রথমে নির্বাচনের মাধ্যমে গণমানুষের সমর্থন আদায় এবং পরে বাংলার ঘরে ঘরে স্বাধীনতার কথা পৌছানোর সিদ্ধান্ত ও গৃহীত হয়। আজ শিহরিত হচ্ছি এই ভেবে যে, সেদিন যদি ছাত্রলীগ নির্বাচন বর্জন করতো তাহলে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন না হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। এই নির্বাচন বর্জন ও বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার জয়গানে উদ্বুদ্ধ না করে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ধরলে আজো আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হতো কি না, সন্দেহ। পক্ষান্তরে পাকিস্তানী স্বৈরাচারী চক্র এবং এদেশীয় দালালরা বাঙালিদেরকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত ও ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বুদ্ধিজীবীগণকে হত্যা করতো। আর আমরা হাজার বছর আবার পিছিয়ে যেতাম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রদত্ত আওয়ামী লীগের ছয়-দফা ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা একাকার হয়ে প্রবল আবেগ, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটালো। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঁচা-মরার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা শহর, বন্দর ও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, হাট-বাজারে ছড়িয়ে পড়লাম। ডিসেম্বর মাসে প্রথমে জাতীয় পরিষদ ও পরে

প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে বাংলার মানুষ বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ ও স্বাধীনতার প্রতি নিরঙ্কুশ ঐতিহাসিক সমর্থন প্রদান করলো।

নির্বাচনের ফলাফলে শেখ মুজিব তথা আওয়ামী লীগ বাঙালি প্রদত্ত শতকরা ৯৮.৯ ভাগ ভোট পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বাঙালি জাতির এই প্রাণঢালা সমর্থনদানের ফলে পাকিস্তানী পাঞ্জাবি শোষক ও তাদের এ দেশীয় দোসররা বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। বঙ্গবন্ধু ধাপে ধাপে, পর্যায়ক্রমে স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। '৭১ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আপাতত গোপনে স্বাধীনতার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ দিলেন। এরই আলোকে ছাত্রলীগের হাই কমান্ডের কাছ থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমি নির্দেশ পেলাম। কুড়িগ্রাম মহকুমা ছাত্রলীগ নেতা আমিনুল ইসলাম মঞ্জু মন্ডল, রওশন উল বারী রঞ্জু ও আব্দুল কুদ্দুস নান্নু ভাইয়ের সাথে আমি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনা ও নির্দিষ্ট কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। প্রথমত আমরা কুড়িগ্রাম ঘোষপাড়াস্থ আহম্মদ বকসী সাহেবের গুদামঘরের প্রবেশমুখে গোপনে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করলাম। দ্বিতীয়ত ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী ও ফুলবাড়ি থানার সীমান্ত এলাকার ফাঁড়িসমূহে অবস্থানরত বাঙালি ই.পি.আরদের সংগঠিত এবং ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বি.এস.এফ-এর সাথে যোগাযোগ করার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম আমি। রওশন চিলমারী, উলিপুর, রৌমারী ও লালমনিরহাট থানার সীমান্ত ফাঁড়িতে বাঙালি ই.পি.আরদের সংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করলো। মঞ্জু ও নান্নু ভাই কন্ট্রোল রুম থেকে এই মহকুমা, সেই সাথে অন্যান্য এলাকার সংবাদ সংগ্রহ ও দক্ষতার সাথে যোগাযোগের কাজে নিয়োজিত হলো।

এ সময় ভুরুঙ্গামারী হাই স্কুল মাঠে শামছুল হক চৌধুরী এম.পি.এ সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় আমাকে বক্তৃতা করতে বলা হয়। আমি এই জনসভায় তৎকালীন সার্বিক পরিস্থিতি ও অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করে বললাম, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য পাঞ্জাবি হায়েনাদের নাগপাশ থেকে বাঙালির মুক্তি এবং বাংলার স্বাধীনতা। প্রয়োজন হলে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, জীবন দিতে হবে। পাঞ্জাবি স্বৈরাচারী শোষকদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে বাংলার গণ-মানুষের শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা।

অনেক বাধা ও বিপদকে উপেক্ষা করে বাংলার স্বাধীনতার মন্ত্রকে বুকে নিয়ে অতি গোপনে ও কৌশলে এই এলাকার সীমান্ত ফাঁড়িসমূহের প্রত্যেকটি বাঙালি ই.পি.আর সদস্যের সাথে পূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন করলাম। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বাঙালির বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় স্বাধীনতা যুদ্ধ--এটা তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হলাম। ভুরুঙ্গামারী থানার জয়মনিরহাট ই.পি.আর কোম্পানী হেড কোয়ার্টারের ল্যান্স নায়েক খলিল, রফিক, খালেক ও কোয়ার্টার মাস্টার রাজ্জাক, হাবিলদার মোকসেদ আলী এমনি মুহূর্ত ও যোগাযোগের জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল। একজন অবাঙালি সুবেদার এই ই.পি.আর কোম্পানির কোম্পানি কমান্ডার ছিল। রাতদিন পরিশ্রম করে কোন কোনদিন

অভুক্ত থেকে, কখনও মোটর সাইকেলে, কখনও জীপে এবং কখনো পায়ে হেঁটে হাজারো বাধা আর বিপদের মধ্যে তিনটি থানার প্রায় বিশটি সীমান্ত ফাঁড়ি (বি ও পি) ও জয়মনিরহাট কোম্পানি হেড কোয়ার্টারের বাঙালি ই.পি.আর সদস্যদের সংগঠিত করলাম।

ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর (বি.এস.এফ) অফিসার এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সোনাহাট সীমান্তকে অধিকতর নিরাপদ ও উপযুক্ত মনে করে এই সীমান্তকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলের প্রভাবশালী ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব রহিমউদ্দিন মন্ডল সাহেবের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করে আমি সাহায্য চাইলাম। তিনি একজন স্বাধীনচেতা ব্যক্তি। আমাদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি আমার পিতৃতুল্য। আমার আব্বার বড় ভাই। তাঁর সাথে ভারতের, বিশেষ করে আসামের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব ছিল। তিনি আমাকে সব রকমের সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে কয়েকদিন পর আসতে বললেন।

রহিমউদ্দিন মন্ডল প্রেরিত সংবাদ অনুযায়ী ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে তাঁর সোনাহাটস্থ বাসভবনে গিয়ে দেখা করলাম। পায়ে-হাঁটা পথে সোনাহাট সীমান্তে মল্লারকুটি গ্রামে তাঁর কৃষি খামারে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে সীমান্ত পার হয়ে একইভাবে হেঁটে গোলকগঞ্জ এলাকায় (ধুবরী/আসাম) নীলকান্ত সরকারের বাড়িতে পৌছলাম। নীলকান্ত সরকার রহিমউদ্দিন মন্ডল সাহেবের বাল্যবন্ধু। নীলকান্ত সরকার আমাকে জড়িয়ে ধরে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং সস্নেহে আমার কপালে আর মুখে চুমু দিতে থাকলেন। সোনাহাটের (আসাম) বি.এস.এফ সুবেদার রবীন মেহেরো আমার জন্য এখানে অপেক্ষা করছিলেন। চা-পর্ব শেষে আমাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। বাড়ির মহিলা ও কিশোরীরা উলুধ্বনি ও শঙ্খ বাজিয়ে আমাকে স্বাগত জানালো। মনে হলো আমি যেন কোন স্বর্গ-লোকের দেবতা। পূর্ববাংলার ছাত্র-জনতা যারা পাকিস্তানী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি, ভারতের মানুষের কাছে আমরা যেনো অতি আচর্যের কিছু। ইতোমধ্যে এই বাড়ির পুব পাশে, মন্দিরের কাছে গ্রামের কয়েকশ' ছেলে-বুড়ো আমাকে দেখবার জন্য সমবেত হয়েছেন। এখানে রটে গেছে বাংলাদেশের একজন ছাত্র-নেতা এসেছে। তা'ছাড়া পারিবারিক দিক থেকে দাদা, আব্বা ও চাচারা এই এলাকায় অতি সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। সুবেদার রবীন মেহেরো উপস্থিত লোকজনের সাথে আমাকে কথা বলতে দিলেন না। দ্রুত লোকজনের মধ্য দিয়ে আমাকে নিয়ে সোনাহাট বি.এস.এফ সীমান্ত ফাঁড়িতে এলেন। এই সীমান্ত ফাঁড়িতে রবীন মেহেরোর সাথে ইংরেজি, বাংলা, হিন্দিতে যেভাবে পেরেছি আমাদের রাজনীতি, পূর্ববাংলার পরিস্থিতি, বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের রণ-কৌশল কি হবে-ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হলো চীন সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কি তাও তিনি কৌশলে জেনে নিলেন। প্রাথমিকভাবে আমরা কি করবো এবং আমাদের কি কি প্রয়োজন সুবেদার রবীন মেহেরো অবগত হলেন। তারপর তাঁর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টা করবেন--এই

বলে তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন। তবে ভারতীয় পুলিশ বা অন্য কোন সংস্থার সাথে আপাতত যোগাযোগ করতে নিষেধ করলেন। সন্ধ্যার পর অন্য পথে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে প্রথমে সোনাহাট ও পরে ভুরুঙ্গামারী পৌছলাম। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৃটিশ ভারতে অর্থাৎ দেশভাগ হওয়ার আগে এই সোনাহাটের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ও ব্যবসা বাণিজ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। ভারত বিভাগের পর সোনাহাটের প্রায় অধিকাংশ জায়গা আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারত ভাগের পরও তাই সোনাহাট ওপারে সোনাহাট (ভারত) এবং এপারে পাক সোনাহাট এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গ সোনাহাট নামে পরিচিত। সুবেদার রবীন মেহেরার সাথে আলোচনা অনুযায়ী নির্ধারিত ২৫ ফেব্রুয়ারি কুড়িগ্রাম ওয়াপদার নতুন টয়োটা জীপে রওশন ও নান্নু ভাইকে সাথে নিয়ে সোনাহাটের পশ্চিমে প্রধানীর বাঁশের জঙ্গলের ভেতর থামলাম। এখানে জীপ ও ড্রাইভার মন্টুকে রেখে সোনাহাট ছড়ার (বিল) পাড় দিয়ে জনাব রহিম মন্ডলের বাড়িতে এসে তাঁর সহায়তায় পায়ে হেঁটে সীমান্তের বানরকুটি গ্রামে মুচি বাড়ির পাশ দিয়ে পাকা রাস্তা ও রেললাইন পার হয়ে সীমান্তের ওপারে সোনাহাট (আসাম) বি.এস.এফ ফাঁড়িতে আমরা পৌছলাম। সুবেদার রবীন মেহেরা জীপ নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা বিলম্ব না করে জীপে বি.এস.এফ হেড কোয়ার্টার পানবাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আসাম ও পশ্চিম বাংলার একমাত্র সংযোগ পাকা পথ ধরে গোলকগঞ্জ হয়ে গৌরীপুর এলাম। গৌরীপুর থেকে ডান দিকের পথ ধরে ধুবরী এবং বাম দিকের রাস্তা দিয়ে পানবাড়ি হয়ে গৌহাটি যাওয়ার একমাত্র পাকা রাস্তা। বৃটিশ ভারতে ইংরেজদের সাথে জাপানের যুদ্ধ বেধে গেলে ইংরেজরা এক বছরের মধ্যে দিল্লী থেকে দুর্গম মনিপুর পর্যন্ত দীর্ঘ রেল ও পাকা পথ তৈরি করে। ভারত বিভাগ তথা হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার ফলে ভুরুঙ্গামারী, পাটেশ্বরী ও সোনাহাট রেল ষ্টেশন এবং পাকা পথ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে। সে কারণে পশ্চিম বাংলা এবং আসামের মধ্যে যোগাযোগ কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এরপর কুচবিহার থেকে তুফানগঞ্জ, বকসীর হাট, ছত্রশাল, সোনাহাট দিয়ে গোলকগঞ্জ পর্যন্ত পাকা পথ এবং ফকিরা গ্রাম দিয়ে গোলকগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ তৈরি করার পর যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃ স্থাপিত হয়।

আসামের স্পেশাল চা-পান করার জন্য সুবেদার রবীন মেহেরা গৌরীপুরের মোড়ে চা দোকানে আমাদেরকে নিয়ে গেলেন। দোকানে বসে চা-পানের সময় এখানে দ্রুত প্রচার হয়ে যায় যে, বাংলাদেশের বিখ্যাত তিনজন ছাত্র নেতা এসেছে। আমাদেরকে দেখার জন্য স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীসহ শত শত মানুষ ছুটে আসে এবং দোকানে ভিড় করে। আমরা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যাই। তা'ছাড়া পুলিশ জানতে পারলে অসুবিধা হতে পারে, তাই দ্রুত গতিতে জীপে উঠে আমরা পানবাড়ি বি.এস.এফ হেড কোয়ার্টার অভিমুখে রওয়ানা হলাম। এই হেড কোয়ার্টারটি ঘন জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। ঘন জঙ্গল দু'ভাগ করে পিচঢালা কালো সর্পিল আঁকাবাঁকা পাকা পথ গৌহাটি চলে গেছে। ৭৮ ব্যাটালিয়ন বি.এস.এফ-এর কমান্ডিং অফিসার কর্নেল আর. দাস ও ক্যাপ্টেন যাদব আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁদের সাথে পূর্ববাংলার উদ্ভূত

পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হলো। কর্নেল আর. দাস ঢাকার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন। কথা বলার সময় তাঁর চোখ ছল ছল করছিল। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম, তিনি ঢাকার ছেলে। তাঁর জন্ম ঢাকা জেলার বিক্রমপুর। আলোচনা চলতে লাগলো। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধ করা অনিবার্য--এ ছাড়া কোন বিকল্প নেই--এ বিষয়ে তাঁরা একমত হলেন। দেয়ালে আটকানো বাংলাদেশের মানচিত্রে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও ক্যান্টনমেন্টের অবস্থান দেখিয়ে দিলাম। আমরা কি ভাবে যুদ্ধ শুরু করতে চাই, লোকবল কি ভাবে সংগ্রহ করা হবে, বাঙালি ই.পি.আর, পুলিশ, সেনাবাহিনীর সদস্য ও অফিসারদের সংগ্রহ করা সম্ভব কি না, ছাত্র ও যুবকদের কি ভাবে ট্রেনিং দেয়া যেতে পারে, ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কি হতে পারে--ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হলো। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে কর্নেল আর. দাস বললেন, প্রথমত সীমান্ত ফাঁড়িতে বাঙালি ই.পি.আর-দের সংঘবদ্ধ করে অবাঙালি ই.পি.আর-দের হত্যা করতে হবে। দ্বিতীয়ত আনসার, মুজাহিদ ও এই এলাকার থানাসমূহের বাঙালি পুলিশ সংঘবদ্ধ, তৃতীয়ত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্র ও যুবকদের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। ট্রেনিং-এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি হবে, তা পরে জানানো হবে। আলোচনা শেষে খাবারের জন্য উঠতে হলো। প্রায় দু'শ' গজ দূরে শাল-গজারী গাছের সারির মধ্য দিয়ে হেঁটে সুন্দর একটি বাংলোতে এসে উঠলাম। টেবিলে খেতে বসেছি এমন সময় মায়া-ভরা চোখে মধ্য বয়সী একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলা খাবারের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি আমাদের খাবার উঠিয়ে দিচ্ছেন আর সুন্দরভাবে বাংলায় বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন আর আমরা তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলাম। তিনি মিসেস আর. দাস। কথা প্রসঙ্গে জানলাম, তাঁদের আদিবাস ও তাঁর বাবার জন্ম ঢাকায়। আমরা যেন তাঁর কত পরম আত্মীয়-আপনজন। আমি তাঁকে দিদি বলে সম্বোধন করলাম। খাওয়া শেষ করে বাংলো থেকে বের হওয়ার সময় মিসেস আর. দাস তিনশ' ভারতীয় টাকা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, যখনই তোমরা এখানে আসবে, তখন অবশ্যই তোমরা আমার সাথে দেখা করবে। আমি টাকা নেব না বলতে যাব কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে না বলতে পারলাম না। যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

কর্নেল আর. দাসের অফিসে ফিরে রওয়ানা হওয়ার আগ মুহূর্তে জানতে পারলাম, আসাম পুলিশ (ধুবরী ও গোলকগঞ্জ) আমাদেরকে খুঁজছে। এই অবস্থায় কড়া-নিরাপত্তার মধ্যে অর্থাৎ পুলিশ যাতে আমাদেরকে দেখতে না পায় সে জন্য পরপর ৪টি বি.এস.এফ গাড়িতে আমাদেরকে নিয়ে সুবেদার রবীন মেহেরো ও ক্যাপ্টেন যাদব রওয়ানা হলেন। আমরা রাত ৯টায় সোনাহাট বি.এস.এফ সীমান্ত ফাঁড়িতে পৌঁছলাম। এখানে চা-পর্ব শেষ করে পরিত্যক্ত রেললাইন ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সোনাহাট (বাংলাদেশ) এসে অপেক্ষমান জীপে ভুরুঙ্গামারীর দিকে ছুটলাম।

২ মার্চ রংপুর শহরে পাকিস্তানী শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য এক বিশাল জনতার মিছিল ষ্টেশন রোড দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে এক অবাঙালির বাড়ির তিনতলা থেকে

মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়। গুলির আঘাতে তিনজন বাঙালি শহীদ হলেন। শহীদদের লাশ নিয়ে সারা শহরে মিছিল করা হলো। শহরে মারাত্মকভাবে উত্তেজনা বেড়ে গেল। বিহারি মালিকের প্যারাডাইস কোম্পানি নামের দোকান জনতা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিল। রংপুর শহরসহ সমগ্র রংপুর জেলার সর্বশ্রেণীর মানুষ এই ঘটনার প্রতিবাদে মুখর ও পাকিস্তানী শৃঙ্খল ভাঙ্গার জন্য ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করলো

এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে ৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এক বিশাল ছাত্র ও যুব সমাবেশে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ এবং সবুজ পটভূমি বিশিষ্ট লাল রক্ত বর্ণ সূর্যের মধ্যে সোনালি রং খচিত পূর্ববাংলার মানচিত্র আঁকা স্বাধীনতার পতাকা ছাত্রলীগ নেতা আ. স. ম আব্দুর রব বিপুল হর্ষধ্বনি ও মুহর্মুহ গগন বিদারী শ্লোগানের মধ্য দিয়ে উত্তোলন করলেন। এর একদিন আগে ২ মার্চ পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভায় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে স্বাধীন বাংলার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অব অনার এবং স্বাধীন বাংলার পতাকা উপহার দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু অপূর্ব স্মিতহাস্যে ছাত্রদের অভিবাদন ও পতাকা গ্রহণ করলেন।

৭ মার্চ, ১৯৭১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেসকোর্স মাঠে ঐতিহাসিক জনসমুদ্রে বজ্রকণ্ঠে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা এবং শত্রুর মোকাবেলা করার উদাত্ত আহ্বান জানালেন। পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করার শপথে বাংলার মাঠেঘাটে সর্বত্র প্রতিরোধের সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

স্বাধীন বাংলার পতাকা নিয়ে আমরা গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়লাম। আমাদের জীপের সামনে বড় পতাকা লাগিয়ে কুড়িগ্রাম মহকুমার গ্রামে গ্রামে, হাটে-বাজারে ঘুরে জনসভায় পতাকা উত্তোলন করে জানিয়ে দেয়া হলো, আমরা বাঙালিরা এখন স্বাধীন, দেশ আমাদের বাংলাদেশ। বাংলা, বাংলাদেশ আমাদের জীবন-মরণ, আমাদের স্বপ্ন। জীপের সামনে পতাকা উড়িয়ে থানা ও সীমান্তে ই.পি.আর ফাঁড়ির সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ ও ই.পি.আরগণ দাঁড়িয়ে স্যালুট করে স্বাধীনতার প্রতীক পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করে। 'জয় বাংলা'র প্রকম্পিত ধ্বনিতে গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর গর্জে উঠলো। গ্রামের নিষ্পেষিত মুক্তিপাগল নিরীহ মানুষ মুক্তির দৃপ্ত আশা নিয়ে পতাকার চারদিকে ভিড় করে। তারা মুক্তির দিশারী পতাকার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখে, যেন দেখা আর শেষ হয় না। গ্রামের লজ্জাবতী বধূরা ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে পতাকা দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করে। ছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা জীর্ণ শরীরে না-খাওয়া পেটে কী আনন্দ, জনম-জনমের পরিতৃপ্তি তাদের চোখেমুখে। সে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি, প্রেরণা আর সাহস, যা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় শুধু অনুভবই করা যায়। গ্রামের শত শত যুবক, অর্ধউলঙ্গ ছেলেরা দল বেঁধে 'জয় বাংলা' বলে মুক্তির আনন্দে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তুললো। আর সুর করে গাইতে থাকে, "তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা।"

৯ মার্চ চিলমারী থেকে ই.পি.আর হাবিলদার আনিস মোল্লাকে সাথে নিয়ে রওশন কুড়িগ্রাম এলো। আনিস মোল্লার সাথে একটি স্টেনগান, দু'টি ম্যাগজিন ও তিনশ' রাউন্ড

গুলি। নতুন টাউন পোস্ট অফিস সংলগ্ন কুড়িগ্রাম কলেজ ছাত্রাবাসের উত্তর দিকের দু'টি ঘরে মাঝে মাঝে আমি থাকতাম এবং এই ঘর আমাদের কাজে ব্যবহার করা হতো। ঘোষপাড়ার কন্ট্রোল রুম ছাড়াও সীমিতসংখ্যক কর্মী নিয়ে এখানে সভা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। মহকুমার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত কর্মীর প্রয়োজনে এই ছাত্রাবাসে রাত্রিযাপন করতো। ককটেল তৈরির সরঞ্জামাদি এখানে রক্ষিত ছিল। কুড়িগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপাল জনাব আব্দুল ওহাব কলেজের সায়েন্স ল্যাবরেটরীর এসিড ও অন্যান্য সরঞ্জাম আমাদেরকে সরবরাহ করেন। ছাত্রাবাসের আমার এই ঘরে এসেই আনিস মোল্লা রাগত স্বরে বললো, 'আপনারা, ছাত্ররা আন্দোলন করে ঘরে বসে রয়েছেন। ঘরে বসে থাকলে আপনাদেরকে মরতে হবে। আপনারা বাঁচতে পারবেন না। রংপুরে ই.পি.আর-দের স্ত্রী ও মেয়েদের ওপর পাঞ্জাবি ও বিহারিরা পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে। আমি বুঝতে পেরেছি আমাদেরকে মেরে ফেলা হবে। আমি তাই বের হয়ে এসেছি। আমাকে কাজে লাগান। বলুন আমাকে কি করতে হবে?'

আমি আনিস মোল্লাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, আমরা বসে নেই। আপনাকে আমাদের প্রয়োজন। আরো অনেক কথা হলো আনিস মোল্লার সাথে। বোঝা গেল, তাঁর মধ্যে দাউ দাউ করে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। রংপুর ই.পি.আর হেড কোয়ার্টার ও মাহিগঞ্জে পাঞ্জাবি ও অবাঙালি ই.পি.আর সদস্যরা বাঙালি ই.পি.আর-দের স্ত্রী ও মেয়েদের শ্লীলতাহানি করেছে। এক গর্ভবতী মহিলার পেটে লাথি মারার ফলে তার প্রচুর রক্তপাত হয় এবং কয়েক ঘন্টা পর মৃত্যুবরণ করে। অবাঙালি ই.পি.আর হত্যা এবং বাঙালি ই.পি.আর-দের সংঘবদ্ধ করার বিস্তারিত পরিকল্পনা আনিস মোল্লাকে জানালাম। আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গে আনিস মোল্লা একমত হলেন এবং হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করলেন।

প্রথমে ভুরুঙ্গামারী থানার জয়মনিরহাটস্থ ই.পি.আর কোম্পানি হেড কোয়ার্টারের পাঞ্জাবি সুবেদার ও অন্য চারজন অবাঙালি ই.পি.আরকে হত্যা এবং পরে সুযোগমত বাঙালি ই.পি.আর-দের সহায়তায় অথবা তাদের দ্বারা এই এলাকার বিভিন্ন ফাঁড়ির অবাঙালি ই.পি.আর-দের হত্যা করার বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। জয়মনিরহাট ই.পি.আর হেড কোয়ার্টারে সুবেদার ও চারজন ই.পি.আর অবাঙালি, বাদ বাকি সবাই বাঙালি। এছাড়া কুড়িগ্রাম মোল্লাপাড়াস্থ ই.পি.আর ওয়্যারলেস অফিসে ৮/৯ জন বাঙালি ই.পি.আর ছিল। এখানে কোন অবাঙালি ছিল না। আমাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য আমি তাদের সাথে কথা বললাম। তাদের একজন আনিস মোল্লার সাথে কথা বললো। কিন্তু তাদেরকে আর পাওয়া গেল না। তারা সবাই কুড়িগ্রাম ছেড়ে চলে গেছে।

কুড়িগ্রাম থেকে মোটর সাইকেলে জয়মনিরহাট এসে আমি শুধু নায়েক খলিল ও কোয়ার্টার মাস্টার রাজ্জাককে সুবেদার ও অবাঙালি ই.পি.আর সদস্যদের হত্যা করার পরিকল্পনার কথা জানালাম। খলিল ও রাজ্জাক আমাদের পরিকল্পনায় একমত হয়ে অন্যান্য বাঙালি ই.পি.আর সদস্যদের সাথে রাখার কথা জানালো। আমি এখান থেকে

ভুরুঙ্গামারী এসে আমাদের কয়েকজন কর্মীকে সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়ে কুড়িগ্রাম ফিরে এলাম।

২ মার্চ পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, বস্তিবাসী, ইঞ্জিনিয়ার, কর্মচারী, কর্মকর্তাসহ সর্বশ্রেণীর মানুষ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলো। শ্রমিক ভাইরা কলকারখানা, কর্মচারী-কর্মকর্তারা অফিস আর আইনজীবীরা আদালত বর্জন করলো। ডাক্তার ও হাসপাতাল অসহযোগ আন্দোলনের আওতায় ছিল না। খাজনা, ট্যাক্স দেয়া বন্ধ হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে পাকিস্তানী স্বৈর শাসনের পরিবর্তে যেন বাংলার মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। এমন বুঝি বিশ্বের ইতিহাসে এর আগে ঘটেনি। কেননা বৃটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত উপমহাদেশে অসহযোগ আন্দোলন হলেও সর্বশ্রেণীর মানুষের এমন স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক নজির গান্ধীজীর ওই অসহযোগ আন্দোলনে পরিলক্ষিত হয়নি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১১ মার্চ সকাল ৮টায় দু'টি মোটর সাইকেলে রওশন ও আনিস মোল্লাকে নিয়ে জয়মনিরহাট অভিমুখে রওয়ানা হলাম। ই.পি.আর পোশাক পরিহিত আনিস মোল্লা, সাথে গুলিভর্তি দু'টি ম্যাগজিনসহ স্টেনগান। আমার কাছে এক বিহারির কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া দু'নলা বন্দুক। আমাদের অভিযান পরিকল্পনার কথা কেবল নানু ভাই ও মঞ্জুই জানত। সাথীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধরলা নদীর খেয়া ঘাটে এসে মোটর সাইকেল থামালাম।

খেয়া নৌকায় চেপে মাঝ নদীতে আসার পর নৌকার মাঝি দু'জন জানি না কি ভেবে বললো, "ভাই ও, তোমরা কোনঠে যান, হামার গুলাক সাথত নেন, হামরাও তোমার গুলার সাথত যামো।" এই মাঝিরা প্রায় প্রতিদিনই আমাদেরকে নদী পারাপার করে। আমাদের অতি পরিচিত। মাঝিদের কথায় আরো বেশি করে উৎসাহ পেলাম। পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করলাম। ওরা জানে না আমরা কোথায় যাচ্ছি। এমন তো হতে পারে আর কোনদিন ফিরবো না, কোনদিন খেয়া পার হতে পারবো না। ওদের সহজ সুন্দর প্রাণখোলা কথা শুনব না। নদী পার হয়ে নৌকা লাগিয়ে আমাদের মোটর সাইকেল ওরা নামিয়ে দিল। বক্‌শিশ দেয়ার জন্য আমি প্যান্টের পকেটে হাত দিয়েছি, সাথে সাথে মাঝিদের একজন আমার হাত চেপে ধরে বললো,"ভাই থাক, বকশিশ দিবার লাইগবার নয়। তোমরা যান। আজ কেনবা তোমার গুলার কাছ থাকি বকশিশ নিবার মন চায় না।" আর কিছু বলতে পারলাম না, ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে মোটর সাইকেল স্টার্ট করলাম। প্রায় দুই মাইল বালুচর আর দুই মাইল কাঁচা রাস্তা পাড়ি দিতে হবে। তারপর পাটেশ্বরী থেকে নাগেশ্বরী ও ভুরুঙ্গামারী যাওয়ার পাকা রাস্তা। চরের মাঝে এসে রওশনের মোটর সাইকেল বালুতে আটকে গেল। রওশনের সাথে মোটর সাইকেলের পেছনে আনিস মোল্লা বসেছে। আমার মনটা হঠাৎ এক অজানা আশঙ্কায় আঁতকে উঠলো, রওশন আবার মোটর সাইকেল স্টার্ট দিয়ে ফার্স্ট গিয়ারে চালাতে শুরু করলো। মোটর

সাইকেলের গোঁ গোঁ শব্দ যেন বলছে, ' তোমরা থেমো না, এগিয়ে যাও।' পাটেশ্বরী এসে রাস্তার পাশে মোটর সাইকেল থামিয়ে রওশন পানের দোকান থেকে পান নিয়ে মুখে পুরে সিগারেট ধরালো। বাসের ড্রাইভার লতিফ চাচা, রঞ্জু, আঙ্গুর ও অন্যরা আমাদেরকে তাকিয়ে দেখছিল। আমি হাত ইশারা করে মোটর সাইকেল চালাতে লাগলাম। কোমরপুর, নাগেশ্বরী, বেপারীহাট, রায়গঞ্জ, আন্ধারী ঝাড় পার হয়ে জয়মনিরহাটের দক্ষিণে ঘন আমগাছ ঘেরা রাস্তার পাশে যেন অজান্তেই মোটর সাইকেল থেমে গেল। আমাদের কর্মী আবদুল হাই গরু বাঁধা রশি হাতে সামনে দাঁড়িয়ে। আব্দুল হাই গরু বেঁধে আমাদের কাছে এলো। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আনিস মোল্লাকে ওর বাড়িতে রেখে জয়মনিরহাট যাবো। আমাদের সাথে আনিস মোল্লাকে অস্ত্র হাতে দেখলে অবাঙালি ই.পি.আর-দের মনে সন্দেহের উদ্রেক হবে ও তারা সাবধান হয়ে যেতে পারে। রাস্তার পুব পাশে বাঁশের জঙ্গলে ঘেরা ওদের বাড়ি। রাস্তা থেকে বাড়ি দেখা যায় না। ভুরুঙ্গামারীতে আমাদের বাসায় আনিস মোল্লাকে রাখার সিদ্ধান্ত এর আগে নেয়া হয়েছিল। আনিস মোল্লাকে তাদের বাড়িতে রাখার প্রস্তাব দেয়া হলে সে সানন্দে রাজি হয়ে গেল। আমরা ওদের বাড়িতে গেলাম। আনিস মোল্লাকে দুপুরে খাওয়ানোর জন্য বলে আমি ও রওশন জয়মনিরহাট নবাব চৌধুরী সাহেবের বাসায় এলাম। তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তিনি ভুরুঙ্গামারী থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি। তাঁর বাড়ি থেকে ই.পি.আর কোম্পানি হেড কোয়ার্টারে অপারেশন চালানো সুবিধা হবে বলে এখান থেকেই আমাদের অপারেশন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। জয়মনিরহাটের পরিত্যক্ত রেল স্টেশনে ই.পি.আর কোম্পানি হেড কোয়ার্টার অবস্থিত। এই ই.পি.আর ক্যাম্পের ঠিক সোজা পশ্চিমে পাকা রাস্তার পাশে নবাব চৌধুরী সাহেবের বাড়ি। তিনি সম্পর্কে আমার মামা হন। তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পর তাঁকে প্রতিজ্ঞা করালাম, আমরা তাকে যেসব কথা বলবো, তার কোন কিছুই কোন ক্রমেই প্রকাশ করা যাবে না। সন্ধ্যার পর তাঁর বাড়ি থেকে মহিলা ও অন্যদেরকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিতে এবং আমাদের তিনজনের রাতের খাবার রাখতে বলে আমরা ভুরুঙ্গামারী চলে আসি। সবার প্রশ্ন, ঢাকায় কি হচ্ছে? আমরা কোন নতুন খবর নিয়ে এসেছি কি না? কি হবে ইত্যাদি।

ভুরুঙ্গামারীতে রওশনকে রেখে আমি আবার জয়মনিরহাট এসে নায়েক খলিল ও রাজ্জাকের সাথে যোগাযোগ করলাম। নবাব চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে রাত ১১টায় বাঙালি ই.পি.আর সদস্যরা আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। সুবেদার ও অবাঙালি ই.পি.আর-দের অবস্থান রাজ্জাক ও খলিল সঠিকভাবে জেনে আসবে। জয়মনিরহাটে বিলম্ব না করে ভুরুঙ্গামারী ফিরলাম। সন্ধ্যার পর রওশনকে নিয়ে জয়মনিরহাট নবাব চৌধুরী সাহেবের বাড়ি এসে দেখা গেল চৌধুরী সাহেব ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি রাত আটটায় আনিস মোল্লাকে আনতে গেলাম। এই কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে আমাদের কোন সংবাদ না পেয়ে আনিস মোল্লা অস্থির চিত্তে অপেক্ষা করছিল। আবদুল হাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে রাখা আমার বন্দুকসহ আনিস মোল্লাকে নিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে নবাব চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে ফিরলাম। আমাদের তিনজনকে শোল

মাছের তরকারি ও ডাল দিয়ে ভাত খেতে দেয়া হলো। খেতে বসলাম ঠিকই কিন্তু খেতে পারছিলাম না। মুখে দিলেও গলা দিয়ে ঢুকছিলো না। কোনমতে আহার-পর্ব শেষ করলাম। দেখা গেল নবাব চৌধুরী ভয়ে কাঠ হয়ে গেছেন। আমি তাঁকে আশ্বস্ত ও সাহস দেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না। আমাদের অভিযানের কথা ফাঁস হয়ে গেলে তাঁকে গুলি করা হবে বলে আমি হুমকি দিয়েছিলাম। আমাদের কাছে রাত অনেক দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। রাত ১১টা বাজতে যেন আরো অনেক দীর্ঘ সময় নেবে। সময় আর যায় না, একই জায়গায় ঘড়ির কাঁটা যেন দাঁড়িয়ে আছে।

নির্ধারিত সময় রাত এগারোটায় খলিল, খালেক ও রাজ্জাকসহ দশজন ই.পি.আর আমাদের সাথে মিলিত হলেন। কারো মুখে কোন কথা নেই। হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম, আমরা যেন কত যুগ যুগান্ত ধরে আপন। প্রথমত আমরা পবিত্র কোরান শরীফ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম। দ্বিতীয়ত তিনটি দলে বিভক্ত হলাম। আনিস মোল্লা, খালেক, খলিল, রওশন ও আমি যাব রেললাইনের পাশ দিয়ে সুবেদারকে হত্যা করার জন্য, ছয়জন যাবে ওয়্যারলেস রুমে চারজন অবাঙালি ই.পি.আর-কে হত্যা করতে। অবাঙালি চারজন সবসময়, বিশেষ করে রাতে এক সাথে ওয়্যারলেস রুমে থাকতো। রাজ্জাকসহ দু'জন অস্ত্রাগার (কোত) ভেঙ্গে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য যাবে। কয়েকদিন আগে রাজ্জাকের কাছ থেকে কোতের চাবি ধূর্ত সুবেদার নিজের কাছে নিয়ে নিয়েছিলো।

'জয় বাংলা' বলে আমরা সবার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে প্রথমে রাজ্জাক, খলিল, আনিস মোল্লা, আমি ও রওশন একে একে ঘর থেকে বের হয়ে পাকা রাস্তার পাশে আমগাছের নিচে এলাম। পরিকল্পনা অনুযায়ী এখান থেকে আমরা যার যার মতো এগিয়ে যাব। এমন সময় জয়মনিরহাটের ব্যবসায়ী আনোয়ার সাহেব (আন্তাজ মিয়া) ও হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আজিমউদ্দিন খুব দ্রুত বেগে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আনোয়ার সাহেব আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা কোথায়, কেন যাচ্ছ, আমরা জানি। জয়মনিরহাটে বিশৃঙ্খলা হতে দেবো না। তুমি, '৬৯ সালে এই এলাকায় অশান্তির সৃষ্টি করেছিলে। তাই জয়মনিরহাটে এই রকম কিছু হতে দেব না।' জবাবে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, 'বাধা দেবেন না, এ ছাড়া কোন উপায় নেই। অবাঙালি ই.পি.আর-রা বাঙালিদেরকে মেরে ফেলবে, আপনারাও বাঁচতে পারবেন না।' প্রায় এক নিঃশ্বাসে আমি আমার কথা শেষ করলাম। আনোয়ার সাহেব এবার কঠিন স্বরে বললেন, 'না এসব কিছুই হবে না।' হঠাৎ আনিস মোল্লা আনোয়ার সাহেবের বুক-সোজা স্টেনগান তাক করে ধরলো। আমি তার স্টেনগান হাত দিয়ে সরিয়ে বললাম, 'আপনি আর বাধা দেবেন না। আপনার অসুবিধা হবে।' এবার তিনি আমাদের সঙ্গী ই.পি.আর সদস্যদের উদ্দেশে বললেন,' আজ অল্প কয়েকজন অবাঙালি ই.পি.আর হত্যা করে আপনারা যুদ্ধ শুরু করবেন, কিন্তু এই সীমিত অস্ত্র-গুলি-বারুদ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আপনার কি করবেন? তখন কোথায় অস্ত্র-গোলা-বারুদ পাবেন?

আনোয়ার সাহেব এসব কথা বলে ই.পি.আর-দের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করলেন। আমি বললাম, 'এই অপারেশন করার পর আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের অভাব হবে না। আমাদেরকে সাহায্য করতে অনেকেই প্রস্তুত রয়েছেন।' আনোয়ার সাহেব বললেন, 'এই অস্ত্র আমেরিকা দেবে, না চীন দেবে, ভেবে দেখতে হবে।' আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'সরে যান, নইলে আপনাকে গুলি করবো।' জনাব আজিমুদ্দিন তৎক্ষণাৎ আমার হাত ধরে বললেন, 'বাবা আমার অনুরোধ, তোমরা ফিরে যাও।' তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। এই অবস্থায় আর অগ্রসর হওয়া সঠিক হবে না, তাই সেদিনের মত আমাদের পরিকল্পনা স্থগিত রাখলাম। পরে জানা গেল, পাঞ্জাবি সুবেদারের সাথে আনোয়ার সাহেবের খুব ভাব। নবাব চৌধুরী সাহেবের পরিবার-পরিজন অন্যত্র আশ্রয় নেয়ার কারণে আমাদের পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। আনোয়ার সাহেব একথা জানতে পেরে সুবেদারকে সব জানিয়ে দিয়েছে। সুবেদার নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, আনোয়ার সাহেব একজন ভাসানী ন্যাপ সমর্থক।

কি আর করা! অবশেষে রওশন ও আনিস মোল্লাকে নিয়ে ভুরুঙ্গামারী চাচার বাসায় রাত কাটালাম। আমরা রাতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম আগামী ২৪ মার্চ সকালে শুধু আমরা তিনজন এই অপারেশন চালাবো। কাউকে জানানো হবে না। খুব সকালে রওশন ও আনিস মোল্লা কুড়িগ্রাম চলে গেল। আমরা কয়েকদিন সময় নিলাম, কারণ, অবাঙালি ই.পি.আর সুবেদার ও অন্যরা যেন বুঝতে পারে তাদেরকে হত্যার পরিকল্পনা আমরা ত্যাগ করেছি। অন্যদিকে বি.এস.এফ কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা একান্ত প্রয়োজন। সকালেই সোনাহাট সীমান্ত পার হয়ে বি.এস.এফ ফাঁড়িতে গেলাম। ক্যাপ্টেন যাদব এখানে আগেই এসেছেন। আমরা কথা বলছিলাম। হাবিলদার এল. দত্ত দ্রুত এসে স্যালুট করে দাঁড়িয়ে খবর জানালো, কর্নেল আর. দাস আসছেন। চা-পান শেষ না হতেই জীপের আওয়াজ পাওয়া গেল। সুবেদার রবীন মেহেরা ও ক্যাপ্টেন যাদব অভিবাদন জানানোর জন্য টুপি মাথায় দিতে দিতে বের হয়ে গেল। কর্নেল আর. দাস সোজা ঘরের মধ্যে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে করমর্দন করে বললেন, 'কি হে টাইগার অব বেঙ্গল, খবর কি? তোমাকে আজকেই আসার জন্য খবর পাঠাতাম। তুমি এসেছো ভালই হয়েছে।' এরপর রংপুর ক্যান্টনমেন্ট, পাকবাহিনীর অবস্থান, বাঙালি ই.পি.আর-দের মানসিক অবস্থা, অবাঙালিদের বিষয়, তিস্তা পুলের পার্শ্ববর্তী এলাকার বিবরণ, এই এলাকার সরকারী কর্মকর্তা, এম.এন.এ, এম.পি.এ, আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই এলাকার আওয়ামী লীগের এম.এন.এ, এম.পি.এ-দেরকে ভারতে তাঁর কাছে আসার জন্যে তাগিদ দিলেন। সুবেদার হত্যার পরিকল্পনা ও ব্যর্থতার বিস্তারিত তাঁকে বললাম। কর্নেল আর. দাস কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'এরপর তোমরা কি করবে?' বললাম, 'আমরা আবার অভিযান চালাবো, তবে কবে এটা করবো, এই মুহূর্তে আপনাকেও জানাব না।' তিনি সহাস্যে আমার ঘাড় চাপড়ে বললেন, 'আমি এটাই তোমার কাছে আশা করেছিলাম। এবার তোমরা সাকসেসফুল হবে। ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন।'

সন্ধ্যার আগেই সোনাহাট এলাম। কয়েকদিন থেকে ই.পি.আর-রা সীমান্ত টহল বন্ধ করে দিয়েছে। জনাব রহিমউদ্দিন মন্ডল, শিক্ষক আবদুল গফুর, নূরী সাহেব, ডাঃ মোজাদার হোসেন, মানিক কমান্ডার, আয়েজউদ্দিন কমান্ডার (আনসার কমান্ডার), আমার স্কুল সহপাঠী আনোয়ার প্রমূখের সাথে সোনাহাটে দেখা হলো। তারা আমাকে নানা প্রশ্ন করেছিলেন আর রহিমউদ্দিন মন্ডল হাসছিলেন। তাঁদের সাথে কথা বলে ভুরুঙ্গামারী চলে আসলাম।

সকালে জনাব শামছুল হক চৌধুরী এম.পি.এ-কে ভারতে যাওয়ার ব্যাপারে সবকিছু খুলে বললাম। তিনি আমার কথা শুনে উষ্মা প্রকাশ করলেন। হয়তো বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, অথবা ভেবেছিলেন, আমি অজানা কোন বিপদ ডেকে নিয়ে আসছি। তাই তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। আমরা যা করছি, এ ছাড়া বিকল্প আর কিছু নেই বলে দেরি না করে কুড়িগ্রাম রওয়ানা হলাম। রায়গঞ্জ এসে মোটর সাইকেল থামাতে হলো। রোস্তম ডাক্তার সাহেবের ছেলে মোহাম্মদ আলী কয়েকজনসহ পাকা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁরা আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন। যতটুকু সম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বললাম এবং চরম আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে বলে আহ্বান জানিয়ে চলতে শুরু করলাম। নাগেশ্বরী বাসস্ট্যান্ডের মোড়ে আওয়ামী লীগের ডাঃ রহমান ও ডাঃ ওয়াসেক আহমেদ সাহেব কয়েকজন লোকের সাথে কথা বলছিলেন। ডাঃ ওয়াসেক আমাকে দেখে হাত নেড়ে মোটর সাইকেল থামাতে বললেন। তিনি জানতে চাইলেন, রংপুর, সৈয়দপুর, পার্বতীপুর ও সান্তাহারে বিহারিরা বাঙালিদের হত্যা করছে কি না। মেয়েদেরকে তারা লাঞ্ছিত করছে এসব সঠিক কি না।

রংপুরের তাজহাট, মাহিগঞ্জ, পার্বতীপুর, সৈয়দপুর, সান্তাহার, দিনাজপুরে বিহারিরা বাঙালিদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করছে, নির্যাতন করে তাদের চোখ উপড়ে ফেলা হচ্ছে, মেয়েদের সম্ভ্রম হরণ ও নির্যাতন করা হচ্ছে, সান্তাহার, পার্বতীপুর স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে বাঙালিদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। বাবা-মা'র সামনে যুবতী মেয়েকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। স্ত্রীর সামনে স্বামীকে হত্যা করছে। টাকা-পয়সা-গহনা যা পাচ্ছে সর্বস্ব লুট করছে। এমনি এক নৃশংস হত্যার শিকার রাজশাহী স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা ডাঃ রইসউদ্দিন শিকদার। তিনি রাজশাহী থেকে ভুরুঙ্গামারী যাচ্ছিলেন। সান্তাহার স্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। মায়ের কোল থেকে নিষ্পাপ শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে ট্রেন থেকে ছুঁড়ে মারা হয়েছে। অগণিত মানুষকে চলন্ত ট্রেনের নিচে ফেলে হত্যা করা হয়েছে। চাকু ও ছুরির আঘাতে মানুষের পেট কেটে বিহারিরা উল্লাসে মেতে ওঠে। রংপুর ও দিনাজপুরকে বিহারিস্থান বলে বিহারিরা নামকরণ করেছে। --উপস্থিত সবাইকে এক নিঃশ্বাসে আমার শোনা সব ঘটনা জানালাম।

সবার চোখেমুখে গভীর হতাশার ছাপ। কেউ যেন কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। করণীয় কি? কি হবে? কেউ কিছু বলতে পারে না। ডাঃ ওয়াসেক সাহেবদের বেলায়ও তাই।

তাঁকে বললাম, 'মানসিক প্রস্তুতি নিন। আমাদের মরণ ঝাঁপ দিতে হবে। সময়মত অতিসত্বর সব জানতে পারবেন।' কথা শেষ করে দ্রুত বেগে মোটর সাইকেল চালিয়ে পাটেশ্বরী এসে থামলাম। বাসস্ট্যান্ডে রাস্তার ওপর ড্রাইভার ও অন্যরা জটলা করে দাঁড়িয়েছিল। ওরা আমাকে ঘিরে নানা প্রশ্ন করতে থাকে। আমি বললাম, 'বাঁচলে আমরা সবাই বাঁচবো, মরলেও সবাই এক সাথে মরবো। কোন চিন্তা নেই। আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। তোরা প্রস্তুত থাকবি। কয়েকদিনের মধ্যে তোদের প্রয়োজন হবে। সময় হলেই ডাকা হবে।' আমার কথায় প্রাণ পেয়ে আঙ্গুর, রঞ্জু, আনছার, খয়বর, রাব্বানী ড্রাইভার সমস্বরে 'জয়বাংলা' বলে শ্লোগান দিতে থাকে।

ধরলা চরের মাঝে এসে আমার মোটর সাইকেল বন্ধ হয়ে গেল। তেলের ট্যাঙ্কে তেল ঠিকই রয়েছে। প্লাগ খুলে পরিষ্কার করে লাগিয়ে স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু মোটর সাইকেল স্টার্ট করা গেল না। বালুচরের মধ্যে মোটর সাইকেল ঠেলে অনেক কষ্টে নদীর ঘাটে এসে দাঁড়ালাম। এখানে এসে মোটর সাইকেল ঠেলে নেয়ার লোক পাওয়া গেল। নদী পার হয়ে আবার বালুচরের মধ্য দিয়ে হেঁটে কুড়িগ্রাম এসে মিতালী সিনেমা হলের পাশে রহমত আলীর মোটর সাইকেল মেরামতের দোকানে আমার মোটর সাইকেলটি মেরামত করতে দিয়ে মাখনদার দোকানে চা খেতে বসলাম। মাখনদা রসমঞ্জুরি খেতে দিলেন। ছাত্রলীগ কর্মী নূর ইসলাম, মোহাম্মদ আলী বুলু, রুকু, আমানুর ও অন্যরা এলো। চা খাওয়া শেষে প্রথমে ঘোষপাড়া কন্ট্রোল রুম এবং পরে কলেজ হোস্টেলে এলাম। কর্নেল আর. দাসের সাথে আলোচনার বিষয় ও পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে রাতে আনিস মোল্লা, রওশন ও মঞ্জুর সাথে বিস্তারিত আলোচনা হলো।

উলিপুর, চিলমারী, নাজিম খাঁ, রাজারহাট, তিস্তা, লালমনিরহাট, মোগলহাট, বড়বাড়ি, কাঁঠালবাড়ি, টগরাইহাট, মহেন্দ্র নগর, পাইকপাড়া, সিনাই ইত্যাদি স্থানে আমরা ব্যাপক সফর ও জনসভা করলাম। চিলমারীর শওকত, চাঁদ, আওয়ামী লীগের কর্মী; উলিপুরের আমজাদ, মুকুট, আফজাল, লিয়াকত, বাচ্চা মিয়া; লালমনিরহাটের আবুল হোসেন সাহেব, হযরত আলী, মন্টু, ভোলা, লুৎফর, আবদুল হক, চিওদা; কাঁঠালবাড়ির জাফর, রুহুল আমিন, নজরুল ইসলাম সাহেব; টগরাইহাটের ছমির, শিক্ষক আমজাদ হোসেন; পাইকপাড়ার আবুল বসুনিয়াসহ সকল স্তরের মানুষের সংগ্রামী ভূমিকা আমাদেরকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করলো। এই সাথে বিশেষভাবে স্মরণীয় কুড়িগ্রামের জীপ ড্রাইভার মধু ও মন্টুর কথা। তাদেরকে রাতদিন যখন যেখানে যেতে বলা হয়েছে, তৎক্ষণাৎ ওয়াপদার টয়োটা জীপ ও উইলিস জীপ নিয়ে আমাদের সাথে ছুটে বেড়িয়েছে। চোখেমুখে কোন অনীহা প্রকাশ পায়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা ওয়াপদার নতুন টয়োটা জীপ ও একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উইলিস জীপ সংগ্রহ করেছি। পরবর্তীকালে সরকারি ও বেসরকারি জীপ, মোটর সাইকেল, বাস, ট্রাক এবং অন্যান্য যানবাহন সংগ্রহ করা হয়েছে।

কয়েকদিন আগেই কুড়িগ্রামের প্রত্যেকটি স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। কোর্ট বিল্ডিং ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে

আমরা পতাকা তুলতে গেলাম। মামুনুর রশীদ এস.ডি.ও আমাদেরকে বাধা দিলেন। এমন কি তিনি পুলিশের ভয় প্রদর্শন করলেন পর্যন্ত। জেদ চেপে গেলো। তাই সব ধরনের ভয়-ভীতি আর হুমকি উপেক্ষা করে কোর্ট বিল্ডিংসহ অন্যান্য সরকারি অফিসের পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলে স্বাধীন বাংলার পতাকা এস.ডি.ও'র বাসভবনসহ সব ধরনের সরকারি প্রতিষ্ঠানে উত্তোলন করা হলো। মামুনুর রশীদ এস.ডি.ও কোমর ভাঙ্গা সাপের মত ফোঁস ফোঁস করতে থাকেন। পুলিশ, সরকারি কর্মচারি/কর্মকর্তারা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানালেন। দ্বিতীয় অফিসার জনাব আবদুল হালিম ও ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবদুল লতিফ প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়ে আমাদের সাথে করমর্দন করলেন। এ সময় 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে সমগ্র কোর্ট বিল্ডিং কেঁপে উঠলো সাধারণ কর্মচারি/কর্মকর্তারা পাকিস্তানী দুঃশাসনের ভিত্তিমূলে লাথি মারলো।

চার

২২ মার্চ সকাল ছয়টায় কুড়িগ্রাম থেকে মোটর সাইকেলে রওশনসহ ভুরুঙ্গামারীর উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। পথে বিভিন্ন স্থানে বিলম্ব হওয়ার কারণে সকাল নয়টায় জয়মনিরহাট পৌঁছলাম। এখানে এক চায়ের দোকানে হঠাৎ করেই ই.পি.আর খলিল ও রাজ্জাকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাদেরকে রাস্তার পাশে ডেকে শামছুল হক চৌধুরী সাহেবের ভুরুঙ্গামারীস্থ বাসভবনে সত্বর আসার জন্য বলে ভুরুঙ্গামারী চলে এলাম। আসার সময় নবাব চৌধুরীকেও আসার জন্য বললাম। শামছুল হক চৌধুরী তাঁর বাসভবনের ভেতরে পায়চারী করছিলেন। তাঁকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তাঁর সাথে কথা বলার এক পর্যায়ে ভারতে যাওয়ার জন্য আবার তাঁকে অনুরোধ করলাম। তিনি কোন কথা বললেন না। ই.পি.আর রাজ্জাক, খলিল ও নবাব চৌধুরী আসার পর শামছুল হক চৌধুরীর সাথে আমাদের দীর্ঘক্ষণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। রাজ্জাক ও খলিলসহ আমরা তাঁকে ভারতে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করলাম। কিছুক্ষণ চুপ থেকে অবশেষে তিনি ভারতে যেতে সম্মত হলেন। নাগেশ্বরী থেকে মোজাহার হোসেন চৌধুরী এম.এন.এ ও ভেতরবন্ধ থেকে আবদুল হাকিম এম.পি.একে নিয়ে আসার জন্য তিনি আমাকে বললেন। ভুরুঙ্গামারী থানা আওয়ামী লীগের ফজলুর রহমান ও আব্দুল জব্বার সাহেবকে ডেকে এনে শামছুল হক চৌধুরীর কাছে রেখে আমি মোটর সাইকেলে প্রথমে ভেতরবন্ধ আব্দুল হাকিম সাহেবের বাড়িতে এলাম। রওশন কুড়িগ্রাম চলে গেল। আব্দুল হাকিম সাহেব স্ত্রীর মৃত্যুর কারণে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় ছিলেন বলে তাকে এই মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব হলো না। নাগেশ্বরীতে এসে এখানকার আওয়ামী লীগের সভাপতি ডাঃ ওয়াসেক আহমেদকে বাসস্ট্যান্ডের পাশে তাঁর ডিসপেনসারী থেকে সাথে নিয়ে বেপারীহাটের পুবে মোজাহার হোসেন চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে এসে তাঁকে ভুরুঙ্গামারী এবং পরে ভারতে যেতে হবে বললাম। তিনি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। কি করবেন আর কি

বলবেন, কিছুই ঠিক করতে পারছিলেন না। ডাঃ ওয়াসেক আহমেদ বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই, আমি সাথে রয়েছি।' তখন মোজাহার চৌধুরী আমার কাছে জানতে চাইলেন, 'শামছুল হক চৌধুরী ভারতে যাবেন কি না।' আমি বললাম, 'শামছুল হক চৌধুরী ভারতে যাবেন, তা'ছাড়া আপনাকে নেয়ার জন্য আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন।'

এরপর বেপারীহাটের আওয়ামী লীগের কর্মী হাসান ভাইসহ আমরা ভুরুঙ্গামারী এসে পৌছলাম। শামছুল হক চৌধুরী সাহেবের বাসভবনে ই.পি.আর রাজ্জাক, খলিল, ফজলার রহমান, আবদুল জাব্বার ও নবাব চৌধুরী অপেক্ষা করছিলেন। এখানে আলোচনায় বসা নিরিবিলি নয় ভেবে আমরা পাশেই স্কুল শিক্ষক তমিজউদ্দিন আহমদের বাসভবনের ভেতরের ঘরে আলোচনায় বসলাম। তাঁরা সবাই আমাকে নানা প্রশ্ন করছিলেন। আমি যথাসম্ভব উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম যেভাবে হোক তাঁদেরকে ভারতে নিয়ে যেতে হবে। অবশেষে ভারতে যাওয়ার জন্য সবাই একমত হলেন। রাজ্জাক ও খলিল জয়মনিরহাট চলে গেল। জনাব শামছুল হক চৌধুরী, মোজাহার হোসেন চৌধুরী, নবাব আলী চৌধুরী, ফজলার রহমান, ডাঃ ওয়াসেক আহমেদ ও হাসান আলীকে নিয়ে বিকেলে গোপনে ভুরুঙ্গামারী থেকে পাটেশ্বরী বাজারের পাকা রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের মধ্য দিয়ে নীরবে যতদূর সম্ভব দ্রুত দুধকুমার নদীর পুল অতিক্রম করলাম। পুল অতিক্রম করার পর পাকা রাস্তার দু'পাশে জঙ্গলের ভেতরে আসার পর মোজাহার চৌধুরী নীরবতা ভঙ্গ করে আমাকে বললেন, 'বাবা আখতার ভারতে যাচ্ছি তো ঠিকই, বাড়িতে ফিরে আসতে পারবো তো?' আমি হেসে বললাম, '২/১ দিনের মধ্যেই আমরা ফিরবো।' আসলে আমি জানতাম না সত্বর ফিরতে পারবো কি না।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগেই আমরা সোনাহাট (বাংলাদেশ) এসে পৌছলাম। সোনাহাট বাজারের ভেতর থেকে রহিমউদ্দিন মন্ডল ও শিক্ষক আবদুল গফুরকে ডেকে এনে মানিক কমান্ডারের ঘরে বসা হলো। ডাঃ মোজাহার হোসেন, শিক্ষক যথাক্রমে আজাহার নুরী, আবুল কাসেম, রোস্তম আলী, আনোয়ার হোসেন, ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান, আয়েজউদ্দিন কমান্ডারসহ একে একে অনেকেই এসে ভিড় করলো। জনাব শামছুল হক চৌধুরী উপস্থিত সবাইকে ধৈর্য ধরতে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বললেন। সন্ধ্যার পর অন্ধকার নেমে এলে আয়েজউদ্দিন কমান্ডারের বাড়ির ভেতরে মোটর সাইকেল রেখে আমাদের গ্রামের বাড়ি যাওয়ার কথা বলে পাকা রাস্তা দিয়ে পুব দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। রহিমউদ্দিন মন্ডল ও শিক্ষক আব্দুল গফুর সাহেবের সাহায্যে পরিত্যক্ত রেললাইনের ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে উঁচুনিচু পথ ও পাথরের টিবি অতিক্রম করে সোনাহাট বি ও পি (ই.পি.আর ক্যাম্প) হাতের ডানে রেখে উত্তর দিয়ে পুব দিক অভিমুখে একজনের পর একজন এক সারিতে এগিয়ে চলছি ভারতের সোনাহাট বি.এস.এফ (আসাম) ফাঁড়ির উদ্দেশ্যে। সারির প্রথমে জনাব রহিমউদ্দিন মন্ডল, শিক্ষক আঃ গফুর, শামছুল হক চৌধুরী, মোজাহার হোসেন চৌধুরী, হাসান আলী ব্যাপারী, ফজলার রহমান, নবাব আলী চৌধুরী এবং শেষে আমি। একজন আর একজনকে অনুসরণ করে কোন শব্দ না করে চুপি চুপি চলেছি। এইভাবে একসময়

বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে ভারতের (আসাম) মাটিতে প্রবেশ করে মাঝে মাঝে জঙ্গল আর ক্ষেতের সরু আল দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে সরু আল থেকে পা ফসকে যাচ্ছে আর অজানা আশঙ্কার শিহরণে বুকটা উঠছে কেঁপে। নবাব চৌধুরী হঠাৎ তাঁর একহাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না জড়ানো ভাঙ্গা স্বরে বললেন, 'বাবা এভাবে আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?' স্বভাবগতভাবে তিনি একজন ভীতু প্রকৃতির মানুষ। টিকটিকি, কেঁচোকে তিনি ভয় পান। সন্ধ্যার পর ভূতপেত্নীর কথা শুনলে চোখ বন্ধ করে একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকেন। অন্য কাউকে এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে হয়। আমরা বি.এস.এফ সীমান্ত ফাঁড়ির রাস্তায় উঠে দাঁড়ালাম। কর্নেল আর. দাস, ক্যাপ্টেন যাদব, ক্যাপ্টেন জেম্স্, সুবেদার রবীন মেহেরা ও বি.এস.এফ সদস্যবৃন্দ আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। পরিচয়পর্ব শেষে কর্নেল আর. দাস আবার শামছুল হক চৌধুরীর সাথে করমর্দন করে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। পরিচয়পর্বকালে এক আন্তরিক অনুভূতির সূচনা ও পরিবেশের সৃষ্টি হলো। চা-পানের সময় থেকে আলোচনা শুরু হলো। একের পর এক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে থাকলো। রাত একটার সময় বি.এস.এফ ফাঁড়ির পাশের এক বাড়িতে আমাদের সবাইকে নিয়ে যাওয়া হলো। এখানে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি রাতেই সীমান্ত পার হয়ে রহিমউদ্দিন মন্ডলের বাড়িতে রাতের অবশিষ্ট ২/৩ ঘন্টা কাটিয়ে ২৩ মার্চ সকালে আবার সোনাহাট বি.এস.এফ ফাঁড়ি এবং ফাঁড়ির পাশের বাড়িতে গিয়ে শামছুল হক চৌধুরী ও অন্যান্যের সাথে দেখা করে ভুরুঙ্গামারী চলে আসলাম। আজ সকালে ভারতীয় বি.এস.এফ কর্মকর্তাদের সাথে আরো এক দফা আলোচনা শুরু হবে, সে কারণে তাঁরা সেখানে থেকে গেলেন। ভুরুঙ্গামারীতে গুজব রটে গেছে যে, শামছুল হক চৌধুরী আত্মগোপন করেছেন। তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে যাদের সাথে দেখা হলো, তাদেরকে বললাম, শামছুল হক চৌধুরীকে দু'একদিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। দুশ্চিন্তা করার বা হতাশ হওয়ার কিছু নেই। তাঁর অনুপস্থিতিতে থানার দারোগা শামছুল রসুল মুন্সী, ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াউদ্দিন আহমেদ, কর্মচারী, কর্মকর্তা, ব্যবসায়ীসহ সকল শ্রেণীর মানুষ যেন অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে।

পাঁচ

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৪ মার্চ সকাল আটটায় নাগেশ্বরী বাসস্ট্যান্ডে আমি উপস্থিত হলাম। রওশন ও আনিস মোল্লা তখনও পৌঁছেনি। বাসস্ট্যান্ডে বাচ্চুর দোকানের পাশের চা দোকানে বসার পর হঠাৎ করে আমাকে দেখে উপস্থিত লোকজন অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাচ্ছিল। এমন সময় নাগেশ্বরী এলাকার মুসলিম লীগের কট্টর সমর্থক ও পাঞ্জাবিদের একনিষ্ঠ দালাল ওদুদ খান এসে আমাকে দেখে প্রায় ক্ষেপে বললো, ' তোমরা আর যা কর পাকিস্তানকে ভাঙ্গতে পারবে না।' আমি বললাম, 'এখনও সময় আছে, মনোভাব পরিবর্তন করে প্রকৃত অবস্থা বোঝার চেষ্টা করুন। গোটা বাঙালি জাতি একই সুরে কথা

বলছে। আপনারা দু'একজন বিরোধিতা করে নিজেদের বিপদ ডেকে নিয়ে আসছেন।' ঠিক এসময় আমাদের জীপ হর্নের শব্দ করে দোকানের সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। আমি আর কথা না বলে দোকান থেকে বের হয়ে জীপে উঠে বসলাম। জীপ ছুটে চললো সোজা পথ ধরে উত্তরদিকে। জীপে আমি ছাড়া ড্রাইভার মন্টু, আনিস মোল্লা ও রওশন। মন্টুকে একটু ধীরে জীপ চালাতে বললাম। কেউ কোন কথা বলছি না। নীরবতা ভেঙ্গে আনিস মোল্লা বললো, 'আজ যে ভাবেই হোক সুবেদার মারবো, নয় নিজে মরবো।' রওশন বললো, 'আমরা শেষ বিদায় নিয়ে এসেছি।' আমি বললাম, 'ইনশাল্লাহ আমাদের অভিযান অবশ্যই সফল হবে।' বেপারীহাটের উত্তরের রাস্তা সংলগ্ন পশ্চিম পাশের কবরস্থানে আরো ধীরে জীপ চালাতে বললাম। আরো কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর রাস্তার মোড়ে এসে মনে পড়লো, এই জায়গায় ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের পর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ৪/৫ দিন আগে আমার মোটর সাইকেলের আঘাতে এক বৃদ্ধা মহিলা মৃত্যুবরণ করে। রায়গঞ্জ অতিক্রম করার সময় দেখা গেল, এই এলাকার আওয়ামী লীগ কর্মী খবির হোসেন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁত পরিষ্কার করছে। আমাদের দেখে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানালো কি থামতে বললো, বোঝা গেল না। আমাদের জীপ ততক্ষণে পুলের ওপর উঠে গেছে। আন্ধারী ঝাড় ছেড়ে প্রায় জয়মনিরহাটের কাছে এসে গেছি। নবাব চৌধুরী সাহেবের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন জীবনপণ মারাত্মক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে--এমন একটা অনুভূতি আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। প্রায় সাড়ে ন'টায় জয়মনিরহাট পৌঁছে গেলাম। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের সাথে কোন কথা না বলে দ্রুত রেললাইনের উত্তর পাশ দিয়ে ই.পি.আর ক্যাম্পের পেছনে একটু দূরে গাছের নিচে জীপ থামলো। ই.পি.আর-এর পোশাক পরিহিত আনিস মোল্লা স্টেনগান হাতে তড়িৎ গতিতে জীপ থেকে নেমে ক্যাম্পে ঢুকে পড়লো। রওশন ও আমি জীপের দু'পাশে আক্রমণ প্রতিহত করার ভঙ্গিতে পুব এবং দক্ষিণ দিক বরাবর আড়াআড়ি দাঁড়ালাম। কুড়িগ্রামের এক বিহারির কাছ থেকে কয়েকদিন আগে জোর করে ছিনিয়ে নেয়া দু'নলা বন্দুক আমার হাতে। কুড়িগ্রাম থেকে আসার সময় জীপে করে বন্দুকটি রওশন নিয়ে এসেছে। জীপের স্টার্ট বন্ধ করে স্টিয়ারিং হাতে ড্রাইভার সীটে মন্টু বসে থাকলো। ই.পি.আর ক্যাম্পের সেন্ট্রি আনিস মোল্লাকে স্যালুট করে দাঁড়ালো। সুবেদার কোথায় জানতে চাইলে সেন্ট্রি সুবেদারের অবস্থান আনিস মোল্লাকে দেখিয়ে দিল। ৫/৬ জন বাঙালি ই.পি.আরকে নিয়ে সুবেদার একটি ঘরে তাস খেলছিল। আনিস মোল্লা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্যালুট করে বললো, 'রংপুর হেড কোয়ার্টার থেকে ম্যাসেজ রয়েছে।' সাদা হাফ হাতা গেঞ্জি ও নীল সাদা ডোরা কাটা পাজামা পরিহিত পাঞ্জাবি সুবেদার দাঁড়িয়ে পাজামার ফিতা ঠিক করতে করতে বাইরে এসে বললো, 'দেখাও কিস্‌কা ম্যাসেস।' আনিস মোল্লা তৎক্ষণাৎ সুবেদারের বুক বরাবর গুলি চালালো। সুবেদার মেঝেতে পড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে প্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল। সেন্ট্রি রাইফেল তাক করলো আনিস মোল্লার দিকে, ই.পি.আর রফিক কুয়োর পাড়ে কাপড় কাচছিলো। সে দৌড়ে এসে সেন্ট্রিকে জাপটে ধরে রাইফেল কেড়ে নিল। আমি ততক্ষণে গুলি ভর্তি

বন্দুক হাতে নিয়েছি। একজন অবাঙালি ই.পি.আর আনিস মোল্লার একটু দূর দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আনিস মোল্লা হাঁটু গেড়ে বসে গুলি করে তাকে হত্যা করলো। ইতিমধ্যে দ্রুত বাঙালি ই.পি.আর সদস্যরা সমবেত হয়েছে। এখানে সুবেদারসহ পাঁচজন অবাঙালি ই.পি.আর ছিল। দু'জন অবাঙালি ই.পি আর ওয়্যারলেস রুমের দরজা বন্ধ করে গুলি চালাতে শুরু করলো। মুহূর্তের মধ্যে খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বাজারে চায়ের দোকানে একজন অবাঙালি ই.পি.আর বসে ছিল। মুহূর্তের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীসহ উপস্থিত সব শ্রেণীর মানুষ তাকে পিটিয়ে হত্যা করলো। শত শত মানুষ ই.পি.আর কোম্পানি হেড কোয়ার্টার ঘিরে ফেললো। আমরা ওয়্যারলেস রুমের দরজার দিক থেকে থেকে গুলি ছুঁড়ছিলাম কিন্তু লুকিয়ে থাকা অবাঙালি ই.পি.আর দু'জনকে ঘায়েল করা যাচ্ছিল না। উপস্থিত জনতা ঐ কক্ষের পেছন দিক থেকে ছাদে উঠে আঙিনা ও দরজার ওপর বেশি করে খড় ছিটিয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিল। কয়েক রাউন্ড গুলি চালানোর পর ওরা নিশ্চুপ হয়ে গেল। অবাঙালি দু'জন মারা গেছে ভেবে আগুন নেভানোর পর ওই কক্ষে প্রবেশ করা হলো। দু'জনেই মৃত, মুখের নিচ দিয়ে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেছে এবং আগুনে শরীর পুড়ে ঝলসে গেছে।

জয়মনিরহাটে দেরি না করে আমরা ভুরুঙ্গামারী চলে এলাম। এখানে এসে দেখলাম, শত শত মানুষ লাঠি সড়কি হাতে 'জয়বাংলা' ধ্বনিতে প্রকম্পিত করে তুলছে আর ছোটাছুটি করছে। বাজারের চৌমাথায় আমাদের জীপ থামালাম। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মী বাহিনীসহ শত শত মানুষ আমাদেরকে ঘিরে দাঁড়ালো। খবর পেলাম বাগভান্ডার বি ও পি ক্যাম্পের অবাঙালি হাবিলদার সুফী অন্যান্য বাঙালি ই.পি.আরসহ মইদাম ক্যাম্পের দিকে চলে গেছে। বাগভান্ডার বি ও পিতে একজন হাবিলদারসহ দু'জন অবাঙালি ও ই.পি.আর ছিল। চতুর পাঞ্জাবি হাবিলদার সুফী কয়েকদিন আগেই কৌশলে বাঙালি ই.পি.আর-দের সব অস্ত্র নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেয়। জয়মনিরহাটের খবর পাওয়ার সাথে সাথে বাঙালি ই.পি.আর-দের অস্ত্রের মুখে লাইন করে দাঁড় করায় এবং পেছন থেকে অস্ত্র ধরে তাদেরসহ হেঁটে মইদাম বিওপিতে সুফী আশ্রয় গ্রহণ করে। মইদাম বিওপিতে এর আগে থেকেই প্রচুরসংখ্যক অবাঙালি ই.পি.আর ছিল। তারা বাঙালি ই.পি.আর-দের অস্ত্র একইভাবে তাদের আয়ত্তে রাখে। আমরা ধলডাঙ্গা রওয়ানা হব এমন সময় হাবিলদার কলিমউদ্দিন এসে বললো, ধলডাঙ্গা বিওপিতে মাত্র একজন অবাঙালি ই.পি.আর রয়েছে, সে নিজেই তাকে হত্যা করতে পারবে। হাবিলদার কলিমউদ্দিন কিছুক্ষণ আগে এখানে এসেছিল এবং তৎক্ষণাৎ সাইকেল চালিয়ে ধলডাঙ্গার উদ্দেশে চলে গেল। আমরা শামছুল হক চৌধুরীর বাসভবনে এসে সবাই দই খেয়ে সোনাহাটের দিকে রওয়ানা হলাম। সোনাহাট বিওপিতে একজন, বহালগুড়ি বিওপিতে একজন, মাদারগঞ্জ বিওপি ও কোম্পানি হেড কোয়ার্টারে একজন সুবেদারসহ তিনজন অবাঙালি ই.পি.আর ছিল। শিলখুড়ি, বলদিয়া, কচাকাটা ও নাইকের হাট বিওপিতে কোন অবাঙালি ই.পি.আর ছিল না। ফুলবাড়ি থানার অনন্তপুর ও নাগেশ্বরী থানার রামখানা সীমান্ত ফাঁড়ির অবাঙালি ই.পি.আর তাঁদের বিপদ আঁচ করে ২/১ দিন আগেই

রাতে পালিয়ে মইদাম ফাঁড়িতে আশ্রয় নেয়। আমরা সরাসরি সোনাহাট সীমান্ত ফাঁড়ির গেটের বাইরে রাস্তার পাশে গাছের নিচে জীপ দাঁড় করালাম। আনিস মোল্লা ফাঁড়িতে ঢুকে ঘুমন্ত একমাত্র অবাঙালি ই.পি.আরকে অতর্কিতে গুলি করে হত্যা করলো। গুলির শব্দ শুনে বি.এস.এফ সীমান্ত ফাঁড়ির সদস্যরা পরিত্যক্ত উঁচু রেললাইনের ওপর এসে অবস্থান গ্রহণ করেন। বি.এস.এফ সীমান্ত ফাঁড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা এই রেললাইনের পাশে এসে দাঁড়ালাম। কর্নেল আর. দাস, ক্যাপ্টেন যাদব ও সুবেদার রবীন মেহেরা আমাদেরকে অভিনন্দন জানালেন। আনিস মোল্লাকে তাঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম, সেই সাথে আমাদের জীবন বাজি রাখা অভিযানের প্রত্যাশিত সাফল্যের সংবাদ জানালাম। আমরা বি.এস.এফ সীমান্ত ফাঁড়িতে গিয়ে জনাব শামছুল হক চৌধুরীসহ সবাইকে সুবেদার হত্যা অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা দিলাম। নবাব চৌধুরীকে সাথে নিয়ে শামছুল হক চৌধুরী তাঁর গ্রামের বাড়িতে, মোজাহার হোসেন চৌধুরী ও ডাঃ ওয়াসেক আহমেদ নাগেশ্বরী এবং ফজলার রহমান ভুরুঙ্গামারী চলে গেলেন। আমরা ভুরুঙ্গামারী এসে জানতে পারলাম, কলিমউদ্দিন হাবিলদার ধলডাঙ্গা সীমান্ত ফাঁড়িতে পৌঁছেই একমাত্র অবাঙালি ই.পি.আরকে ফাঁড়ির পাশে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে। ভুরুঙ্গামারীতে সকল সীমান্ত ফাঁড়ির বাঙালি ই.পি.আর-দেরকে সমবেত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। রওশন ও আনিস মোল্লা কুড়িগ্রাম চলে গেল। এরপর ই.পি.আর সদস্যদের ভুরুঙ্গামারী সমবেত করার জন্য শিক্ষক জনাব মজিবর রহমান ও পাটেশ্বরীর গেন্দু মিঞার ৪/৫ টি বাস ও ৩টি ট্রাক সংগ্রহ করা হলো। ধলডাঙ্গা ও শিলখুড়ির ই.পি.আর সদস্যদের ভুরুঙ্গামারীতে সমবেত হওয়ার খবর পাঠিয়ে আমি মোটর সাইকেলে নায়েক খলিলকে নিয়ে বহালগুড়ি সীমান্ত ফাঁড়িতে এসে ই.পি.আর সদস্যদের অস্ত্রসহ অন্যান্য মালামাল নিয়ে ভুরুঙ্গামারী রওয়ানা হতে বললাম। বহালগুড়ি ফাঁড়ির খবর পেলাম, অবাঙালি সদস্যরা বিহারি ই.পি.আর-দের হত্যা না করে ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ই.পি.আর সদস্যরা তাদের মালামাল গরু গাড়িতে তুলতে শুরু করলো। বহালগুড়ি থেকে সোনাহাট সীমান্ত ফাঁড়িতে এসে ই.পি.আর-দের ভুরুঙ্গামারী যাওয়ার জন্য তৈরি হতে বলে বলদিয়া, কচাকাটা ও নাইকের হাট সীমান্ত ফাঁড়িতে গেলাম। কচাকাটা ও নাইকের হাট ফাঁড়ির ই.পি.আর-দের বলদিয়া সীমান্ত ফাঁড়িতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমবেত হতে বললাম। সোনাহাট ও বলদিয়া ফাঁড়ির সমবেত ই.পি.আর-দের বাস ও ট্রাকে করে ভুরুঙ্গামারী নিয়ে যাওয়া হবে। নাইকের হাট থেকে কচাকাটা ফিরলাম। এখান থেকে মাদারগঞ্জ যাবো। কিন্তু উপস্থিত মানুষ ও ই.পি.আর সদস্যরা মাদারগঞ্জ যেতে বাধা দিল। এখানে শুনতে পেলাম, মাদারগঞ্জ ই.পি.আর কোম্পানি হেড কোয়ার্টারের অবাঙালি সুবেদার আসলাম খান ও সহযোগী তিনজন অবাঙালি ই.পি.আর বাঙালি ই.পি.আর-দের অস্ত্র কৌশলে নিজেদের আয়ত্তে রেখে ফাঁড়ি দখল করে রেখেছে। আরো শুনলাম, বাঙালি ই.পি.আররা ফাঁড়ি থেকে বের হতে পারেনি। এ ছাড়া মাদারগঞ্জের প্রভাবশালী ব্যক্তি মুসলিম লীগ সমর্থক চেয়ারম্যান বন্দুক হাতে মাদারগঞ্জে প্রবেশ করার একমাত্র পথ পাহারা দিচ্ছে এবং বাইরে থেকে আমাদের কোন কর্মীকে

সেখানে যেতে দেয়া হচ্ছে না। আমাদের কর্মী ইয়াছিন, মাহবুব ও আবুল হোসেন সাহেব প্রমুখকে ধৈর্য ও অপেক্ষা করার অনুরোধ জানিয়ে বলদিয়া ও সোনাহাট হয়ে ভুরুঙ্গামারী ফিরলাম। সন্ধ্যার পর তিনটি বাস সোনাহাট পাঠিয়ে দেয়া হলো। রাত ৮টায় ই.পি.আর খলিলকে সাথে নিয়ে আবার সোনাহাট সীমান্ত ফাঁড়িতে এলাম। এলাকার আনসার ও মুজাহিদরা এই ফাঁড়িতে সমবেত হয়েছে। বলদিয়া ফাঁড়িতে সমবেত ই.পি.আর ও আনসারদের সোনাহাট আসার সংবাদ দিয়ে আনসার কমান্ডার মোজাম্মেল হক মন্ডলকে প্রেরণ করা হলো। সোনাহাট থেকে বলদিয়া পর্যন্ত রাস্তা কাঁচা বলে বাস যেতে পারবে না। তাই বলদিয়া ফাঁড়িতে সমবেত ই.পি.আর-দের সোনাহাট আসতে বলা হলো। বলদিয়া সীমান্ত ফাঁড়িতে কতজন সমবেত হয়েছে জানার জন্য রাত সাড়ে ন'টায় খলিলসহ বলদিয়া ফাঁড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। কাঁচা রাস্তা আর শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে মোটর সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি। মোটর সাইকেলের চাকা পিছলে পড়তে চায়। শেষে নায়েব আলী সরকারের বাড়ি হাতের ডানে রেখে বড় রাস্তা থেকে বামে নেমে সুপারির গাছ ও বাঁশের ঝোপের মাঝ দিয়ে ফাঁড়ি লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় অকস্মাৎ ফাঁড়ির দিক থেকে এল.এম.জি'র ব্রাস ফায়ার শুরু হলো। আমি মোটর সাইকেল বন্ধ করে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। খলিল আমার আগেই শুয়ে পড়েছে। শুয়ে অপেক্ষা করছি, কিন্তু আর কোনো গুলির শব্দ হলো না। আমরা উঠে মোটর সাইকেল ঠেলে নিয়ে ফাঁড়িতে প্রবেশ করলাম। সুবেদার আসলাম খান অবাঙালি ও বাঙালি ই.পি.আর-দের সাথে নিয়ে মাদারগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে বলদিয়া ফাঁড়ির সামনে এসে ফাঁড়ির ওপর অতর্কিতে গুলিবর্ষণ শুরু করে। ফাঁড়ির ভেতর থেকে পাল্টা গুলি চালালে বাম কাঁধে গুলিবিদ্ধ হয়ে একজন বাঙালি ই.পি.আর আহত হয়। বাকি সঙ্গীদেরকে নিয়ে সুবেদার সরে পড়ে। আহতকে স্থানীয় ডাক্তার দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে রাতেই ফাঁড়ির সব ই.পি.আরকে সোনাহাট আসতে বলে ভুরুঙ্গামারী চলে এলাম। রাতের অন্ধকারে দুধকুমার নদীর পুলের ওপর দিয়ে মোটর সাইকেল চালিয়ে আসতে অল্পের জন্য মারাত্মক দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলাম। খলিল মোটর সাইকেলের পেছন থেকে ছিটকে পড়ে যায়।

এখানে এসে জানলাম, ভুরুঙ্গামারী সমবেত ই.পি.আর সদস্যদের মধ্য থেকে দুই প্লাটুন সৈন্য মইদাম ফাঁড়িতে আশ্রয় নেয়া হাবিলদার সুফীসহ অবাঙালি ই.পি.আর ও অন্যদেরকে ঘিরে রেখেছে। যেকোন মুহূর্তে সংঘর্ষ বাধতে পারে। স্কুল, কলেজ, সিও অফিস ও বাজারের কয়েকটি স্থানে ই.পি.আর-দের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। ব্যবসায়ীসহ সকল শ্রেণীর মানুষ বিভিন্নভাবে সহায়তার জন্য এগিয়ে এলো। ই.পি.আর-দের সমবেত হওয়া ও ক্রমশ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে দেখে আমাদের মনোবল আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভুরুঙ্গামারী বাজার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে উত্তেজনা ও সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। খলিল, রাজ্জাক ও খালেকসহ বিভিন্ন কাজে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করে সারারাত নির্ঘুম অবস্থায় কাটালাম। সিও অফিসের দক্ষিণে শিক্ষক হাকিম শিকদারের বাড়িতে ই.পি.আর খলিল, খালেক, রাজ্জাক,

কলিমউদ্দিন এদের নিয়ে বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। ভোর ছ'টায় খবর পেলাম, হাবিলদার সূফী অবাঙালি সহযোগীদেরকে নিয়ে গোপনে মইদাম ফাঁড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। আমাদের দু'টি প্লাটুন খোঁজ নিয়ে তাদের পেছনে পেছনে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা অনুমান করলাম, সূফীরা সম্ভবত সীমান্ত বরাবর শিংঝাড়, রামখানা, ফুলবাড়ি দিয়ে ধরলা নদী পার হয়ে লালমনিরহাট অথবা রংপুর চলে যাবে। সকল সাতটায় ষ্টেনগানসহ নায়েক খলিলকে সাথে নিয়ে কুড়িগ্রাম ছুটে চললাম। পাটেশ্বরীর কাছে এসে আমার মোটর সাইকেলের পেছনের চাকা ফুটো হয়ে গেল। এ সময় একটি ট্রাক আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। আমাদেরকে দেখে ড্রাইভার ট্রাক থামালে মোটর সাইকেলের চাকা ভাল করার জন্য পাটেশ্বরী থেকে মেকানিক পাঠাতে বললাম। অল্পক্ষণের মধ্যে একটি বাসে মেকানিক এসে মোটর সাইকেলের চাকা মেরামত করে দিল। দুর্দিনে পারস্পরিক সাহায্যের এ এক অনুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা সবাই এক হয়ে গেছি--এ এক অনন্য অনুভূতি।

কুড়িগ্রাম এসে ঘোষপাড়াস্থ কন্ট্রোল রুম থেকে টেলিফোনে লালমনিরহাট অভিমুখে সূফীদের পলায়নের খবর দিয়ে কুলাঘাট ধরলা পাড়ে আমাদের লোক প্রেরণের জন্য বলা হলো। তখন পর্যন্ত লালমনিরহাট আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কয়েকটি মহল্লায় বিহারিরা দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করে কিন্তু মানুষের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তারা এ অপকর্মে লিপ্ত হতে পারেনি। লালমনিরহাট থেকে পুলিশ, ছাত্র, যুবক এবং শত শত মানুষ কুলাঘাটের দিকে ছুটে যায়। সূফী তার সঙ্গীদের নিয়ে ধরলা নদী পার হয়ে কুলাঘাটের পাশে এক মসজিদে আশ্রয় নেয়। তাদের অনুসরণরত আমাদের প্লাটুন দু'টির যোদ্ধারা মসজিদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে সূফীকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু অবাঙালি ই.পি.আররা আত্মসমর্পণ না করে গুলি চালাতে শুরু করে। ফলে সূফীদের সাথে আমাদের বাঙালি ই.পি.আর-দের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। হাজার হাজার গ্রামবাসী বাঙালি ই.পি.আর-দেরকে সাহায্য ও সহায়তা করতে থাকে।

মসজিদকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ই.পি.আর লুৎফর রহমান এক পর্যায়ে হামাগুড়ি দিয়ে মসজিদের কাছে এগিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে এল.এম.জি'র গুলি চালিয়ে সূফীকে হত্যা এবং অন্যদেরকে হতাহত করে। এসময় শত্রুপক্ষের একটি গুলি এসে কপালে বিদ্ধ হয়ে লুৎফর রহমান শহীদ হলেন। এই যুদ্ধে সূফীসহ তেরোজন অবাঙালি ই.পি.আর নিহত হন। এই যুদ্ধে প্রথম ই.পি.আর লুৎফর বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে এই এলাকার প্রথম শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন। কুলাঘাটের এই মসজিদের পাশেই বাংলার বীর সন্তান শহীদ লুৎফর রহমানকে দাফন করা হয়।

বলদিয়া সীমান্ত ফাঁড়িতে গুলিবর্ষণ করে মাদারগঞ্জ সীমান্ত ফাঁড়ির সুবেদার আসলাম খান সোনাহাটের দিকে অগ্রসর হয়। পথে আনসার কমান্ডার মোজাম্মেল হকের সাথে দেখা হলে তাকে পথ দেখিয়ে সোনাহাট ফাঁড়িতে নিয়ে যেতে বলে। মোজাম্মেল হক অন্ধকারে সোনাহাট না গিয়ে অন্য পথ ধরে অবশেষে বানুরকুটি হাসর পন্ডিতের বাড়িতে তাকে নিয়ে এসে পানি খাওয়ার কথা বলে বাড়ির ভেতরে এসে রহিম মন্ডলের

কাছ থেকে নেয়া দু'নলা বন্দুকে গুলি ভর্তি করে। বন্দুকে গুলি ভর্তি করার শব্দ পেয়ে আসলাম খান সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সকালে সুবল পাড় এসে অস্ত্রের মুখে মাঝিকে নৌকা চালাতে বাধ্য করে। মুক্তিপাগল হাজার হাজার মানুষ লাঠি, দা, কোচ, ফালা ইত্যাদি নিয়ে নদীর দুই পাড়ে সমবেত হয়। সুবেদার আসলাম খান দিশেহারা হয়ে জনতাকে ভয় দেখানোর জন্য শূন্যে গুলি ছুঁড়তে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে গুলি শেষ হয় এবং নৌকা পাড়ে ভেড়ে। সুবেদার আসলাম খান দু'হাত জোড় করে জনতার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চায়। সমবেত জনতাকে তাদের অস্ত্র দূরে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলে তারা সে নির্দেশ পালন করে এবং নদীর পাড়ে অস্ত্র ফেলে দেয়। সুবেদার আসলাম খান এবং তিন সহযোগী নৌকা থেকে পাড়ে ওঠার সাথে সাথে হাজার হাজার মানুষ তাদেরকে পিটিয়ে হত্যা করে।

রওশন,আনিস মোল্লা, খলিলসহ দুপুর দুটোয় ভুরুঙ্গামারী এসে শামছুল হক চৌধুরীকে পেলাম না। তিনি তখনও ভুরুঙ্গামারীতে আসেননি। আমি চরবলদিয়াস্থ গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ও নবাব চৌধুরীকে নিয়ে ভুরুঙ্গামারী এসে ই.পি.আর প্রতিনিধি রাজ্জাক, খলিল, আনিস মোল্লা, কলিমউদ্দিন এবং আমরা সিও অফিসে আলোচনায় বসলাম। ই.পি.আর, ছাত্র, আনসার এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণেচ্ছু যুবকদের নিয়ে তিস্তা পুলের উত্তর পাশ বরাবর অর্থাৎ তিস্তা এলাকার নদীর পাড় ঘেঁষে ২৬ মার্চ প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। এতে করে সমগ্র মহকুমা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে বলে মত প্রকাশ করা হলো। এ ছাড়া ভুরুঙ্গামারীকে প্রধান ঘাঁটি ও সিও অফিসকে কন্ট্রোল রুম, ভুরুঙ্গামারী হাই স্কুল, ভুরুঙ্গামারী কলেজ এবং সোনাহাটকে ছাত্র ও যুবকদের অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার বিষয়ে কার্যকরী সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গৃহীত হলো। জয়মনিরহাট, রায়গঞ্জ, নাগেশ্বরী, পাটেশ্বরী, কাঁঠালবাড়ি, টগরাইহাট, চিলমারী, বড়বাড়ি, রাজারহাট, লালমনিরহাটে প্রয়োজন অনুযায়ী অবস্থান ও ব্যবহারের জন্য মধ্যবর্তী ঘাঁটি এবং কুড়িগ্রামকে দ্বিতীয় প্রধান ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। ই.পি.আর সদস্যরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। থানা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ, থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা শামসুর রসুল মুন্সী, গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার মকবুল হোসেন, সিও (রাজস্ব) মোহাম্মদ আলী, ফিল্ড কানুনগোসহ প্রায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ভুরুঙ্গামারী প্রধান ঘাঁটি ও কন্ট্রোল রুমের প্রধান হিসেবে জনাব শামছুল হক চৌধুরী দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। প্রধান ঘাঁটি, ঘাঁটিসমূহ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অবস্থানসমূহে খাদ্যদ্রব্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য নিম্ন উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ একনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। ভুরুঙ্গামারীর ফজলার রহমান, আব্দুল জব্বার সরকার, নবাব আলী চৌধুরী, ভাইস প্রিন্সিপাল আব্দুল জলিল সরকার, শিক্ষক শাহাদৎ হোসেন, কফিলউদ্দিন বেপারী, আব্দুল কাদের বেপারী, আঃ হাকিম শিকদার, ইসাহাক আলী বেপারী, জয়নাল আবেদীন খোকা, ডাঃ নিয়ামত আলী আকন্দ, চেয়ারম্যান পশিরউদ্দিন আহমেদ, শ্রী ফণীভূষণ সাহা, শিক্ষক মধুসূদন সাহা, শিক্ষক তমিজউদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক আবদুল মান্নান, শিক্ষক

আবু সাঈদ, শিক্ষক সৈয়দ মন্ডল, বন্দে আলী, বসিরউদ্দিন, নজরুল ইসলাম বেপারী, আবুল হোসেন, আবদুল কাদের, ইব্রাহিম আলী, ডাঃ মজিবর রহমান, শিক্ষক আজিমউদ্দিন ও শ্রী সুরেন্দ্র নাথ দেব; সোনাহাটের রহিমউদ্দিন মন্ডল, আলাউদ্দিন মন্ডল, শাহবাজউদ্দিন মন্ডল জাকু, শিক্ষক আজাহার আলী, শিক্ষক আনোয়ার হোসেন, শিক্ষক রোস্তম আলী, শিক্ষক আবুল কাশেম, আয়েজউদ্দিন কমান্ডার, মানিক আলী কমান্ডার, হাবিবুর রহমান, ডাঃ মোজাদ্দার হোসেন, আবদুল হাকিম মন্ডল, শামসুল আলম পাঠান; রায়গঞ্জের ডাঃ রোস্তম আলী, খবির হোসেন, মিজানুর রহমান মন্ডল, বাদল, মোহাম্মদ আলী; নাগেশ্বরীর মোজাহার হোসেন চৌধুরী, ডাঃ ওয়াসেক আহমেদ, ডাঃ আঃ রহমান, আবুল কাশেম, চপল বাবু, শ্রী শ্যামল কুমার, হাসান আলী বেপারী, মোজাম্মেল হক প্রধান, অধ্যাপক আব্দুল হাই; কুড়িগ্রামের আব্দুল কুদ্দুস নান্নু, রওশন, মজু মন্ডল, সাচ্চু, আহমদ বকসী, সামাদ মিঞা, প্রাণবল্লভ করণজাই, সৈয়দ মনসুর আলী টুংকু, পনিরউদ্দিন আহমেদ (ব্যবসায়ী), আব্দুল জব্বার, নূর ইসলাম, জোবেদ আলী সরকার, আব্দুল বাতেন, চঞ্চল, আব্দুল বাতেন, দেবব্রত বকসী, অজয় বকসী, অতুল চৌধুরী, এ্যাডভোকেট আমান উল্ল্যা, রুকুনুদ্দৌলা, তোসাদ্দেক হোসেন, অধ্যাপক মোস্তফা, অধ্যাপক হায়দার আলী, অধ্যাপক মোজাম্মেল হক, অধ্যাপক আঃ ওহাব তালুকদার, অধ্যাপক আবদুস সোবাহান, অধ্যাপক নূরন্নবী, প্রিন্সিপাল আব্দুল ওহাব, ডাঃ নজরুল ইসলাম, বলাই চন্দ্র পাল, শাহ আলম, দ্বিতীয় অফিসার আবদুল হালিম, ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল লতিফ ও থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার প্রমুখ।

ভুরুঙ্গামারী প্রধান ঘাঁটিতে ডাঃ খাদেম হোসেন ও রফিকউদ্দিন কম্পাউন্ডার চিকিৎসার দায়িত্বে থাকলেন। ভুরুঙ্গামারী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনাব আবদুল হক পরামর্শক হিসেবে আমাদের পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দান এবং অসুস্থ শরীরে প্রায় সময় তিনি প্রধান নিয়ন্ত্রণকক্ষ---সিও অফিসে যাতায়াত করেন। এ ছাড়া প্রাক্তন কৃষি অফিসার জনাব ওয়াজেদ আলী শিকদার সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেন। সরকারি গুদামের খাদ্যদ্রব্য ও মালামাল প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার নিমিত্ত সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে কমিটি গঠন এবং পরিকল্পিত ও সুষ্ঠুভাবে তা কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২৫ মার্চ রাতে ট্যাঙ্ক, মেশিনগান, কামানসহ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাঞ্জাবি সৈন্য বাহিনী ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল, এস.এম হলসহ বিভিন্ন হল-ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের বাসভবন, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ই.পি.আর হেড কোয়ার্টার পিলখানা, পুরনো ঢাকার বিভিন্ন মহল্লা পৈশাচিকভাবে আক্রমণ করে পুলিশ, ই.পি.আর, ছাত্র-শিক্ষকসহ নিরস্ত্র মানুষ ও পথচারীদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। রাজারবাগের পুলিশ ও পিলখানার ই.পি.আর সদস্যরা অপ্রস্তুত অবস্থায় যুদ্ধ শুরু করে। পাঞ্জাবি নরপশু সৈন্যরা ট্যাঙ্ক, মেশিনগান ও কামান দিয়ে রাজারবাগ ও পিলখানায় আগুন ধরিয়ে দেয়। পুরনো ঢাকার শাঁখারী পট্টি, তাঁতি বাজারসহ বিভিন্ন মহল্লার সব কিছু আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করতে থাকে আর শয়তান বর্বর

পাকবাহিনী পিশাচরা হত্যাযজ্ঞ ও আনন্দে-উল্লাসে মেতে ওঠে। শুধু তাই নয়, রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হল, ইডেন কলেজ ছাত্রী-আবাস এবং অন্যান্য জায়গায় আক্রমণ করে তারা মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে পাশবিক অত্যাচার ও হত্যা করে।

এই দিন সকাল থেকে সাদা পোশাকধারী পাঞ্জাবি পাক-সেনাবাহিনীর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডোরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ধানমন্ডিস্থ বাড়ি ঘেরাও করে কড়া পাহারায় রেখেছে। বঙ্গবন্ধু বিপদ টের পেয়ে আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের নিরাপদ স্থানে সরে পড়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। রাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে পিলখানা ই.পি.আর হেড কোয়ার্টার, রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও চট্টগ্রাম ই.পি.আর হেড কোয়ার্টারে তাঁর বাসভবনে স্থাপিত ওয়্যারলেসের মাধ্যমে তিনি সর্বাত্মক স্বাধীনতা যুদ্ধ করার জন্য চূড়ান্ত নির্দেশ প্রদান করলেন।

আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনিস মোল্লা, রাজ্জাক, খলিল, খালেক, কলিমউদ্দিন, মোকসেদ আলী, রওশন সমন্বয়ে তিস্তা পুলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির সব কাজ সম্পন্ন হলো। পাকবাহিনী তখনও রংপুর ক্যান্টনমেন্টের বাইরে বের হয়নি। সে কারণে অনেকেই রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে পাকবাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য মতামত প্রকাশ করলো। পাকবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হবেই। তখন তাদের আধুনিক ভারি অস্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা টিকে থাকতে পারবো না। সেনাবাহিনীর কোন বাঙালি সদস্য এ সময় আমাদের সাথে যোগ দেয়নি। তিস্তা পুল এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে পাকবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলে সমগ্র কুড়িগ্রাম মহকুমা আমরা মুক্ত রাখতে পারবো। তিস্তা নদী যাতে শত্রু বাহিনী অতিক্রম করতে না পারে সে জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। তাই কৌশলগত কারণে পুলের কাছে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলার ব্যাপারে আলোচনাশেষে সবাই একমত হলাম। তিস্তা পুল এবং এর দুই পাশের নদী বরাবর দক্ষিণ-পূর্বে উলিপুর, চিলমারী ও পশ্চিম-উত্তরে লালমনিরহাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান তৈরি করতে হবে। বি.এস.এফ কর্নেল আর. দাস ও ক্যাপ্টেন যাদব তিস্তা পুলেই অবস্থান তৈরি করার জন্য তাগিদ দিচ্ছিলেন।

২৬ মার্চ সকালে আনিস মোল্লার নেতৃত্বে বাস, ট্রাক ও জীপে সমবেত ই.পি.আর, আনসার, মোজাহিদ, ছাত্র ও যুবক সমন্বয়ে আমরা কুড়িগ্রাম অভিমুখে যাত্রা শুরু করলাম। যাত্রার প্রাক্কালে ভুরুঙ্গামারীর রাস্তার দুই পাশে শত শত আবালবৃদ্ধবনিতা দাঁড়িয়ে। আনিস মোল্লা শামছুল হক চৌধুরীর সাথে করমর্দন করে জীপে আমার পাশে এসে বসলো। মন্টু জীপ চালাতে শুরু করলো। এমন সময় আমার পরম শ্রদ্ধেয় রহিমউদ্দিন মন্ডল জীপের কাছে এসে আনিস মোল্লা, রওশন ও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। সমবেত জনতা 'জয় বাংলা' শ্লোগান আর করতালি দিয়ে আমাদেরকে অভিনন্দন জানালো। এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হলো, যা শুধুই অনুভব করা যায়। আজ যখনই এই সব দৃশ্য মনের কোঠায় ভেসে ওঠে, তখন নিজের অজান্তেই দু'চোখ অশ্রু সজল হয়ে ওঠে। মুক্তি প্রতীক্ষিত মানুষের অন্তরের আশীর্বাদ নিয়ে আমাদের বাস, ট্রাক ও জীপের

বহর এগিয়ে চললো। দীর্ঘ সারা পথে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত মুক্তিপাগল মানুষ একইভাবে অভিনন্দন জানাতে থাকে আর বাজার এলাকাগুলোতে মিষ্টি, চিঁড়া, গুড়, মুড়ি, সিগারেট যে যা পারলো আমাদের বাস ও ট্রাকে তুলে দিল। আমরা বালুচর ও ধরলা নদী অতিক্রম করে কুড়িগ্রাম পৌছে গেলাম। কুড়িগ্রামে এর আগেই আমরা ফায়ার সার্ভিসের তিনটি গাড়ি ও কয়েকটি ট্রাক সংগ্রহ করেছি। বালুচরে বাস চলতে পারবে না, সে কারণে আসার পথে পাটেশ্বরীতে বাস ছাড়তে হয়েছে। এখান থেকে ট্রাক, জীপ ও গরুর গাড়িতে অস্ত্র, গোলা-বারুদ ও মালামাল কুড়িগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাটেশ্বরী ও নদীর ঘাটে কুলি-মজুররা স্বতষ্ফূর্তভাবে মালামাল বহন করে, মাটি, ছন-বাঁশ কেটে রাস্তা সমান ও ছন-বাঁশ বিছিয়ে দিয়ে ট্রাক-জীপ যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। কেউ কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করলো না। বাংলার সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের এমনিভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ আমাদের গৌরবান্বিত করেছে, প্রেরণা যুগিয়েছে। এই ইতিহাস সত্যিকারভাবে আজো লেখা হয়নি। লেখা হলে পৃথিবীর অনেক দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের চাইতে ঔজ্জ্বল্যে আরো ভাস্বর হতে পারতো। এ ইতিহাস লেখা হবে কি না জানি না। না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ক্ষমাহীনভাবে আমরা দায়ী হয়ে থাকবো।

কুড়িগ্রাম থেকে আমরা ট্রাক ও জীপে কাঁচা এবড়ো-খেবড়ো পথে বিকেলে তিস্তা পৌছে গেলাম। অনেক মালামাল গরুর গাড়িতে প্রেরণ করা হয়, ফলে প্রয়োজনীয় মালামাল তিস্তা পৌছতে রাত হয়ে যায়। তিস্তা পুলের কাছে নদীর পাড় ঘেঁষে প্রতিরোধ অবস্থান তৈরি করা হলো। খাল, উঁচু পাথরের ঢিবি, রেলপথ, গাছ, নদীর পাড় উঁচু থাকা ইত্যাদি কারণে এই স্থানটি প্রতিরোধ অবস্থান তৈরির উপযুক্ত ছিল। নদীর কিনারা দিয়ে অনেকগুলো বাঙ্কার তৈরি করা হলো। পুলের ওপরের রেললাইন তুলে নিয়ে পাথর ও ট্রেনের মালবাহী বগি ফেলে প্রতিরোধ গড়া হলো এবং পুলের ওপর দিয়ে যাতায়াত পথ বন্ধ করে দেয়া হলো। যাতে পাক দস্যু বাহিনী কাউনিয়া থেকে পুল পার হয়ে তিস্তার দিকে আসতে না পারে। সারারাত আমরা প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকলাম। আমাদের সাথে একইভাবে শত শত মানুষ নিরলসভাবে পরিশ্রম করে চললো। রাতে যাদেরকে কাজ করতে দেখেছি সকালে তাদের অনেককেই দেখে আমি বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বললাম। আমার কথায় তারা অনেকেই উষ্মা প্রকাশ করে বললো, "বাহে তোমরা গুলা হামার জন্য জীবন দিবার আইসচেন, আর হামরা না খায়া এই টুকনে কাজ করবার পাবার নই?"

ছয়

২৭ মার্চ সকালে তিস্তা পুল ও নদীর পাড় দিয়ে আমাদের অবস্থান ঘুরে দেখা ও চিলমারী, উলিপুর থেকে তিস্তা এবং লালমনিরহাট থেকে তিস্তা পর্যন্ত সংবাদ আদান-প্রদানের

ব্যবস্থা করা হলো। পাকবাহিনী এই সব এলাকা দিয়ে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। দিনে অন্তত দু'বার এবং প্রয়োজন হলে সাথে সাথে সংবাদ দেয়া-নেয়ার জন্য বেশ কিছুসংখ্যক যুবক ও ছাত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলো। ভোর রাত থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। তিস্তা পুলের অবস্থানে সকাল সাড়ে নয়টা-দশটার সময় চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশন থেকে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের হান্নান ভাই বঙ্গবন্ধুর বাণীসহ স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করলেন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য খুব অস্পষ্টভাবে এই ঘোষণা শোনা গেল। আমি ভূরুঙ্গামারী এসে শামছুল হক চৌধুরীকে নিয়ে দুপুরে সোনাহাট বি.এস.এফ সীমান্ত ফাঁড়িতে গেলাম। আজ আসাম বি.এস.এফ-এর কাছ থেকে অস্ত্র ও গুলি দেয়ার কথা রয়েছে। সুবেদার রবীন মেহেরা আমাদেরকে রাত বারোটার পর আসতে বললো। খুব খিদে পেয়েছিল। সোনাহাট ঘাঁটিতে এসে কিছু খেয়ে এই ঘাঁটির কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে দেখে ভূরুঙ্গামারী ফিরে এলাম।

সোনাহাট হাই স্কুল, ভূরুঙ্গামারী হাই স্কুল ও কলেজে নির্দিষ্টসংখ্যক ই.পি.আর সদস্যের তত্ত্বাবধানে ছাত্র-যুবকদের অস্ত্র চালনা ট্রেনিং ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এসব ট্রেনিং ক্যাম্পে কিছু অসুবিধাও দেখা দিয়েছে। অসুবিধাগুলো নিয়ে কন্ট্রোল রুমে আলোচনা ও সুনির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। রাতে কন্ট্রোল রুম থেকে ভূরুঙ্গামারী হাই স্কুলের ট্রেনিং ক্যাম্পে যাওয়ার সময় বাজারের মধ্যে কাপড়ের ব্যবসায়ী আবদুস সামাদের দোকানে বসলাম। পাশের দোকান থেকে অনেকেই এলো। তাদের সাথে কথা বলছিলাম। এমন সময় চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশন থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে মেজর জিয়া পুনরায় স্বাধীনতার লিখিত ঘোষণা পাঠ করলেন। পরে জানা গেছে, মেজর জিয়া অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। ২৫ মার্চ রাত এগারোটায় তাঁর কমান্ডিং অফিসার পাঞ্জাবি লেঃ কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশে এম.ভি সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ খালাস করে ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে আসার জন্য ষোলশহর থেকে বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে তিনি বের হন। সংগ্রামরত বাঙালিদের হত্যা করার জন্য অস্ত্র বোঝাই সোয়াত জাহাজ সদ্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছে। পথের বিভিন্ন ব্যারিকেড অপসারণ করে মেজর জিয়া অগ্রসর হচ্ছিলেন। আগ্রাবাদের কাছে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা তাঁকে ও তার বহরের গতিরোধ করেন। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান মেজর জিয়াকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করান এবং সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। বলেন, এই অস্ত্র বাঙালিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে এবং মেজর জিয়া ও বাঙালি সৈনিকরা সোয়াত জাহাজে পৌঁছার সাথে সাথে হত্যা করা হবে। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে সমুদ্র বন্দরের কুলি-কামিনরা জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করতে অস্বীকৃতি জানালে পাঞ্জাবিদের পক্ষে এই জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করা সম্ভব হয়নি। অন্যান্য বাঙালি সৈন্য, ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগের কর্মী বাহিনীর অনুরোধ ও বাধাদানের প্রেক্ষিতে মেজর জিয়া ফিরে আসতে বাধ্য হন। তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে পৌঁছে বাঙালি সৈন্যদের নিয়ে সরে পড়েন। ২৭ মার্চ কালুরঘাট রেডিও স্টেশনে তাঁকে

নিয়ে এসে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার লিখিত ঘোষণা পাঠ করার জন্য বলা হয়। মেজর জিয়া লিখিত ঘোষণা পাঠ না করে নিজেকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিতর্কিত ঘোষণা দেন। এতে রেডিও স্টেশনে উপস্থিত সবাই হতভম্ব হয়ে যান। রেডিওতে উপস্থিত সবার চাপের মুখে কিছুক্ষণ পর তিনি পুনরায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার লিখিত ঘোষণা পাঠ করলেন।

রাত একটায় আমরা সোনাহাট ই.পি.আর সীমান্ত ফাঁড়িতে এসে পৌছলাম। এখানেই অস্ত্র সরবরাহের কথা রয়েছে। আমরা তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করছি। এই অস্ত্র পাওয়ার ভেতর দিয়ে আমাদের সাহস, বল, যুদ্ধের গতি, ই.পি.আর সদস্যদের ওপর নিয়ন্ত্রণ, সর্বোপরি সাফল্য নির্ভর করছে। অস্ত্র পাওয়ার আশায় কারো চোখে ঘুম নেই। অস্থিরতা ও উত্তেজনায় মুহূর্ত কাটাচ্ছি। কখনও ফাঁড়ির বাইরের পাকা রাস্তায় হেঁটে বেড়াই, আবার কখনও ফাঁড়ির মধ্যে বসে থাকি। ঠিক এমনি অবস্থায় রাত দুটোয় বি.এস.এফ সুবেদার রবীন মেহেরো ও হাবিলদার এলদও এসে বললো, 'চিন্তা করার কোন কারণ নেই, আপনারা অবশ্যই অস্ত্র পাবেন।' তবুও মনের আশঙ্কা দূর হচ্ছিল না। যদি অস্ত্র পাওয়া না যায়, তবে তিস্তা ও অন্যান্য স্থানে অবস্থানরত ই.পি.আর সদস্যরা যদি আস্থা হারিয়ে ফেলে। যদি সময়মত অস্ত্র পাওয়া না যায় তবে আমাদের অবস্থা কি হবে ইত্যাদি ভাবনায় সবাই যখন ভারাক্রান্ত, তখন, ভোর চারটার দিকে পরিত্যক্ত রেললাইনের ওপর জীপের হেড লাইট দেখা গেল। বি.এস.এফ-এর দু'টি জীপ ও একটি ট্রাক ফাঁড়ির গেটে এসে দাঁড়ালো। কর্নেল আর. দাস, ক্যাপ্টেন যাদব ও অন্যান্য বি.এস.এফ কর্মকর্তা গাড়ি থেকে নেমে শামছুল হক চৌধুরী, নবাব আলী চৌধুরীসহ আমাদের সাথে করমর্দন করলেন। কর্নেল আর. দাস শামছুল হক চৌধুরীর হাতে প্রাথমিকভাবে দুটো বিট্রিশ এল.এম.জি, বিশ হাজার রাউন্ড এল.এম.জি ও রাইফেলের গুলি, একশ' গ্রেনেড এবং বিশটি রকেট ল্যান্সার তুলে দিলেন। আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি ভুরুঙ্গামারী চলে এলাম। সিও অফিসের পাশে অডিটরিয়ামে অস্ত্র ও অন্য মালামাল রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে দশটি রকেট ল্যান্সার, পঞ্চাশটি গ্রেনেড ও দশ হাজার রাউন্ড গুলি রেখে দুটো এল.এম.জিসহ বাকি রকেট ল্যান্সার এবং গুলি তিস্তায় নিয়ে এসে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করলাম। ভারত থেকে অস্ত্র পেয়ে আমাদের সাহস ও মনোবল বেড়ে গেল। মনের মধ্যে যে আশঙ্কা ছিল তা দূর হয়ে গেল। কেননা ভারত থেকে এই দুঃসময়ে অস্ত্র না পাওয়া গেলে আমাদের মানসিক বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

এরপর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং আমাদের সমগ্র মুক্ত এলাকা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিম্নে বর্ণিত কতগুলো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গৃহীত হলো :

১. মুক্ত এলাকায় শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা।
২. অন্যায়ভাবে কারো ওপর জুলুম না করা এবং সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. মুক্তিযোদ্ধাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের নিমিত্ত মধ্যবর্তী ঘাঁটি স্থাপন এবং সব ঘাঁটি থেকে ছাত্র-যুবক সংগ্রহ ও বাছাই করা।

৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিটি মুক্ত এলাকার মানুষের আস্থা ও মনোবল দৃঢ় করা।
৫. মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহারের নিমিত্ত যানবাহন সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।
৬. সঠিক সংবাদ আদান-প্রদান ও যোগাযোগ নিশ্চিত করা।
৭. মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৮. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সাহায্য সামগ্রী সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৯. মুক্ত এলাকা থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি, সরকারি গুদামের খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য মালামাল সংরক্ষণ ও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা।
১০. ই.পি.আর সদস্য ও প্রশিক্ষণার্থীসহ সকল মুক্তিযোদ্ধার তালিকা তৈরি করা।
১১. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজকর্মী ও কর্মকর্তাগণকে অভ্যথনা জানানো।

আমাদের মধ্যবর্তী ঘাঁটিসমূহ, যথা, রায়গঞ্জ নাগেশ্বরী, পাটেশ্বরী, কাঁঠালবাড়ি, টগরাইহাট, তিস্তা, বড়বাড়ি, চিলমারী, লালমনিরহাটে মধ্যবর্তী ঘাঁটি স্থাপন এবং দ্বিতীয় প্রধান ঘাঁটি হিসেবে কুড়িগ্রামকে সুদৃঢ় করা হলো। পাকবাহিনী নদীপথে চিলমারী এবং হারাগাছ দিয়ে তিস্তা নদী পার হয়ে কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটে ঢুকতে পারে, এ আশঙ্কায় এই দুই ঘাঁটিরও শক্তি বৃদ্ধি করা হলো। এ ভাবে সমগ্র কুড়িগ্রাম মহকুমা শত্রুমুক্ত ও আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হলাম।

২৫ মার্চ সকাল দশটা থেকে দুপুর বারোটার মধ্যে রংপুর হেলিপ্যাডে পাক সেনাবাহিনীর কয়েকটি হেলিকপ্টার অবতরণ করে। এ সময় রংপুর ২৩ ব্রিগেডের কমান্ডিং অফিসার ছিল পাঞ্জাবি ব্রিগেডিয়ার আব্দুল আলী মালিক। হেলিকপ্টার থেকে মেজর জেনারেল জানজুয়া, মেজর জেনারেল মিঠঠা খান, মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ, আরো কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা নামলো। রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায় এবং জেনারেলরা ব্রিগেডিয়ারের বাসভবনে গোপন সভায় মিলিত হয়। রংপুর হেলিপ্যাড ও ক্যান্টনমেন্টের আশেপাশের মানুষ কয়েকদিন যাবৎ পাকবাহিনীর যাবতীয় কার্যকলাপ তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। ২৫ মার্চ থেকেই ক্যান্টনমেন্টে পাক সেনাবাহিনীর মহড়া শুরু হয়। কিন্তু তারা ক্যান্টনমেন্টের বাইরে বের হয়নি। ক্যান্টনমেন্টে খাদ্যদ্রব্য সামগ্রীর বাঙালি সরবরাহকারীরা ক'দিন থেকে ঐ সব সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। ২৮ মার্চ রংপুর শহর ও ক্যান্টনমেন্টের পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে হঠাৎ করে খবর রটে গেল যে, পাক হানাদার বাহিনীর খাদ্যসহ সব রসদ শেষ হয়ে গেছে। তাদের কাছে গোলাবারুদও মজুত নেই। ক্যান্টনমেন্টের আশেপাশের গ্রাম ও বদরগঞ্জের কয়েকজন কৃষক মাতব্বর শিঙ্গা ফুঁকে পাকবাহিনীর রসদ-বারুদ শেষ হয়ে গেছে বলে প্রচার করে দিল। রংপুর শহরের রাস্তার ভিড় মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল। চারদিক থেকে ক্যান্টনমেন্টের দিকে হাজার হাজার মানুষ আসার শব্দ। ঝড়ের মত আসছে অগণিত মানুষ, তারা উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ। সবার হাতে লাঠি, দা, বল্লম। মিঠাপুকুর, বলদি পুকুর, বদরগঞ্জ থেকে অসংখ্য সাঁওতাল

তীরধনুক হাতে ঝড়ের বেগে আসছে। ছেলে, বুড়ো, কিশোর, যুবক সব বয়সের মানুষ--কারো হাত খালি নেই। সবার হাতেই লাঠি-বল্লম ইত্যাদি অস্ত্র। কেউ হেঁটে যাচ্ছে না--যেন দৌড়ের প্রতিযোগিতা। কার আগে কে পাঞ্জাবি পাকবাহিনীকে হত্যা করবে, তার মহড়া। সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে ক্যান্টনমেন্টের চারদিক মানুষ ঘিরে ফেললো। বৃটিশ শাসনামলে কৃষক বিদ্রোহের সময় এই এলাকার কৃষকরা ঠিক এমনিভাবেই ইংরেজদের ঘেরাও করে নাজেহাল করতো, তাড়িয়ে দিত, হত্যা করতো। নিশবতগঞ্জে জমায়েতের অগণিত মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ক্যান্টনমেন্টে ঢোকার জন্য হাঁটতে শুরু করলো। সাথে অসংখ্য সাঁওতাল, হাতে তাদের তীর-ধনুক। অনেকের হাতে মরিচের গুঁড়ো, আবার টিনভর্তি পানিতেও মরিচের গুঁড়ো মেশানো। মরিচের গুঁড়ো ও পানি মিশ্রিত মরিচের গুঁড়ো দিয়ে পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করার জন্য কয়েকদিন ধরে গ্রামের মেয়েরা এসব তৈরি করেছে। কিন্তু অগ্রসরমান হাজার হাজার মানুষ আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারলো না। ক্যান্টনমেন্টের ভেতর থেকে পাকবাহিনীর গর্জে ওঠা এল.এম.জি, মেশিনগানের ঝাঁক ঝাঁক গুলি মানুষের বুক ভেদ করে ঝাঁঝরা করে দিল। ৫০/৬০ জন মানুষ গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। পাক সেনারা যা করলো ভেতর থেকেই, ক্যান্টনমেন্টের বাইরে আসতে সাহস পেল না। সাঁওতালরা বৃষ্টির মত তীর ছুঁড়ছিল। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই বেশ কয়েকজন শত্রু-সৈন্য তীরের আঘাতে লুটিয়ে পড়লো। সরল ও মৃত্যুপণ মানুষের প্রতিরোধের মুখে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাক হানাদার বাহিনী হতভম্ব ও ভীত হয়ে পড়লো। গুলির আঘাতে বক্ষ বিদীর্ণ, মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছিটকে পড়ার পরও হাজার হাজার মানুষ ভয়ে পালিয়ে না গিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। নরপশু পাক সৈন্যরা মর্টার, কামান ও মেশিনগান দিয়ে নিশবতগঞ্জের বাড়িঘর মাটির সাথে মিশিয়ে দিল। দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠলো, বাড়িঘর পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। কামান-মর্টারের শেলের আঘাত ও বাড়িঘরে আগুন জ্বালার পর অকুতোভয় সাধারণ কৃষক ও সাঁওতালরা হটে আসতে বাধ্য হয়। এরপরও কয়েকদিন হানাদার সৈন্যবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হওয়ার সাহস পায়নি। ৩০ মার্চ বর্বর পাকবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয় এবং রংপুর শহরসহ গ্রাম-গঞ্জের ওপর নির্বিচার গুলিবর্ষণ করে মানুষ হত্যা ও নির্মম, পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে এবং আগুন জ্বালিয়ে বাড়িঘর-মহল্লা-গ্রাম ধ্বংস করতে থাকে।

সাত

ই.পি.আর ও ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করে তিস্তা পুলে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করার সাথে সাথে ভারতের আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, সমাজকর্মী, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিসহ সর্বশ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন প্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আমাদের ভূরুঙ্গামারী হেড কোয়ার্টারে দিয়ে যেতে শুরু করে। ভূরুঙ্গামারীর

পূর্বদিকে আসামের গোলকগঞ্জ, গৌরীপুর, ধুবরী, ফকিরা গ্রাম, গৌহাটি ও পশ্চিমদিকে সাহেবগঞ্জ, দিনহাটা, কুচবিহার, তুফানগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং থেকে ট্রাক ও জীপ ভরে চাল, চিনি, আটা, ঘি, চা, তেল, পেট্রোল, কাপড়, মগ, থালা-বাসন, ঔষধ, ব্যান্ডেজ, মশারী, ফলমূল, সিগারেট, বিস্কুট, শুকনো খাবার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আসতে থাকে। এই সাহায্য-সহমর্মিতা আমাদেরকে আরো বেশি করে অনুপ্রাণিত করলো। যে সব রাজনৈতিক নেতা, কর্মকর্তা, সমাজকর্মী সহমর্মিতা নিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন, তাঁদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, দিনহাটার কমল গুহ, রাজেন চ্যাটার্জী, সূর্যদা, বিমলদা, গোলকগঞ্জের প্রভাত দে, নীলকান্ত সরকার, ধুবরীর সুকুমার বাবু, কবীর রায়, শান্তি বাবু, কুচবিহারের অরুণদা, মাথাভাঙ্গার মানুদা, কলকাতার অশোক ঘোষ, অজয় মুখার্জী, অজিত পাজা, অনিতা গুহ, দিনহাটা, তুফানগঞ্জ ও ধুবরীর এস.ডি.ও, এস.ডি.পি.ও, কুচবিহার ও গোয়ালপাড়া জেলার ডিসি, এস.পি, গৌহাটির দৈনিক অহম, কলকাতার দৈনিক যুগান্তর ও দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক এবং সাংবাদিকবৃন্দসহ অনেকের নাম ও অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। অনেকের নাম মনে করতে পারছি না। এ জন্য আমি বিশেষভাবে দুঃখিত। কেননা স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ আঠারো বছর পর শুধু স্মৃতির ওপর নির্ভর করে এ লেখা লিখছি। গৌহাটির দৈনিক অহম, পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকায় আমাদের খবর সেই সময় ছবিসহ ফলাও করে ছাপা হয়েছে। বিশেষ নিবন্ধাদিও ছাপা হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই আমাদের সাক্ষাৎকার, কার্যক্রম এবং যুদ্ধের সাফল্য ও কাহিনী এই সব পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে যে অবদান রেখেছে, সে ইতিহাস কোনদিনও ভুলবার নয়।

এ সময় কুড়িগ্রামের এস.ডি.ও মামুনুর রশিদ, দ্বিতীয় অফিসার আব্দুল হালিম, ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল লতিফ, প্রফেসর হায়দার আলী পরিবারসহ এবং ঠিকাদার তোসাদ্দেক হোসেন ভুরুঙ্গামারীত এলেন। রায়গঞ্জ হাসপাতাল ডাক্তারের বাসভবনে এস.ডি.ও মামুনুর রশিদ ও তার পরিবারের এবং আব্দুল হালিম ও আব্দুল লতিফ সাহেবের পরিবারের সদস্যদের জয়মনিরহাটের পশ্চিমে বাউসমারী গ্রামে থাকার ব্যবস্থা করা হলো।

রংপুর ই.পি.আর দশম উইং-এর সহকারী কমান্ডার ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ আহমেদ ৩০ মার্চ সকালে অফিসে যথারীতি কাজ করছিলেন। কয়েকদিন থেকে অবাঙালি সামরিক অফিসারদের নানাবিধ আচরণ তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। বিভিন্ন ভাবনা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। ক্যান্টনমেন্ট থেকে অবাঙালি সামরিক অফিসার কথা বলছে। ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ উর্দুতেই কথা বলছিল। সামরিক অফিসার হুকুম দিল, "নওয়াজিশ কো আভি্হি স্যুট কোরো।" ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ তৎক্ষণাৎ গায়ের ইউনিফরম খুলে ফেলে দিয়ে একজন ই.পি.আরকে তাঁর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও ছয় মাস বয়সের একমাত্র কন্যা সন্তানকে লালমনির-হাটের দিকে নিয়ে যেতে বলে উপস্থিত কয়েকজন ই.পি.আরকে সাথে নিয়ে গ্রাম ও

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে তিস্তা নদীর পাড়ে সুন্দরগঞ্জ থানার এক গ্রামে গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৩ এপ্রিল আমরা খবর পেলাম ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ রংপুর ই.পি.আর উইং হেড কোয়ার্টার থেকে পালিয়ে এসে তিস্তা বাঁধের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। আনিস মোল্লা, মোকসেদ ও রওশনসহ আমরা কয়েকটি নৌকা নিয়ে ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ এবং তাঁর সঙ্গীদের নদী পার করে তিস্তায় আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে নিয়ে এলাম এবং আমাদের কমান্ডিং-এর দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করলাম। আমাদের সাথে কোন সামরিক অফিসার ছিল না। এই প্রথম, সামরিক অফিসার আমাদের সাথে যোগ দিলেন। রংপুর উইং হেড কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে আসা অপর দলটি ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ আহমদের পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে হারাগাছ এলাকা দিয়ে তিস্তা নদী পার হয়ে লালমনিরহাট পৌছে তাঁর সাথে মিলিত হয়। রায়গঞ্জ হাসপাতালের একটি কোয়ার্টারে ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা এবং কাপড়, বিছানা, হাঁড়িপাতিলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস সরবরাহ করা হলো।

সুবেদার সৈয়দ আলাউদ্দিনের নেতৃত্বে রংপুর উইং হেড কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে আসা অপর দলটিকে হারাগাছের কাছে পাক হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে। এখানে স্বল্পসংখ্যক ই.পি.আর সদস্যের সাথে পাকবাহিনীর প্রচন্ড লড়াই হয়। যুদ্ধে সুবেদার আলাউদ্দিনসহ দশজন ই.পি.আর পাঞ্জাবি নরপশুদের হাতে ধরা পড়ে। হারাগাছের দক্ষিণে মীরবাগের কাছে এই দশজন বীর বাঙালি সন্তানকে দাঁড় করিয়ে গুলি করে ফেলে রেখে পাকবাহিনী চলে যায়। সুবেদার আলাউদ্দিন মারাত্মকভাবে আহত হয়ে অনেক কষ্টে নবদীগঞ্জ গ্রামের এক বাড়িতে ওঠেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বীর সন্তান শহীদ সুবেদার আলাউদ্দিনকে নবদীগঞ্জে এবং বাকি নয়জন শহীদকে হারাগাছের কাছে গ্রামের জনসাধারণ সমাহিত করে।

ইতিমধ্যে একদিন সোনাহাট থেকে ভুরুঙ্গামারী ফিরে আসার পথে পাটেশ্বরী পুলে পাথরের ওপর মোটর সাইকেল পিছলে পড়ে আমার বাম হাতের কবজিতে প্রচন্ড আঘাত পাই এবং হাত ফুলে যায়। ভুরুঙ্গামারীতে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হলো। পরদিন দিনহাটা থেকে কমল গুহ এলেন। তিনি আমাকে তাঁর জীপে ধুবরী নিয়ে এসে হাসপাতালে হাত এক্সরেসহ যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। হাসপাতালের ডাক্তারগণ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমার হাতের চিকিৎসা করে ঔষধ দিলেন। তা'ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অতিরিক্ত ঔষধ-ব্যান্ডেজ ইত্যাদি দেয়া হলো। ৬ এপ্রিল পাঞ্জাবি হানাদার বাহিনী কাউনিয়া থানার দারোগাকে সাথে নিয়ে পুলের কাছে এসে দুই পাশ ও মাঝ বরাবর থেকে আমাদের ওপর গুলিবর্ষণ এবং শেলিং শুরু করে। প্রথমে পাকবাহিনীকে পুলে উঠতে বাধা দেয়া হয়নি। দস্যুবাহিনী পুলের প্রায় মধ্যখানে আসার পর আমরা গুলিবর্ষণ শুরু করলে ১০/১৫ জন পাক দস্যু নিহত হয়। এরপরেই পাকবাহিনী আমাদের ওপর প্রচন্ড আঘাত হানে। পাকবাহিনী বৃষ্টির মত গুলি ও শেল বর্ষণ করতে করতে পুলের ওপর ওঠে আসে। এ সময় আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। পাকবাহিনীর আধুনিক অস্ত্রের মুখে আমরা টিকতে পারছিলাম না। এমন সময় দু'জন

ই.পি.আর সদস্য পুলের ঢেউ খেলানো লোহার পাতের মধ্য দিয়ে ক্রলিং করে ট্রেনের মালবাহী বগি ও পাথর দিয়ে তৈরি ব্যারিকেডের পাশ থেকে পর পর কয়েকটি গ্রেনেড এবং রকেট ল্যান্সার নিক্ষেপ করে। ফলে পাকবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়ে পশ্চাদপসরণ করে কাউনিয়ায় চলে যেতে বাধ্য হয়। গ্রেনেড ও রকেট ল্যান্সার নিক্ষেপের পর পরই পাকবাহিনীর মর্টারের শেলের আঘাতে এই দুই বীর সন্তান শহীদ হলেন। এই দু'জন বীর বাঙালি সন্তান ই.পি.আর সদস্যদের জীবনের বিনিময়ে পাকবাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান অটুট রাখতে সক্ষম হলাম।

কুড়িগ্রামের এম.এন.এ জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমেদ ভোলা মিঞার কাছ থেকে কোন প্রকার সহযোগিতা পাওয়া গেল না। ৬ এপ্রিল রিয়াজউদ্দিন আহমেদ ভোলা মিঞা ও মামুনুর রশিদ এস.ডি.ও সপরিবারে গোপনে ভারতে চলে গেলেন। ভোলা মিঞা ধুবরীতে তাঁর শ্বশুর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ভুরুঙ্গামারীতে প্রধান ঘাঁটি তৈরি করা এবং সমগ্র কুড়িগ্রাম মহকুমা আমরা মুক্ত রেখেছি এই সংবাদ আসাম, পশ্চিমবাংলা এবং বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র প্রচার হয়ে গেলো। সুবেদার বোরহান, সুবেদার আরব আলী, সুবেদার মোজাহার, সুবেদার শামছুল হক, সুবেদার মালেক চৌধুরী, সুবেদার মোস্তফা ও সিরাজ অস্ত্র-গোলা-বারুদসহ অন্যান্য ই.পি.আর যোদ্ধাকে নিয়ে ভুরুঙ্গামারীতে সমবেত হলেন। আমাদের অনেকগুণ শক্তি বৃদ্ধি পেলো এবং নতুন সংগৃহীত মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হলো। ই.পি.আর সদস্য ছাড়াও টাঙ্গাইল, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুরসহ বিভিন্ন জেলা মহকুমা থেকে ছাত্র-যুবকবৃন্দ ভুরুঙ্গামারীতে এসে সমবেত হতে থাকলো।

আট

৮ এপ্রিল বিকেলে বি.এস.এফ সুবেদার রবীন মেহেরা ও ক্যাপ্টেন যাদব ভুরুঙ্গামারীতে এলেন। বিভিন্ন খবর নেয়ার পর এক পর্যায়ে এই এলাকার এম.এন.এ, এম.পি.এ-দের অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে আজকেই রাত নয়টার মধ্যে বি.এস.এফ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করলেন। এ সময় শামছুল হক চৌধুরী ছিলেন না। তিনি সন্ধ্যার আগেভাগে আসলেন। আমি তাঁকে সব বললাম। মোজাহার চৌধুরী এম.এন.এ ও আব্দুল হাকিম এম.পি.এ সাহেবগঞ্জ আশ্রয় নিয়েছেন। সন্ধ্যায় মোটর সাইকেলে করে শামছুল হক চৌধুরীকে নিয়ে সীমান্তের ওপারে ভারতের সাহেবগঞ্জে তাঁদেরকে খুঁজে বের করতে গেলাম। একটু একটু বৃষ্টি ও বেশ ঠান্ডার মধ্যে অনেক চেষ্টার পর জনাব মোজাহার হোসেন চৌধুরী ও আব্দুল হাকিমকে পাওয়া গেল। বিলম্ব না করে আমাদের সাথে তাঁদেরকে সোনাহাট বি.এস.এফ ফাঁড়িতে যেতে হবে বলা হলো। তারা যেতে সম্মত হলেন না। মোজাহার হোসেন চৌধুরী শামছুল হক চৌধুরীকে বললেন, " সোগে তো তুই

করবার লাগছিস, হামার গুলাক নিয়া আর টানাটানি না করিস। যা করবার হয় তুই কর।" অগত্যা বাধ্য হয়ে ভুরুঙ্গামারীতে ফিরে এলাম। বৃষ্টির মধ্যে রাত আটটায় থানা ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াউদ্দিন আহমেদকে সাথে নিয়ে আমরা জীপে সোনাহাট রওয়ানা হলাম। সোনাহাট বি.এস.এফ ফাঁড়িতে পৌছার পর মুষলধারে বৃষ্টি ঝরতে লাগলো। তাই বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বৃষ্টির মধ্যেই রাত বারোটায় কর্নেল আর. দাস বি.এস.এফ-এর দু'টি জীপে করে আমাদেরকে নিয়ে চললেন। বৃষ্টি আর অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। পানবাড়ি পাহাড়ের মধ্যে গাড়ি কিছুক্ষণের জন্য থামলো, পথ ঠাহর করা যাচ্ছে না। আমরা গাড়িতে বসে থাকলাম। এখানে অনেকবার এসেছি। হঠাৎ এই সময় বিজলী চমকালো। তার আলোয় চকিতে পানবাড়ি বি.এস.এফ হেড কোয়ার্টার চিনতে পারলাম। আমাদের গাড়ি আবার চলতে শুরু করলো। কিন্তু কিছুদূর এগিয়েই আবার গাড়ি থামলো। না, কোন কিছু আর চেনা যাচ্ছে না। ঘোর অন্ধকার রাত আর তুমুল বৃষ্টি। কিন্তু থামলে চলবে না। তাই ধীরে ধীরে উঁচু-নিচু আঁকাবাঁকা পথে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমাদের গাড়ি চলতে লাগলো। এক সময় কর্নেল আর. দাস বললেন, আগামীকাল আপনাদের বড় নেতার সাথে দেখা হবে। সে জন্য আপনাদেরকে নিয়ে রূপসী যাচ্ছি। আমি বললাম, বঙ্গবন্ধুর সাথে কি দেখা হবে? কর্নেল বললেন, বঙ্গবন্ধু কি না জানি না, তবে আপনাদের উচ্চপর্যায়ের নেতাই তিনি। তিনি আরো বললেন, বঙ্গবন্ধু যদি সত্যিই আসেন, আর ভগবানের কৃপায় যদি তাঁকে দেখতে পাই, তাহলে জীবনটা সার্থক হবে, আমার চাওয়া-পাওয়ার আর কিছুই থাকবে না। বঙ্গবন্ধু কোথায় কিভাবে আছেন, আমরা তখনও কিছু জানি না। নিশ্চিত বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হতে যাচ্ছে ভেবে আমরা শিহরিত ও পুলকিত বোধ করছিলাম। সারারাত আমাদের গাড়ি চললো। কোন কষ্ট বা অবসাদ কিছুই বোধ হচ্ছিল না।

এক সময় সকাল হলো, গাছের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য উঁকি দিল। আমাদের গাড়ি চলছেতো চলছেই। কখনও সমতল, কখনও উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথ আর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছুটছে। মাঝে মাঝে আমরা চঞ্চল হয়ে উঠছি, কখন রূপসী পৌছব। অবশেষে ৯ এপ্রিল সকাল আটটায় জঙ্গল-ঘেরা রূপসী বিমান ঘাঁটিতে পৌছে গেলাম। আমাদের বিমান ঘাঁটির রেস্ট হাউসে নিয়ে যাওয়া হলো। বৃটিশ শাসনামলে জাপানের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ বেঁধে গেলে ইংরেজরা এই রূপসী বিমান ঘাঁটি তৈরি করেছিল। রেস্ট হাউসে চিলমারীর এম.এন.এ জনাব সাদাকাত হোসেন ছক্কু মিঞাকে পাওয়া গেল। তিনি বললেন, শাড়ি ও বোরখা পরে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আব্দুল মান্নান পায়ে হেঁটে অনেক কষ্টে গতকালই সীমান্ত অতিক্রম করে আসাম পৌছেছেন। হাঁটতে হাঁটতে সৈয়দ নজরুল ইসলামের পা ফুলে গেছে। তারা খুবই পরিশ্রান্ত, এখন ঘুমাচ্ছেন।

হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা খেয়ে চা-পান করছিলাম। এমন সময় চারদিকে তাকিয়ে দেখার সুযোগ পেলাম। দেখা গেল, বিমান ঘাঁটির চারদিকে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সদস্যরা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে কড়া পাহারা দিচ্ছে। জলপাই রং-এর পোশাক পরিহিত

সৈন্যদের রূপসীর ঘন জঙ্গলের সবুজের অপূর্ব সমারোহের ভেতরে হঠাৎ করে আবিষ্কার করা সত্যিই কঠিন।

বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আব্দুল মান্নান সাহেবদের সাথে তখনও আমাদের দেখা হয়নি। জানা গেল, তাঁরা হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হচ্ছেন। সামরিক বাহিনীর কয়েকটি জীপ রেস্ট হাউসের গেটে এসে থামলো। কর্নেল আর. দাস এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসার আমাদের জীপে উঠতে অনুরোধ করলেন। শামছুল হক চৌধুরী ও আমি এক জীপে, অপরটি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং আব্দুল মান্নান সাহেবকে নিয়ে রেস্ট হাউসের অপর প্রান্তে বিমান ঘাঁটির লাউঞ্জে আসলো। আমাদেরকে একটি কক্ষে বসতে দেয়া হলো। আমাদের সাথের অন্যদেরকে এখানে নিয়ে আসা হয়নি। কয়েকজন সামরিক বাহিনীর অফিসার সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মান্নান সাহেবের সাথে কথা বলছিলেন। আমরা চুপচাপ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, সামনে কি ঘটছে তাই দেখার জন্য। বুক দুরু দুরু করে কাঁপছে বঙ্গবন্ধুকে আমরা কাছে পাবো, দেখতে পাবো এই প্রত্যাশায়। সকাল সাড়ে দশটায় একটা বিমান অবতরণ করলো। বিমান থেকে প্রথমে নেমে এলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক লেঃ জেনারেল অরোরা। তাঁর সাথে শেখ ফজলুল হক মণি, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং কয়েকজন উর্ধ্বতন ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তা। আমাদেরকে পাশের হল ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। সবার সাথে করমর্দন ও পরিচয় হলে সর্বশেষে মণিভাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কিভাবে এসেছিস, তোরা কোথায় আছিস? আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে তিস্তায় সংগঠিত আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান, বিশাল মুক্ত এলাকা এবং ভুরুঙ্গামারীর প্রধান ঘাঁটির কথা জানালাম। আমি বলছিলাম কিন্তু তিনি শুনছিলেন কি না জানি না। কারণ তাঁকে খুবই অস্থির ও উত্তেজিত দেখা গেল। বঙ্গবন্ধুকে না দেখে আমরা নিরাশ হলাম। আলোচনা শুরু হলো। শামছুল হক চৌধুরী বিস্তারিত বলছেন। জেনারেল অরোরা জানতে চাইলেন, বর্তমানে আমাদের ডিফেন্স কোথায়, কি ভাবে রয়েছে? কি কি অস্ত্র আছে? ই.পি.আরসহ মুক্তিযোদ্ধা কতজন, সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সদস্য আমাদের সাথে রয়েছে কি না, ট্রেনিং সেন্টার কয়টি ইত্যাদি। শামছুল হক চৌধুরী সংক্ষেপে সব অবগত করালেন। আমাদের বর্তমানের সবচেয়ে বড় অসুবিধা অস্ত্র, গোলা-বারুদ ও খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতার বিষয়ে তাঁকে জানানো হলো। দেয়ালে লাগানো বাংলাদেশের বেশ বড় একটা মানচিত্রের সামনে জেনারেল অরোরা দাঁড়িয়ে শামছুল হক চৌধুরীকে ডাকলেন। বর্তমানে আমরা কোন্ কোন্ অঞ্চল মুক্ত রেখেছি, আমাদের ডিফেন্স ও মধ্যবর্তী ঘাঁটি কোথায় ইত্যাদি জনাব চৌধুরী মানচিত্রে আঙুল নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন। সমগ্র কুড়িগ্রাম মহকুমা আমরা মুক্ত রেখেছি দেখে জেনারেল অরোরা খুব খুশি হয়ে বললেন, ভেরী গুড। তিস্তা পুল বরাবর লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ কষে তিনি বললেন, "ইয়ে তিস্তা ব্রীজ তোড় দিজিয়ে, তিস্তা ব্রীজকা ইধার ডিফেন্স আচ্ছা করনে হোগা।"

বিস্তারিত আলোচনার পর শামছুল হক চৌধুরীকে আমাদের এই উত্তরাঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র গ্রহণ, সার্বিক দায়িত্ব পালনের কর্মভার অর্পণ করা হলো, সেই সাথে তাঁর স্বাক্ষরও সত্যায়িত করে নেয়া হলো। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শামছুল হক চৌধুরীকে পারিবারিক কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামের পরিবারের খবর জানতে চাইলে তিনি প্রায় অস্থির হয়ে উঠলেন এবং বললেন, তারা কোথায় আছে তিনি জানেন না। বললেন তিনি একাই চলে এসেছেন। নেতৃবৃন্দকে আমাদের বিস্তীর্ণ মুক্ত এলাকার হেড কোয়ার্টার ভুরুঙ্গামারীতে অবস্থানের জন্য অনুরোধ করা হলো। আলোচনা করা হলো মুক্ত এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে। আমাদের মুক্ত এলাকায় স্বাধীন বাংলা বেতার খোলার জন্য রেডিও ট্রান্সমিটার এবং সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দেয়া হলো। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বললেন, এখনো বহুবিধ অসুবিধা রয়েছে। আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার এখনও গঠিত হয়নি। সরকার গঠিত হলে বৈদেশিক সমর্থন ও সাহায্য পেতে সুবিধা হবে। মুক্তিযুদ্ধ সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অচিরেই বিপ্লবী সরকার গঠন করা হচ্ছে। সরকার গঠিত হওয়ার পর সব অসুবিধা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে এবং একটি সুষ্ঠু সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। তবে স্বাধীনতা যুদ্ধ করলে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার এবং অসুবিধার সম্মুখীন হওয়াটা স্বাভাবিক। সবকিছু পরিহার করে স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যেতেই হবে। যুদ্ধ মানেই কষ্ট, জীবন বাজি রাখা, মনে রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধু কোথায়, জানতে চাইলে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হলো। কারো মুখে কোন কথা নেই। সবার চোখ ছল ছল করছে। নেতৃবৃন্দ যেন বোবা হয়ে গেছেন। তাঁরা শুধু বললেন, "নেতা আমাদের সাথেই রয়েছেন এবং আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।" প্রায় দু'ঘন্টা পর তাঁরা বিদায় নিলেন। বিমান সবুজ বনানীর ওপর দিয়ে উড়ে গেল, যতক্ষণ দেখা গেল আমরা তাকিয়ে থাকলাম। কর্নেল আর. দাসসহ আমরা ফিরে চললাম। দিনের অবস্থা ও আবহাওয়া বেশ সুন্দর, আমাদের জীপ দ্রুত ছুটে চললো। সন্ধ্যার পর আমরা গোলকগঞ্জ পৌঁছলাম। আমাদের জীপের শব্দ পেয়ে শত শত মানুষ রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে গেল। জীপ থামাতে হলো। ভারতীয় বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক অপেক্ষা করছিলেন। বিদেশী সাংবাদিকরাও রয়েছেন। সাংবাদিকরা জীপ ঘিরে দাঁড়ালেন। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হয়েছে কি না? এখন তিনি কোথায় রয়েছেন, কেমন আছেন? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। শামছুল হক চৌধুরী শুধু বললেন, " নেতা আমাদের সাথে রয়েছেন এবং নেতৃত্ব দিচ্ছেন।" সোনাহাট বি.এস.এফ ফাঁড়িতে আসার পর রাতেই সামরিক কর্মকর্তাদের সামনে পুনরায় শামছুল হক চৌধুরীর স্বাক্ষর সত্যায়িত করে নেয়া হলো। পরদিন ১০ এপ্রিল আসামের গৌহাটি থেকে প্রকাশিত দৈনিক অহম, কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় হেডলাইনে খবর বের হলো, " আসামের কোন এক জঙ্গলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে শামছুল হক চৌধুরী এম.পি.এ-এর সাক্ষাৎ-লাভ।"

জনাব শামছুল হক চৌধুরীর স্বাক্ষর সত্যায়িত করে নেয়ার পর অস্ত্র সরবরাহ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হলো। দ্বিতীয় পর্যায়ে দু'টি এল.এম.জি, দু'টি ৮১ মিঃ মিঃ

মর্টার, এক্সপ্লোসিভ, রকেট ল্যান্সার, গ্রেনেড এবং প্রচুর গুলি পাওয়া গেল। বঙ্গবন্ধুর বিষয়টি মর্মান্তিকভাবে আমাদেরকে ভাবিয়ে তুললো। বঙ্গবন্ধু কোথায়, কি ভাবে রয়েছেন, কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর কথা যখনই মনে হয়, তখনই আঁতকে উঠি এই ভেবে যে, তিনি আদৌ বেঁচে রয়েছেন কি না, নরপশুরা বাংলার শিরোমণিকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে কি না? জনাব শামছুল হক চৌধুরী এবং আমি এক অস্বস্তিকর উভয় সঙ্কটে পড়লাম। কেননা, বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি বলতে পারি না, আবার দেখিনি একথাও বলা যাচ্ছে না। তবে বঙ্গবন্ধুর এই অভাব আমাদেরকে প্রবলভাবে আলোড়িত করলো, সঞ্চার করলো পাকিস্তানী বর্বর হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ ও লড়াই করে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার প্রচন্ড শক্তি ও সাহস।

নয়

ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ সপরিবারে রায়গঞ্জ থেকে সাহেবগঞ্জের হাজী সাহেবের বাড়িতে এবং কিছু ই.পি.আর সদস্য সাহেবগঞ্জ আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ভুরুঙ্গামারীর পশ্চিমে বাগভান্ডার ই.পি.আর সীমান্ত ফাঁড়ি, ফুলকুমার নদীর পশ্চিম প্রান্ত এবং পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমা ও থানার অন্তর্গত ভারতীয় সীমান্তের ছোট্ট বাজার এই সাহেবগঞ্জ। ছোট্ট খালের মত শীর্ণ, অনূর্ধ্ব একশ' ফুট প্রস্থ ফুলকুমার নদী হিমালয় থেকে প্রবাহিত হয়ে ভুরুঙ্গামারীর বাঁশজানী এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এই থানার পশ্চিম সীমান্ত ঘেঁষে জয়মনিরহাট ও আন্ধারী ঝাড়ের পশ্চিম প্রান্ত ও রায়গঞ্জের ঢালু (উত্তরে) বরাবর পূর্ব–দক্ষিণে দুধকুমার নদীতে এসে মিশেছে।

এই সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কমান্ডো সদস্য পরিচয়ে সি. আর. চৌধুরী সুবেদার বোরহানের সাথে ভুরুঙ্গামারীতে এলেন। দেখা গেল গেরিলা যুদ্ধ, অস্ত্র চালনা এবং অস্ত্র মেরামত সম্পর্কে তাঁর ভাল ধারণা রয়েছে। সি. আর. চৌধুরীর নেতৃত্বে আমরা বিশেষ গেরিলা বাহিনী গঠন করলাম। গেরিলা বাহিনীর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করলেন। প্রাথমিকভাবে পনেরজনকে নির্বাচিত করা হলো। এর মধ্যে ছিলেন কুড়িগ্রামের সাজু, সাহাব, মালেক, মোকসেদ, টুকু, আমানুর এবং রংপুর থেকে আগত সেনাবাহিনীর দু'জন সদস্য বাবর ও রউফ।

পাকবাহিনী তিস্তা দখল করার জন্য তিস্তা পুলে আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের ওপর রাত–দিন প্রবল গুলিবর্ষণ করে চলেছে। ১২ এপ্রিল রাতে তারা ভারি অস্ত্রের সাহায্যে আমাদের উপর প্রচন্ডভাবে তিনদিক থেকে আক্রমণ চালালো। পুলের ওপর এবং দুই পাশ থেকে গুলিবর্ষণ করতে করতে তারা অগ্রসর হতে থাকে। পাকবাহিনীর ভারি অস্ত্রের মুখে অবশেষে টিকতে না পেরে ১৩ এপ্রিল ভোর রাতে আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে পিছিয়ে এসে শিঙ্গের ডাবরি, রাজারহাট ও টগরাইহাটে আমরা অস্ত্রসহ অবস্থান গ্রহণ করলাম। ১৪ এপ্রিল সকাল ৯টায় ট্রেনের চারটি বগি ও সামনে–পেছনে দু'টি ইঞ্জিন

লাগিয়ে পাকবাহিনী আচমকা কুড়িগ্রামের খলিলগঞ্জ এসে জেলখানার উত্তরে অবস্থান গ্রহণ করলো। ট্রেনের দরজা–জানালা সব বন্ধ, বোঝা যাচ্ছিল না ভেতরে কি রয়েছে। তিস্তার প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে দেয়ার সময় আমরা রেললাইন তুলে ফেলেছিলাম। অল্পসংখ্যক পাক–সেনা এভাবে আমাদের আওতার মধ্যে ঢুকে যাবে, তা কল্পনার বাইরে ছিল। শিঙ্গের ডাবরিতে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত মুক্তিযোদ্ধারা তারা হয়তো মনে করেছিল বাঙালি সেনাবাহিনীর সদস্য, ই.পি.আর অথবা অন্য কেউ--রংপুর নতুবা তিস্তা থেকে ট্রেন নিয়ে পালিয়ে এসেছে। সে কারণে ট্রেনের ওপর আক্রমণ চালানো হয়নি। এদিকে রাজারহাট ও টগরাইহাটের মুক্তিযোদ্ধারা মনে করেছে, যেহেতু শিঙ্গের ডাবরির অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা ঘাঁটি থেকে বাধা দেয়া হয়নি, সেহেতু ট্রেনটি আমাদের পক্ষের হবে। জেলখানার পাশে ট্রেন থেকে ১৫/২০ জন পাক হানাদার বাহিনী আকস্মিকভাবে নেমে দ্রুত জেলের ভেতরে ঢুকে অফিসে কর্মরত হেড ক্লার্ক ও সিপাইসহ পাঁচজনকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে আবার ট্রেনে উঠে পালিয়ে যেতে থাকে। এ সময় আমরা বুঝতে পারি পাকবাহিনী এসে আবার পালিয়ে যাচ্ছে। তাই টগরাইহাটে ট্রেন পৌছার সাথে সাথে আমরা তিনদিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করি। পাকবাহিনী মেশিনগান, এল.এম.জি ও রকেট ল্যান্সার ব্যবহার করে। স্টেশনের পার্শ্ববর্তী স্কুলে আমাদের অবস্থানের ওপর রকেট ল্যান্সার নিক্ষেপ করে। স্কুলের সামনের ও পেছনের দেয়ালে তার আঘাতে বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়। আমরা শুধু এল.এম.জি ও রাইফেল দিয়ে প্রচন্ড আক্রমণ করে ট্রেন থামাতে বাধ্য করলাম। পাকবাহিনী এই অবস্থায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। তবুও ১৫/১৬ জন ট্রেন থেকে নেমে গুলিবর্ষণ শুরু করে। আমাদের আক্রমণে পাক দস্যু বাহিনীর প্রায় বারোজন সদস্য নিহত হয়। কয়েকজনের লাশ ট্রেনে উঠিয়ে নিয়ে পেছনের ইঞ্জিন চালিয়ে পাক সেনারা দ্রুত চলে যায়। আমাদের একজন আনসার সামান্য আহত হয় এই সংঘর্ষে।

দশ

কুড়িগ্রাম ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ভেঙে সমুদয় টাকা আমাদের কাছে নিয়ে আসার পরিকল্পনা কয়েকদিন আগেই গ্রহণ করা হয়েছে। মামুনুর রশিদ এস.ডি.ও এবং রিয়াজউদ্দিন আহমেদ ভোলা মিঞার সাথে যোগাযোগ করে তাঁদেরকে সাথে নিয়ে ব্যাঙ্ক ভাঙার জন্য ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ পরামর্শ দিলেন। মামুনুর রশিদ ও ভোলা মিঞাকে শত চেষ্টা করেও পাওয়া গেল না। ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ ব্যাঙ্কের কিছু টাকা ভুরুঙ্গামারী হেড কোয়ার্টারে এবং তাঁর কাছে রাখার প্রস্তাব দিলেন। তাঁর এই প্রস্তাবে আমরা সম্মত হতে পারলাম না। পাকবাহিনী ভুরুঙ্গামারী দখল করতে সক্ষম হলে এই টাকা নিয়ে সমস্যা, তা'ছাড়া আমাদের মধ্যে বিরোধ ও গোলযোগ দেখা দিতে পারে। তাই ব্যাঙ্ক ভেঙে আনা সমুদয়

টাকা কুচবিহারের ভারতীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখার জন্য সুবেদার বোরহানসহ আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম।

১৬ এপ্রিল শুক্রবার সকাল আটটায় চারটি জীপ ও দু'টি ট্রাক নিয়ে সর্বজনাব শামছুল হক চৌধুরী, সুবেদার বোরহান, ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াউদ্দিন আহমেদ, আবদুল লতিফ, হেলালউদ্দিন, প্রফেসর হায়দার আলীসহ প্রায় বিশজন ই.পি.আর এবং নতুন সংগৃহীত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কুড়িগ্রাম রওয়ানা হলাম। ব্যাঙ্ক ভাঙার কথা কাউকেই জানানো হলো না, ব্যাপারটা কেবল আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হলো। সকাল দশটায় কুড়িগ্রাম পৌছে থানাপাড়ায় আদমজী জুট মিলের ক্রয় কেন্দ্রে আমরা জমায়েত হলাম। পুরাতন গার্লস স্কুলের পাশে এ্যাডভোকেট আসাদ সাহেবের বাসা থেকে ঘুম হতে জাগিয়ে রওশনকে নিয়ে এলাম। আমাদের সাথে একটি এম.এম.জি, কয়েকটি এল.এম.জি, রাইফেল ও স্টেনগান। কোর্ট বিল্ডিং-এর দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থান নেয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রেরণ করা হলো। এখানে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। আমরা খেতে যাবো, এমন সময় একজন লোক হন্তদন্ত হয়ে এসে খবর দিলো, পাকবাহিনী শহরের দিকে আসছে। এ সময় ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। আমরা পুরনো রেল স্টেশনের কাছে আশ্রয় নিলাম। পাকবাহিনীর আগমনের সত্যতা যাচাই করার জন্য সুবেদার বোরহান একটি জীপে শহরের পশ্চিমদিকে অগ্রসর হলেন। আমি ও রওশন রিক্শায় কুড়িগ্রাম বাজারে ঢুকলাম। ঘড় ঘড় শব্দ তখনও হচ্ছে, দেখা গেল, পাকা রাস্তার ওপর দিয়ে ড্রাম গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর এই শব্দ থেকে মনে হচ্ছিল ট্যাঙ্ক আসছে। আমরা আবার আদমজীতে জমায়েত হলাম। বড়বাড়ি পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে প্রায় এক ঘন্টা পর সুবেদার বোরহান ফিরে এলেন। পাকবাহিনী কোথাও নেই। কেউ হয়তো গুজব ছড়িয়েছে। আর বিলম্ব না করে শাবল-দুরমুজ ইত্যাদি নিয়ে আমরা কোর্ট বিল্ডিংস্থ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে পৌছে গেলাম। আমাদের লোকজন আগে থেকেই এই এলাকা ঘিরে রেখেছিল। আমরা ব্যাঙ্কের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ব্যাঙ্ক অফিসের বাইরের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব হলো, কিন্তু স্ট্রং রুমে প্রবেশ করা সহজে সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে শাবল দিয়ে দেয়াল ফুটো করে গ্রেনেড চার্জ করা হলে দেয়াল ভেঙে যায়। আমি ভাঙা দেয়াল দিয়ে ঢুকে স্ট্রং রুমের দরজা খুলে দিলাম। আলগা টাকার বান্ডিল বস্তায় এবং কাঠের বাক্সে ভর্তি করে তা শামছুল হক চৌধুরী, সুবেদার বোরহান ও উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেটসহ মাথায় এবং ঘাড়ে বহন করে ট্রাক ও জীপে উঠানো হলো। টাকা ট্রাকে তুলে দেয়ার সময় জীপের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যাজিস্ট্রেট হেলালউদ্দিন হঠাৎ করে কম্পিত হাতে স্টেনগান আমার দিকে তাক করলে সাথে সাথে জিয়াউদ্দিন আহমেদ তাঁর হাত চেপে ধরে তাকে নিরস্ত্র করে। রওশন হেলালউদ্দিনের সামনে দাঁড়ালো। এমনিতেই উত্তেজনা মুহূর্ত, তদুপরি আরো উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। জিয়াউদ্দিন আহমেদ আমাকে জড়িয়ে ধরে অন্য কেউ ব্যাপারটা জানার আগেই উপস্থিত বুদ্ধি-মত্তা দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করলেন। আসলে হেলালউদ্দিন দুর্বলচিত্তের মানুষ, তিনি খুবই ঘাবড়ে গিয়ে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েন।

সামনে দু'টি জীপ, মাঝে দু'টি ট্রাক ও পেছনে দু'টি জীপ নিয়ে বিকেল চারটায় ভুরুঙ্গামারী অভিমুখে যাত্রা শুরু করলাম। আমরা জানি না কত টাকা আমরা নিয়ে যাচ্ছি। এর আগে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, জীপ ও ট্রাক ভুরুঙ্গামারী বা সাহেবগঞ্জে থামবে না, থামবে সোজা কুচবিহার ভারতীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সামনে গিয়ে। পথে কেউ থামানোর চেষ্টা করলে গুলি করা হবে। রওশন ও জিয়াউদ্দিন আহমেদসহ আমি দ্বিতীয় ট্রাকে টাকার ওপর বসে। আমাদের ট্রাকে এম.এম.জি এবং দু'জন ই.পি.আর সতর্ক অবস্থায় বসে রয়েছে। সামনে ও পেছনের জীপে এবং প্রথম ট্রাকে এল এম.জি.। এছাড়া প্রত্যেকটি গাড়ি রাইফেল ও স্টেনগান দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। কুড়িগ্রাম শহর ছেড়ে আমরা চরের মধ্যে এসেছি, এমন সময় প্রথম ট্রাকের পেছনের একটি চাকা ফেটে গেল। সৌভাগ্যক্রমে ট্রাকে একটি অতিরিক্ত চাকা ছিল। ট্রাক ও জীপের ড্রাইভাররা যথাক্রমে আঙ্গুর, রঞ্জু, রব্বানী, খয়বর, মন্টু ও মধু দ্রুত চাকা লাগিয়ে দিল। ভুরুঙ্গামারী যখন পৌছলাম, তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। আমরা পাকা পথ ধরে সোজা পশ্চিমদিকে চলছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজদের সাথে জাপানের যুদ্ধ বেঁধে গেলে জাপানীরা মনিপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এ সময় ইংরেজরা দিল্লী থেকে মনিপুর পর্যন্ত পাকা রাস্তা ও রেলপথ তৈরি করে। পাকা রাস্তা কুচবিহার, দিনহাটা, সাহেবগঞ্জ এবং রেলপথ লালমনিরহাট জংশন থেকে দিনহাটার গীতালদহ, বামনহাট হয়ে ভুরুঙ্গামারীর ভেতর দিয়ে আসাম অভিমুখে চলে গেছে।

ট্রাক ও জীপ ভর্তি টাকা নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে সাহেবগঞ্জের মধ্য দিয়ে মহকুমা শহর দিনহাটায় পৌছে গেলাম। অস্ত্রে সজ্জিত ট্রাক ও জীপের বহর দেখে রাস্তার যানবাহন দু'পাশে সরে দাঁড়িয়ে যেতে থাকে। রাস্তার উভয় পাশের দোকান ও পায়ে চলা পথের শত শত মানুষ উৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে থাকে। রাত এগারোটায় কুচবিহার জেলা শহরে ভারতীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সামনে আমরা থামলাম। রাতে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা সম্ভব হলো না। প্রথমে সাদা পোশাকে পুলিশ স্থানটি ঘিরে রাখলো এবং পরে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আসলেন। জীপ ও ট্রাকের ওপরই আমাদেরকে রাত কাটাতে হলো। সকালে ব্যাঙ্ক কর্মকর্তা, ডি.সি, জেলা কংগ্রেস সভাপতি অরুণদা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আসলেন। ব্যাঙ্ক কর্মকর্তারা জানালেন, এই মুহূর্তে আমাদের টাকা ব্যাঙ্কে জমা নিতে পারা যাবে না। তাঁরা দিল্লীতে অনুমতি চেয়ে তারবার্তা প্রেরণ করেছেন, উত্তর পেলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আমরা বেশ ঘাবড়ে গেলাম, কেননা ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এই টাকা ব্যাঙ্কে রাখার অনুমতি প্রদান না করলে আমরা বিপাকে পড়ে যাব। শত শত মানুষ আমাদেরকে দেখার জন্য ভিড় করে। অনেকেই মিষ্টি, সিগারেট, ফলমূল ইত্যাদি দিয়ে যাচ্ছিলেন। দিল্লী থেকে এই দিন অনুমতি না পাওয়ার কারণে ব্যাঙ্কে টাকা রাখা সম্ভব হলো না। সন্ধ্যা নেমে এলো, তারপর রাত। এই রাতেও আমরা একইভাবে জীপ ও ট্রাকের ওপর শুয়ে–বসে কাটালাম। সকাল দশটায় ব্যাঙ্কের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে শামছুল হক চৌধুরী জানালেন, দিল্লী থেকে অনুমতি পাওয়া গেছে। আমরা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সেদিনের মত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের

স্বাভাবিক কাজ প্রায় বন্ধ থাকলো। এই ব্যতিক্রম কুচবিহারের মানুষ সহজেই মেনে নিলেন।

টাকা ভর্তি কাঠের বাক্স ও বস্তা ব্যাঙ্কের ভেতর নিয়ে যেতে ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা আমাদের যথাসম্ভব সাহায্য করলেন। টাকা হিসেব করে রাখার জন্য অনেকগুলো স্টিলের বড় ট্রাঙ্ক নিয়ে আসা হলো। টাকার হিসেব শুরু হলো। পাঁচশ' টাকার নোট পাওয়া গেল না। পরবর্তীকালে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মার্চ মাসের ৩০/৩১ তারিখে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, এস.ডি.ও মামুনুর রশিদ ও ভোলা মিঞা ব্যাঙ্ক থেকে এই পাঁচশ' টাকার নোট বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ভারতে পাকিস্তানী পাঁচশ' টাকার নোটের প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় মামুনুর রশিদ ও ভোলা মিঞা সোনাহাট এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পাঁচশ' টাকার নোট প্রেরণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তাঁদের এই চাতুরি ধরা পড়ে যায় এবং ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সমুদয় টাকার হিসেব করে মোট এক কোটি ষাট লক্ষ ষাট হাজার টাকা পাওয়া গেল। সিকি, আধুলি, এক টাকার পুরনো ছেঁড়া নোটসহ খুচরো ষাট হাজার টাকা ছিল। ভুরুঙ্গামারী হেড কোয়ার্টারে মুক্তিযোদ্ধাদের কাজে ব্যয় করার জন্য এই খুচরো ষাট হাজার টাকা আলাদা করে রেখে, বাকি এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা কালো স্টিলের ট্রাঙ্ক ভরে তালা লাগিয়ে সীল-গালা করে ব্যাঙ্কে রাখা হলো। ছ'জনের যৌথ নামে রাখা হলো এই টাকা। এই ছ'জন হলেন সর্বজনাব শামছুল হক চৌধুরী এম.পি.এ, মোজাহার হোসেন চৌধুরী এম.এন.এ, ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াউদ্দিন আহমেদ, আবুল লতিফ, দ্বিতীয় অফিসার আব্দুল হালিম এবং প্রফেসর হায়দার আলী।

টাকা জমা দেয়ার কাজ সম্পন্ন করার পর আমরা ভুরুঙ্গামারীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সন্ধ্যার কিছু আগে দিনহাটা পৌছলে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা কমল গুহ তাঁর অফিসে চা খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছিল। ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী বিমলদাকে কিছু খাবার দিতে বললাম। আমার কাছে কোন টাকা-পয়সা ছিল না। আজ অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে, এতগুলো টাকার ওপর আমরা তিনদিন শুয়ে-বসে থাকলাম অথচ টাকার একটি বান্ডিলও নিজের কাছে রাখার কথা কারুরই মনে হয়নি। আজ হয়তো কেউ বিশ্বাস করতে চাইবেন না, কিন্তু এটাই অকাট্য সত্য।

এগারো

পাকবাহিনী ২৩ এপ্রিল তিস্তা ও লালমনিরহাট থেকে প্রচন্ড গুলিবর্ষণ করতে করতে কুড়িগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। তিস্তা দখল করার পর পরই পাকবাহিনী লালমনিরহাট দখল করে নেয়। বর্বর পাকবাহিনীর ভারি অস্ত্রের তীব্র আক্রমণে টিকতে না পেরে আমরা আমাদের অবস্থানসমূহ ছেড়ে পিছু হটে আসতে থাকি। আমাদের অবস্থানও সুবিধাজনক ছিল না। লালমনিরহাট থেকে বড়বাড়ি ও কাঁঠালবাড়ি হয়ে আমাদের রাজারহাট,

টগরাইহাট ইত্যাদি অবস্থান পেছন দিক দিয়ে ঘিরে ফেলার যথেষ্ট সুযোগ পাকবাহিনীর রয়েছে। কুড়িগ্রামের অবস্থান ছেড়ে আমরা ধরলা নদী অতিক্রম করে নদীর উত্তর পাশে পাটেশ্বরী মাঝে রেখে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর পাঁচগাছি, ঘোগাদহ ও চর অঞ্চল এবং নুন খাওয়া-যাত্রাপুর থেকে ফুলবাড়ি পর্যন্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করে ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী ও ফুলবাড়ি থানা মুক্ত রাখতে সক্ষম হলাম। পাটেশ্বরীতে সুবেদার বোরহান, যাত্রাপুর ও নুন খাওয়ায় সুবেদার মাজহার এবং ফুলবাড়িতে আরব আলী অবস্থান গ্রহণ করলেন। পাকবাহিনী যাতে ধরলা নদী অতিক্রম করে না আসতে পারে সে জন্য আমরা সাধ্যাতীত প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান তৈরি করি এবং পাটেশ্বরী থেকে ভুরুঙ্গামারী পর্যন্ত টেলিফোন লাইন মেরামত ও সচল রাখা এবং ই.পি.আর-দের আনা ওয়্যারলেস সেট বিভিন্ন অবস্থানে সংস্থাপন করা হলো।

সর্বশ্রেণীর মানুষ আপনা থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্ত এলাকায় বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করলো। চুরি, ডাকাতি বা যেকোন ধরনের অসামাজিক-অন্যায় কাজ যেন এই এলাকা থেকে এক অদৃশ্য জাদু স্পর্শে মিলিয়ে গেল। পারস্পরিক কোন্দল ভুলে সবাই সবার সাথে সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ হলো। ঘাপটি মেরে থাকা গুটি-কয়েক লোক ছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের জাদু স্পর্শে শিশু-কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় সবাই একই মন্ত্রে দীক্ষিত। পাকবাহিনী কুড়িগ্রাম শহর দখল করার আগ মুহূর্তে পাট ব্যবসায়ী ও মুসলিম লীগের দালাল আহম্মদ হোসেন সরকার এবং তার পরিবারের সদস্যরা ভুরুঙ্গামারীর পাটেশ্বরীতে তাদের গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পরে হঠাৎ করেই একদিন মুক্ত এলাকা থেকে পালিয়ে পাকবাহিনীর দখলকৃত কুড়িগ্রাম শহরে তারা চলে গেল।

ইতিমধ্যে আমাদের বিস্তীর্ণ মুক্ত এলাকা ও বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কথা দেশের সর্বত্র মুক্তিকামী মানুষের কাছে এবং বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতসহ বিদেশী সাংবাদিকরা আমাদের ভুরুঙ্গামারী হেড কোয়ার্টারে আসতে থাকে। কোন কোন সাংবাদিক বিভিন্ন প্রতিরক্ষা অবস্থান স্বচক্ষে দেখে আসেন। ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কর্মী, সরকারি কর্মকর্তাগণ আমাদের কাছে এসে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সাহস ও অনুপ্রেরণা যোগাতে থাকেন। দিনহাটার কমল গুহ তাঁর উইলিস জীপ নিয়ে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত,এমন কি কোন কোন সময় অনেক রাত পর্যন্ত অবস্থান করতেন। তাঁর জীপটি জোর করেই আমাদের বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করতেন।

রংপুর কারমাইকেল কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি মোখতার এলাহী, ছাত্র নেতা আবুল মনসুর, টুকু, আবদুল মালেক, কুড়িগ্রামের আব্দুল কুদ্দুস নান্নু, আমিনুল ইসলাম মঞ্জু, রুকু, নূরুল ইসলাম, শাহ আলম, সাচ্চু, আবদুল বাতেন, নেত্রকোনার ছবি বিশ্বাস প্রমুখ ভুরুঙ্গামারীতে সমবেত হয় এবং কয়েকদিন অবস্থানের পর ভারতে চলে যায়। মে মাসের প্রথম সপ্তাহের এক দুপুরে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী আমাদের মুক্ত এলাকা পরিদর্শনে আসেন। তিনি ভুরুঙ্গামারী হাই স্কুল ও কলেজে ট্রেনিং সেন্টার এবং তিনটি থানা সম্পূর্ণ মুক্ত রেখেছি শুনে খুব খুশি হয়ে আমাদের প্রশংসা

করলেন। শামছুল হক চৌধুরীর সাথে তিনি একান্তে অনেকক্ষণ কথা বললেন। কাপড়-ঔষধসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অসুবিধার কথা এবং আমাদের মুক্ত এলাকায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানানো হলো। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ এবং এই মুক্ত এলাকায় রেডিও ট্রান্সমিটার স্থাপনের পূর্ণ আশ্বাস দিয়ে তিনি চলে গেলেন। এরপর প্রায় একমাস এই এলাকা মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম। তখন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়কালেও তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি।

মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একদিন খোলা জীপ চালিয়ে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের ছাত্র নেতা আব্দুর রউফ ভূরুঙ্গামারী উপস্থিত হলেন। অল্পক্ষণ আগে পাটেশ্বরী প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে আমি এসেছি। শামছুল হক চৌধুরীসহ আমরা তাঁকে স্বাগত জানালাম। তিনি জানালেন, তাঁর খুব ক্ষিদে পেয়েছে। খাওয়াশেষে আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান ও ঘাঁটিসমূহ পরিদর্শন এবং আমাদের মুক্ত এলাকায় অবস্থানের জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম। তিনি খুব ব্যস্ততা দেখালেন। তিনি কিছুদিনের মধ্যে আবার আসবেন বললেন এবং কিছু টাকা চাইলেন। শামছুল হক চৌধুরী এক টাকার দু'টি বান্ডিলে দু'শ' টাকা তাঁকে দিলেন। রউফ ভাই জীপ চালিয়ে চলে গেলেন, পুরো যুদ্ধকালীন সময় তাঁকে আর আমাদের কাছে পাইনি।

ব্যাঙ্ক ভেঙে টাকা নিয়ে কুচবিহার যাওয়ার সময় জীপ ও ট্রাক বহরের প্রথম জীপ ড্রাইভার ছিল খয়বর আলী। সাহেবগঞ্জে জীপ না থামানোর জন্য প্রফেসর হায়দার আলীর পরামর্শ ও ক্যাপ্টেন নওয়াজিশের নির্দেশে কয়েকজন ই.পি.আর সদস্য আমাদের পাটেশ্বরী অবস্থানের দক্ষিণে চরের মধ্যে ড্রাইভার খয়বরকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। খয়বরের হত্যায় আমরা নিদারুণ মর্মাহত হলাম এবং দায়ী ই.পি.আর ক'জনকে কঠোর শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। নিজেদের মধ্যে আর যাতে বিভেদ সৃষ্টি না হয়, সে জন্য আরো কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হলো। সুবেদার বোরহান অগ্রণী ভূমিকা পালন করে সৃষ্ট পরিস্থিতি আয়ত্তে আনলেন। দায়ী ই.পি.আর কয়েকজনকে যুদ্ধের অবস্থান থেকে সাহেবগঞ্জ পাঠিয়ে দেয়া হলো।

পাক দস্যুবাহিনী কুড়িগ্রাম দখলের আগে নাসির সোপ ফ্যাক্টরির অবাঙালি মালিকের ছেলে সিরাজুল ও অন্যান্যকে ভূরুঙ্গামারী অথবা ভারতে আশ্রয় নেয়ার জন্য বলা হলো। কিন্তু তারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। এ সময় কুড়িগ্রামে বসবাসরত অবাঙালিরা গোপনে সৈয়দপুরে আশ্রয় নেয়। বড় ভাইসহ সিরাজুল কুড়িগ্রাম শহরের পশ্চিমে হরিকেশে পালিয়ে থাকে। সুবেদার মোস্তফার বাহিনীর হাতে তারা দু'জন নিহত হলো। সিরাজুল মঞ্জু ও রওশনের সহপাঠী বন্ধু ছিল। সিরাজুলের ছোট বোন কাওসার ও বড় ভাইয়ের মেয়ে মঞ্জু মন্ডলের ঘোগাদহস্থ গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। বাকি পরিবারের সদস্যরা সৈয়দপুর চলে যায়। ঘোগাদহ থেকে এই দুই অবাঙালি মেয়ে এবং মঞ্জু মণ্ডলের বড় ভাইকে কিছুসংখ্যক ই.পি.আর নাগেশ্বরী হাই স্কুলে নিয়ে আসে। বিকেলে পানবাড়ি বি.এস.এফ হেড কোয়ার্টার থেকে ভূরুঙ্গামারী এসে এই খবর পেয়ে

সাথে সাথে নাগেশ্বরী এসে দেখলাম, অবাঙালি দুই মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে। মজুর বড় ভাইকে হত্যার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। কিছু ই.পি.আর সদস্য তাকে হত্যা করার পক্ষে, কয়েকজন বিপক্ষে। অবশেষে তাকে উদ্ধার করে যোগাদহ পাঠিয়ে দেয়া হলো।

ভূরুঙ্গামারীতে বসবাসরত বিহারিদেরকে ভারতে চলে যেতে বলা হলো। প্রায় সবাই চলে গেল। প্রাক্তন পুলিশ হাবিব খান ও তার বড় ছেলে ইসা খানসহ পরিবারের কোন সদস্য ভারতে গেল না। পাকবাহিনীর গুপ্তচর সন্দেহে তাদেরকে গ্রেফতার করে থানা হাজতে রাখা হলো। দু'দিন পর এদেরকে হত্যা করা হলো। ইসা ও হাবিব খানের দুই মেয়েকে নিরাপদে চর ভূরুঙ্গামারীর এক বাড়িতে রাখা হয়। পরে পাকবাহিনী ভূরুঙ্গামারী দখল করলে তারা অন্যান্য পরিবারের সাথে মিলিত হয়।

মুক্ত এলাকা সোনাহাটের একমাত্র কট্টর জামাতে ইসলামীপন্থী বেলাল মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে নানা অপ্রচার চালাতে থাকে। এই অপপ্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য তাকে বহুবার বলা হয়, কিন্তু সে অপপ্রচার চালিয়েই যেতে থাকে। একদিন মুক্তিযোদ্ধারা তাকে ধরে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে আসে। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবে না, এই প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর আলাউদ্দিন মন্ডলের জিম্মায় তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

জামাত নেতা গোলাম আজমের সাক্ষাৎ শিষ্য ভূরুঙ্গামারী কলেজের প্রিন্সিপাল কামরুদ্দিন আহমেদও এই সময় মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অপপ্রচার চালাতে থাকে। আমরা তাঁকে এই শয়তানি কাজ থেকে বিরত থাকতে বললাম। কিন্তু এই জ্ঞানপাপী পাকিস্তানী দালাল কোন কথাই শুনলো না। বাধ্য হয়ে প্রিন্সিপাল কামরুদ্দিন আহমেদকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য আমাদের বিশেষ গেরিলা বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হলো। একদিন রাতে প্রিন্সিপালকে ধরে এনে পাটেশ্বরী পুলের নিচে বেয়নেট চার্জ ও গুলি করে হত্যার মহড়া করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কোন অপপ্রচার ও কোন কাজ করবে না-- এই প্রতিশ্রুতি দিলে তাকে রাতেই সোনাহাট বি.এস.এফ ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়। খুব ভোরে প্রিন্সিপালের স্ত্রী শামছুল হক চৌধুরী ও আমার কাছে এসে তার স্বামীকে ফিরিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে কাঁদতে থাকে। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কথা। মার্চের প্রথম সপ্তাহে ভূরুঙ্গামারী কলেজে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের সময় প্রিন্সিপাল সাহেব বাধা দেন। এতে ছাত্রসহ সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে কলেজ সংলগ্ন তার বাড়িতে আগুন লাগাতে যায়। আমি কলেজে পতাকা তুলে দিয়ে উত্তেজিত মানুষকে নিরস্ত করলাম। প্রিন্সিপাল বললেন, "সাড়ে সাত কোটি মানুষ ভুল করলেও আমি ভুল করবো না। যেকোন কিছুর বিনিময়ে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে।।" আমি ও শামছুল হক চৌধুরী সাথে সাথে সোনাহাট বি.এস.এফ ফাঁড়িতে ফিরে এলাম। এখানে এসে প্রিন্সিপালকে দেখতে পেলাম। তিনি তখন ভীত-সন্ত্রস্ত। ক্যাপ্টেন যাদব, সুবেদার রবীন মেহেরাও আমাদের সামনে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবেন না-এই মর্মে প্রিন্সিপাল পবিত্র কোরআন স্পর্শ করে আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করলেন। আমরা তাঁকে সাথে নিয়ে এসে বাসায় পৌছে দিলাম।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কুড়িগ্রাম শহরের পাশে এক সফল অভিযান চালিয়ে সুবেদার মোস্তফা কুড়িগ্রাম মুসলিম লীগ ও পাকবাহিনীর একনিষ্ঠ দালাল পনিরউদ্দিন আহমদের পুত্র তাজুল ইসলাম এবং দুই মেয়েকে ধরে ভুরুঙ্গামারী হেড কোয়ার্টারে নিয়ে আসে। আমি ও শামছুল হক চৌধুরী পানবাড়ি বি.এস.এফ হেড কোয়ার্টারে অস্ত্র ও গোলা-বারুদের জন্য গিয়েছিলাম। এদেরকে হত্যা করার জন্য সুবেদার মোস্তফা যখন সকল প্রস্তুতি নিয়েছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা ফিরলাম এবং হত্যা করার পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়া হলো। সুবেদার ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, পাকবাহিনীর এই পাঁচটা কুকুরকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না। শামছুল হক চৌধুরীর জিম্মায় স্কুল শিক্ষক সৈয়দ মন্ডল সাহেবের বাসায় খাবার, কাপড়, সাবান ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করে তাদেরকে থাকতে দেয়া হলো। এখানে তেরোদিন অবস্থান করার পর ফুলবাড়ির কাশীপুর এলাকায় আত্মীয়ের বাড়িতে থাকার অনুমতিদানের প্রার্থনা জানালে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা না করার অঙ্গীকারের পর তাদেরকে সেখানে থাকার অনুমতি দেয়া হয়। কাশীপুরসহ ফুলবাড়ি থানা বরাবর শত্রুমুক্ত এলাকা ছিল। কিন্তু একদিন সবার অলক্ষ্যে দুই বোনসহ তাজুল ইসলাম পালিয়ে কুড়িগ্রাম চলে যায় এবং পাকবাহিনীর সাথে মিলিত হয়।

কলিমউদ্দিন হাবিলদার ও কিছুসংখ্যক ই.পি.আর সদস্য জয়মনিরহাটের আনোয়ার সাহেবকে (আন্তাজ) হত্যার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আনোয়ার সাহেব আমাদের হাতে সর্বপ্রথম নিহত পাঞ্জাবি সুবেদারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন এবং আমাদের পরিকল্পনায় বাধা দিয়েছিলেন। শিক্ষক আজিমউদ্দিন সাহেব আমার কাছে এসে আন্তাজ সাহেবকে হত্যা না করার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি জয়মনিরহাট গিয়ে হাবিলদার কলিমউদ্দিনকে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে বললাম। এরপর আন্তাজ সাহেবের কোন অসুবিধা হয়নি।

মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মঞ্জু মন্ডল ভারত থেকে ফিরে এসে রায়গঞ্জ হয়ে বেপারীহাটে ভগ্নীপতির বাড়ি যাচ্ছিল। এই সময় হাবিলদার কলিমউদ্দিন রায়গঞ্জে ডাক্তার রোস্তম আলী সাহেবের বাড়ির ঘাঁটিতে অবস্থান করছিল। হাবিলদার মঞ্জুকে ধরে এই বাড়িতে নিয়ে এসে চোখ বেঁধে রাখে এবং হত্যা করার প্রস্তুতি নেয়। মঞ্জুকে হত্যা করে মাটি চাপা দেয়ার জন্য এই বাড়িতে গর্তও খোঁড়া হয়। কয়েকজন ই.পি.আর সদস্য মঞ্জুকে হত্যা করতে বাঁধা দেয় এবং হেড কোয়ার্টার ও ক্যাপ্টেন নওয়াজিশের কাছ থেকে অনুমতি আনতে বলে। বিকেল তিনটায় আমি খেতে যাব এমন সময় কলিমউদ্দিন হাবিলদার এসে বললো, মুসলিম লীগের একজন বড় দালালকে ধরা হয়েছে। ওকে হত্যা করা হবে। আপনাদের ও ক্যাপ্টেন সাহেবের অনুমতি নেয়ার জন্য এসেছি। ধৃত দালালের নাম জানতে চাইলে মঞ্জুর নাম এড়িয়ে গেল। আমি বললাম, দালালকে আগে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে আসা হোক, তারপর যা হয় করা যাবে। আমাদের কাছে অনুমতি না পেয়ে কলিমউদ্দিন হাবিলদার সাহেবগঞ্জে ক্যাপ্টেন নওয়াজিশের কাছে চলে গেল। ঠিক এই মুহূর্তে রোস্তম ডাক্তার সাহেবের ছেলে মোহাম্মদ আলী হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে

মঞ্জুকে হত্যার বিষয়ে সব খুলে বললো। আমি সাথে সাথে শামছুল হক চৌধুরী ও সুবেদার বোরহানকে জানালাম। সুবেদার বোরহান ও মোহাম্মদ আলীকে সাথে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জীপে করে রায়গঞ্জ পুলের উত্তর পাশে এসে থামলাম। বি.এস.এফ-এর সরবরাহ করা ডিনামাইট একপ্লোসিভ ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কয়েকদিন আগেই এই পুল ভেঙে ফেলা হয়েছে। ফলে জীপ রেখে হেঁটে ডাক্তার রোস্তম সাহেবের বাসায় মঞ্জুর কাছে গেলাম। দেখলাম, মঞ্জু মন্ডলকে চোখ বেঁধে রাখা হয়েছে। তাকে ভীত ও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। চোখের বাঁধন খুলে দিলাম, কোন কথা বলতে পারছিল না। শুধু শক্ত করে আমার হাত ধরে থাকলো। কোন ভয় নেই বললাম ; কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না। দেখলাম, নিশ্চিত মৃত্যু জেনে মঞ্জু ইতিমধ্যে ওর মাকে এক করুণ পত্র লিখেছে। এই সময় কলিমউদ্দিন উপস্থিত হলো। সুবেদার বোরহান তাকে প্রচন্ড ধমকের সুরে বকলেন এবং বললেন, এ ধরনের অন্যায় থেকে বিরত না হলে তাকে চরম শাস্তি পেতে হবে। অন্য ই.পি.আর সদস্যরা সুবেদার বোরহানের নির্দেশ মেনে নিল। আমি খুব রেগে গিয়ে বললাম, আমরা যুদ্ধ করছি আমাদের স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত রাখার জন্য। নিজেদের মধ্যে হানাহানি, বিভেদ সৃষ্টির জন্য নয়। ভবিষ্যতে যারা এ ধরনের কাজ করবে, তাদের খাবার বন্ধ করা এবং এই এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে অথবা উপযুক্ত পরিণতি বরণ করতে হবে। হাবিলদার কলিমউদ্দিন আমার হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করলো, এমনটা আর কখনও হবে না। সুবেদার বোরহান কলিমউদ্দিনকে সোনাহাট ঘাঁটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলেন। মঞ্জুকে বেপারীহাট আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে আমি ভূরুঙ্গামারী ফিরে আসলাম।

এরমধ্যে একদিন কয়েকজন ই.পি.আর সদস্য হেড কোয়ার্টার সিও অফিসে এসে খুব হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দিল। তারা বলছিল, ছাত্ররা গন্ডগোল বাঁধিয়েছে, তাই ছাত্ররাই যুদ্ধ করবে। তাদের বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজনের কোন খবর নেই। এখানে ঠিকমত খাবার পাওয়া যায় না। কাপড়সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস নেই। হেড কোয়ার্টারের সবাইকে গুলি করে হত্যা করবে ইত্যাদি। আমি হাবিলদার মোকসেদকে নিয়ে সোনাহাট বি.এস.এফ থেকে ২ ইঞ্চি মর্টার, ৮১ মিঃমিঃ এম.এম.জি, এল.এম.জি ও রাইফেলের গুলি নিয়ে হেড কোয়ার্টারে ফিরলাম। এখান থেকে আবার পাটেশ্বরী প্রতিরক্ষা অবস্থানে যেতে হবে। আমি গন্ডগোলকারী ই.পি.আর-দেরকে বললাম, যুদ্ধ আমরা ছাত্ররা শুরু করেছি, যুদ্ধ আমরাই করবো, আর আমাদের দ্বারাই শেষ হবে। যুদ্ধ আপনারা করবেন না ঠিক আছে, অস্ত্র রেখে যেখানে ইচ্ছা আপনারা যেতে পারেন। কিন্তু আর কোন হৈ-চৈ বা বিতর্কের সৃষ্টি করলে পরিণতি ভয়াবহ হবে। প্রশিক্ষণ শেষে আমাদের প্রায় তিনশ' ছাত্র-যুবকদের অনেককেই অস্ত্র দেয়া হয়েছে, সে কথা স্মরণ করে দিলাম। হাবিলদার মোকসেদ ই.পি.আর-দেরকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে কথা বললেন। তাকে খুব রাগান্বিত দেখাচ্ছিল। শেষে ই.পি. আররা চলে গেল।

ভূরুঙ্গামারী হাই স্কুলের পশ্চিম পাশে মোহাম্মদ ভাইয়ের বাড়িতে রাতে চাচা শামছুল চৌধুরীসহ আমি ঘুমিয়েছি। হঠাৎ রাত প্রায় তিনটার দিকে আমাদের ঠিক পশ্চিম

পাশে রাস্তার ওপারে ইনর পশ্চিমার দোকানে হৈ-চৈ ও সিন্দুক-আলমারি ভাঙার শব্দ পেয়ে জেগে উঠলাম। তিন রাউন্ড রাইফেলের গুলি হলো শুনতে পেলাম। নিরামিষভোজী অবিবাহিত হিন্দু বয়োবৃদ্ধ ইনর ভারতের ইউপি অধিবাসী, বহু বছর যাবৎ ভুরুঙ্গামারীতে তামাক ও বিড়ির ব্যবসা করে আসছে। নিজের দোকান ঘরের পেছনেই সে থাকতো। দোকান লুট করার সময় ইনর ও তার ছোট ভাইকে বেদম মারধোর করা হলো। আমি বন্দুক হাতে বের হতে যাচ্ছিলাম, তখন চাচা আমাকে বাধা দিলেন এবং চুপ থাকতে বললেন। আমার কাছে একটি দো'নলা বন্দুক, একটি রাইফেল ও একটি স্টেনগান ছিল। এসব কারা করছে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। পরদিন সকালে এই মহল্লার ডিউটিরত আনসারদেরকে ডাকা হলো। কিন্তু তাদের কাউকে পাওয়া গেল না। রাস্তায় পাশে তিনটি রাইফেল ফেলে রেখে তারা পালিয়ে গেছে।

ভুরুঙ্গামারীস্থ কৃষি বিভাগের গুদামে রক্ষিত ইউরিয়া সার বিক্রি করে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যয় বহনের অর্থ সংগ্রহের জন্য আমরা প্রচেষ্টা গ্রহণ করলাম। তখন আমাদের হাতে মোটেই টাকা-পয়সা ছিল না। ভারতে এই সারের যথেষ্ট চাহিদা। সামান্য পরিমাণ অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাজার টাকার সার বিক্রি করা হলো। ইতিমধ্যে পাকবাহিনীর তীব্র আক্রমণের কারণে এ সার বিক্রি বা অন্যত্র স্থানান্তর করা সম্ভব হলো না। কৃষি বিভাগের পিয়ন কাজী সাহেব সার বিক্রয়ে যথেষ্ট সহায়তা করলেন।

২৫ মে সকালে খবর পেলাম মুক্তিবাহিনী-প্রধান জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী ভুরুঙ্গামারীতে আসছেন। তাঁর আগমনের বিষয়ে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হলো। দুপুর দু'টায় তিনি সাহেবগঞ্জের দিক থেকে সোজা জয়মনিরহাট ডাকবাংলোতে উঠলেন। সাহেবগঞ্জ থেকে ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ তাঁর সাথে এসেছেন। আমরা এখানেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানালাম। ই.পি.আর-এর একটি দল গার্ড অব অনার প্রদান করলো। জয়মনিরহাটে ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ, সুবেদার আরব আলী ও অন্যান্যের সাথে সংক্ষিপ্ত কথা বলে তিনি কুচবিহারের পথে সাহেবগঞ্জ হয়ে চলে গেলেন। ভুরুঙ্গামারী হেড কোয়ার্টার বা আমাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি ও প্রতিরক্ষা অবস্থান পরিদর্শনে এলেন না।

পাকবাহিনী ধরলা নদী পার হয়ে আমাদের মুক্ত এলাকা দখল করার জন্য পঁচিশ মে রাত থেকে প্রচন্ড গুলিবর্ষণ ও আক্রমণ শুরু করে। ছাব্বিশ মে এই আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হলো। দখলদার বাহিনীর ভারি অস্ত্র বহর ও কামান থেকে নিক্ষিপ্ত বৃষ্টির মত গুলি এবং কামানের শেল যেনো প্রলয়কান্ড শুরু করলো। প্রতিটি শেল উপরে এবং নিচে দু'বার প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে আঘাত হানতে থাকে। প্রতি ইঞ্চি মেপে মেপে শেল নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। প্রতিটি শেলের আঘাতে আমাদের এককেটি বাঙ্কার উড়ে যাচ্ছিল। ছাব্বিশ ইঞ্চি মর্টারের মাটি প্রকম্পিত শব্দে কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। আমাদের হাতে শুধু এল.এম.জি, রাইফেল, দু'টি দুই ইঞ্চি এবং একটি ৮১ মিঃমিঃ মর্টার। ভারত থেকে পাওয়া এম.এম.জি দু'টি ২৪ মে রাতে ভারতীয় বি.এস.এফ নিয়ে গেছে। মাত্র একটি ৮১ মিঃমিঃ ও হালকা অস্ত্রের সাহায্যে সুবেদার বোরহানের নেতৃত্বে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ সৃষ্টি করে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকবাহিনীর আক্রমণ রোধ করে রাখা হলো। দু'টি ২

ইঞ্চি মর্টার দিয়ে ঘোগাদহ, পাটেশ্বরী, পাঁচগাছি এলাকায় কিছু দূরত্ব রেখে একেক সময় একেক জায়গা থেকে পাকবাহিনীর গুলিবর্ষণের জবাব দেয়া হচ্ছিল। সুবেদার আরব আলী পাটেশ্বরীর পশ্চিম বরাবর উত্তর-পশ্চিম দিকে তাঁর অবস্থান থেকে আক্রমণ প্রতিহত করে যাচ্ছিলেন। বিকেলে আমাদের একমাত্র ৮১ মিঃমিঃ-এর স্প্রিং ছিঁড়ে অকেজো হয়ে পড়লো। গুলিও আমাদের ফুরিয়ে আসছে। অস্ত্র ও গোলাগুলির জন্য আমি প্রথমে ভুরুঙ্গামারী ও পরে সোনাহাট বি.এস.এফ ফাঁড়িতে গেলাম। বি.এস.এফ-এর কাছ থেকে কোন অস্ত্র, গোলা-বারুদ পাওয়া গেল না। ক্যাপ্টেন যাদবের ওপর আমি ক্ষেপে গিয়ে বললাম, এই দুঃসময়ে আমাদেরকে অস্ত্র-বারুদ দেয়া হচ্ছে না। উপরন্তু এম.এম.জি দু'টি নিয়ে আসা হয়েছে। ক্যাপ্টেন যাদব হাসি মুখে বললেন, আমি চেষ্টা করছি, খুব সত্বরই অস্ত্র-বারুদ দেয়া হবে। সেখান থেকে ভুরুঙ্গামারী চলে এসে অস্ত্র পাওয়ার অপেক্ষায় খুবই উত্তেজনাময় মুহূর্ত কাটাতে থাকি। পাটেশ্বরীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে পড়ছে। সঙ্কোষ নদীর পুল বি.এস.এফ সদস্যরা ভেঙে ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে--সোনাহাট থেকে ফেরার পথে দেখতে পেলাম। পুলটি ভাঙা হচ্ছে ভেবে আমার অত্যন্ত খারাপ লাগলো। আমাদের সবার মন ভারাক্রান্ত। পাকবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে জবাব দেয়ার মত প্রয়োজনীয় অস্ত্র-বারুদ পাওয়া যাচ্ছে না। হানাদার বাহিনী আমাদের শেষ মুক্ত এলাকা দখল করে নেবে। নিজের মাতৃভূমি, দেশের মাটি ছেড়ে যেতে হবে, নতুবা মরতে হবে। এ যে কি যন্ত্রণা, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বুকের পাঁজর ভেঙে যাচ্ছিল। অবশেষে, সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারি সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে অর্থাৎ ভারতে চলে যেতে বলা হলো। অনেকে এর আগেই ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।

এদিকে সুবেদার বোরহান বার বার অস্ত্র ও সাহায্য চেয়ে টেলিফোনে সংবাদ দিচ্ছেন। শুধু তাঁকে আশার বাণী শোনানো হচ্ছে এই বলে যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্ত্রসহ আমরা তাঁর কাছে পৌঁছে যাব। বি.এস.এফ-এর প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা করে এসব জানানো হচ্ছিল। এছাড়া কিই-বা করার ছিল আমাদের। রাত দশটার পর এক পর্যায়ে সুবেদার বোরহানের সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁর কোন রকম সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল না। রায়গঞ্জ ও নাগেশ্বরী ঘাঁটি থেকে সামান্য গোলা-বারুদসহ কিছু ই.পি.আর সদস্য সুবেদার বোরহানের সাহায্যের জন্য গেছে। সুবেদার আরব আলী ও সুবেদার মোজাহারের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। সারাটা রাত আমাদের দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনায় ছটফট করে কাটলো। ভোর রাতে বি.এস.এফ-এর কাছ থেকে সুবেদার রবীন মেহেরা কিছু গুলি, গ্রেনেড ও রকেট ল্যাম্পার নিয়ে আসলো। সকাল আটটায় এসব সহ কয়েকজনকে সাথে নিয়ে জীপে পাটেশ্বরী রওয়ানা হলাম। অন্য একটি ট্রাকে খাবারসহ ড্রাইভার রব্বানী ও উনিশজন মুক্তিযোদ্ধা আমার পেছনে রওয়ানা হলো। নাগেশ্বরী ছেড়ে তেমাথার কাছে এসে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো এবং নিশ্চিতই বুঝতে পারলাম, পাকবাহিনী ধরলা অতিক্রম করে পাটেশ্বরী দখল করেছে। দূরে, পাকা রাস্তার দুই পাশে পাটের ক্ষেতের পাট গাছ সারিবদ্ধভাবে আন্দোলিত, পথের সোজা দক্ষিণে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল। আরো নিশ্চিত হলাম, পাক-সেনারা পাট ক্ষেতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর

হচ্ছে। সাথে সাথে বামের কাঁচা রাস্তা দিয়ে দ্রুত জীপ চালিয়ে নাগেশ্বরী, রায়গঞ্জ হয়ে ভুরুঙ্গামারী ফিরে এলাম। আমার পেছনের ট্রাক তেমাথার দক্ষিণে পাকবাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেলে হানাদাররা ট্রাকের ওপর গুলি চালাতে শুরু করে। ফলে ট্রাক উল্টে রাস্তার পশ্চিম পাশে গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। ড্রাইভার রব্বানীসহ ষোলজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হলো। আজিজ আহত অবস্থায় ধরা পড়ে, বাকি দু'জন–রায়গঞ্জের মোটর সাইকেল মেকানিক এবং ভুরুঙ্গামারীর আকালু সামান্য আহত অবস্থায় পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। পাকবাহিনীর ভারি অস্ত্রের প্রচন্ড ও তীব্র গোলাগুলির মুখে সুবেদার বোরহান টিকতে না পেরে পাটেশ্বরীর পুবদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সরে পড়ে। যাত্রাপুর থেকে নদী পার হয়ে প্রথমে মাদারগঞ্জ এবং সোনাহাটে আশ্রয় নেয়। সুবেদার আরব আলী ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা পশ্চিমদিকে সরে এসে ফুলবাড়িতে আশ্রয় নেয়। সি.আর চৌধুরী তাঁর বিশেষ গেরিলা বাহিনীসহ দুধকুমার নদীর ওপারে চর ভুরুঙ্গামারীতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

ভুরুঙ্গামারী হেড কোয়ার্টারের জীপ, বাস, ট্রাক, অন্যান্য যানবাহন, অস্ত্র ও মালামাল সাহেবগঞ্জে স্থানান্তর করা হলো। জনশূন্য ভুরুঙ্গামারীকে ভূতুড়ে মনে হচ্ছিল। সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলে বিকেল তিনটায় শামছুল হক চৌধুরীকে সাথে নিয়ে সোনাহাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। মোটর সাইকেল চালাচ্ছি আর মনে মনে আবৃত্তি করে চলেছি কবি জীবনানন্দের সেই বিখ্যাত কবিতার দু'টি লাইন, "আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়ি নদীটির তীরে, এই বাংলায়, হয়তোবা মানুষ নয়, শঙ্খ চিল শালিকের বেশে।" দুধকুমার নদীর ওপর বিরাট লোহার রেলওয়ে পুলের মধ্যখানে দেখলাম, বি.এস.এফ সদস্যরা পুল ভাঙার কাজে ব্যস্ত। সোনাহাট এসে হাই স্কুলের পেছনের পাকা রাস্তা সংলগ্ন ঘরে বসলাম। ঘাঁটির লোকজন ও কর্মীরা প্রায় সবাই এসে হাজির হলো। খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। খাবার এলো ; কিন্তু খেতে পারলাম না। পুল ভাঙা সম্পন্ন হলে নদীর পূর্ব প্রান্ত বরাবর প্রতিরক্ষা অবস্থান তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো। নদীর পূর্ব পাড় অর্থাৎ চর ভুরুঙ্গামারী, পাটেশ্বরী ও পাইকের ছড়া থেকে মাদারগঞ্জ ইত্যাদি জায়গা পাক হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হলে সোনাহাট প্রধান ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে। ক্যাপ্টেন যাদব ও সুবেদার রবীন মেহেরো এসে শামছুল হক চৌধুরী এবং আমাকে আসাম এলাকায় আশ্রয় গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন।

রাত আটটার পর আমি ও চাচা শামছুল হক চৌধুরী পাইকের ছড়া গ্রামে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পাইকের ছড়া গ্রামে চাচার শ্বশুর বাড়িতে তাঁর পরিবারের সবাই রয়েছে। নতুন ছড়ার (বিল) পাড়ে আসার পর বৃষ্টি শুরু হলে ভিজে গেলাম। বিলের পাড়ের বাড়ির লোকজনের সাহায্যে নৌকোযোগে বিল পার হয়ে রাত দশটায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম। পরদিন নামাজের পর গরুর গাড়ি করে দিনহাটার সীমান্ত এলাকা গারালঝোরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সঙ্কোষ নদীর পূর্ব পাড় দিয়ে উত্তর দিকে চলেছি।

হঠাৎ পেছনে ফিরে দেখলাম, নাগেশ্বরী এলাকার অসংখ্য ঘরবাড়ি পাকবাহিনী আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আগুনের ধোঁয়া ও ফুলকি আকাশের দিকে উঠছে।

২৭ মে। এর আগে বি.এস.এফ সদস্যরা পাটেশ্বরী পুল ডিনামাইট এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। সামান্য যা বাকি ছিল, আজ তা সম্পূর্ণ ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া হলো। ডিনামাইট বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলাম। আমরা পায়ে হেঁটে, শিশু আর মহিলারা গরুর গাড়িতে উত্তরদিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এই সময় হঠাৎ পেছন দিক থেকে 'দাদা দাদা' চিৎকারে দৌড়ে এসে ধাউড়ার কুটি গ্রামের শাহ আলী বয়াতী চাচাকে জড়িয়ে ধরলো এবং তাঁকে আমাদের সাথে নেয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। ভুরুঙ্গামারী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আবদুল হক তাঁর পরিবারের সদস্যসহ চর ভুরুঙ্গামারী গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর বাড়ির কাছে পৌঁছার সাথে সাথে তিনি বের হয়ে রাস্তায় এসে আমাদেরকে দোয়া করলেন। তাঁর ছোট ভাই স্কুল শিক্ষক তমিজউদ্দিন আমাদের সাথে যেতে চাইলে তাকে আমাদের সহযাত্রী করে নিলাম। এভাবে পথ চলতে চলতেই নতুন প্রায় বিশজন আমাদের সহযাত্রী সঙ্গী হলো। গ্রামের মানুষ পথের ধারে দাঁড়িয়ে করুণ চোখে সমবেদনা জানায়, আর বৃদ্ধরা প্রাণভরে দোয়া করতে থাকেন। এভাবে তিলাই দিয়ে পাগলাহাটের ঘাটে ঠিক সন্ধ্যায় পৌঁছে গেলাম। এ সময় ভুরুঙ্গামারীর দিক থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। আগুনও দেখা যাচ্ছিল। খেয়া নৌকায় নদী পার হয়ে পাগলাহাটের ভেতর দিয়ে দ্রুত হেঁটে ভারতীয় এলাকা গারাল-ঝোরায় এসে পৌঁছলাম। সেখানে মোহাম্মদ ভাইয়ের শ্বশুর বাড়িতে রাত কাটালাম। পরদিন নাজিরহাট আসার পর ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী জলিল সাহেব আমাদের দিনহাটা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। চাচার পরিবারের সদস্যরা গারালঝোরায় থেকে গেল। দিনহাটায় কমল গুহ আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি ও তার সহকর্মীরা এবং দিনহাটার ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক কর্মীসহ সর্বশ্রেণীর শত শত মানুষ আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

তেরো

২৮ মে পাকবাহিনী ভুরুঙ্গামারী দখল করে নেয়ার পর ই.পি.আরসহ মুক্তিযোদ্ধারা ভুরুঙ্গামারীর পুবদিকে আসাম সীমান্তের গোলকগঞ্জের সোনাহাট সীমান্ত সংলগ্ন মুক্ত এলাকা সোনাহাট এবং পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার সাহেবগঞ্জ সীমান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের যতদূর সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে সাহেবগঞ্জ এবং সোনাহাটে একত্র এবং পুনর্গঠিত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। সুবেদার বোরহান সোনাহাটে এবং সুবেদার আরব আলী, সুবেদার মোজাহার, হাবিলদার আনিস মোল্লা, সুবেদার শামছুল হক, সুবেদার মোস্তফা, সুবেদার মালেক চৌধুরী, হাবিলদার মোকসেদ, নায়েক খলিল, নায়েক খালেক, সিরাজ, কোয়ার্টার

মাস্টার রাজ্জাকসহ সকল ই.পি.আর সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা সাহেবগঞ্জে সমবেত হলেন। ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ সপরিবারে আগে থেকেই সাহেবগঞ্জ হাজী সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করছেন। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে প্রকট সমস্যা দেখা দিল। এর ওপর অধিকাংশ সময় এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের অনেককে গাছের নিচে আশ্রয় নিয়ে অন্যান্য আসবাবপত্রসহ বৃষ্টির পানিতে ভিজতে হলো। আমাদের কাছে টাকা-পয়সা বলতে কিছুই ছিল না। ভারতীয় আতপ চাল সিদ্ধ করলে গলে দলা-মোচড়া হয়ে যেত। এর সাথে শুধু পাট পাতা সিদ্ধ এবং মাঝে মাঝে পানির মত ডাল ছাড়া বেশ কয়েকদিন অন্য কোন কিছুর ব্যবস্থা করা গেল না। তবে অল্পদিনের মধ্যেই থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল।

নাগেশ্বরীর দক্ষিণে তেমাথায় ২৭ মে সাথী মুক্তিযোদ্ধা, ভারতের ছড়া গ্রামের আজিজ ট্রাকে বসা অবস্থায় আহত হয়ে পশু পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। পাকবাহিনী আজিজকে ভুরুঙ্গামারী নিয়ে এসে পাঁচদিন আটকে রেখে নৃশংসভাবে অত্যাচার করে। এই পাঁচদিন তাকে কোন খাবার দেয়া হয়নি। পানি চাইলে নরপশুরা প্রস্রাব করে দিয়েছে তার মুখ সোজা। তার একটি চোখ উপড়ে নেয়া হয়, হাতের আঙ্গুল কেটে ফেলা হয়। এভাবে বর্বরতম পৈশাচিক অত্যাচার করে পাঁচদিন পর ভুরুঙ্গামারীর পুবদিকে নিয়ে গিয়ে তাকে গুলি করে হত্যা করে তারা। এইভাবে বাংলার স্বাধীনতার জন্য নিষ্ঠুরতম অত্যাচারে জর্জরিত দামাল ছেলে আজিজ বীরের বেশে শহীদের মর্যাদায় মহিমান্বিত হয়ে চিরবিদায় নিল।

পাক হানাদার বাহিনী ভুরুঙ্গামারী দখল করার সাথে সাথে জামাতে ইসলামের আদর্শ সমর্থক প্রিন্সিপাল কামরুদ্দিন, মুসলিম লীগের হাজী সাহেব, জয়মনিরহাটের কাজী, মৌলানা আব্দুল লতিফ, মৌলানা আব্দুল আজিজ, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার জালাল, হোঃ প্যাঃ ডাক্তার জব্বার, হাজী সাহেবের ছেলে বাচ্চু, বহালগুড়ির চেয়ারম্যানের ছেলে ছালে বাচ্চু, শিক্ষক আমজাদ হোসেন ও সোনাহাটের বেলাল পাকবাহিনীর ঘৃণ্য সহযোগীতে পরিণত হলো। এই সময় একদিন ভুরুঙ্গামারীর পূর্ব চৌমাথার পাশের বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় আইনুল সাহেব পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। তারা তাঁকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে তার চোখ উপড়ে ফেলে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। ভীত-বিহ্বল ব্যবসায়ীসহ সকল শ্রেণীর মানুষ ভুরুঙ্গামারী উভয় পাশে ভারতের সীমান্ত এলাকায় এবং মইদাম, পাগলাহাট, ধলডাঙ্গা, চর ভুরুঙ্গামারী ও সোনাহাট ইত্যাদি মুক্ত এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সাহেবগঞ্জে আমাদের হেড কোয়ার্টার এবং ভারতীয় সীমান্ত এলাকা বামনহাট, চৌধুরীহাট ও গীতালদহ এবং মুক্ত এলাকা ফুলবাড়িতে ছোট ঘাঁটি স্থাপন করা হলো। ভুরুঙ্গামারীর উত্তরে পাগলাহাট, ধলডাঙ্গা, শিলখুড়ি, পশ্চিম-উত্তর দিকে মইদাম, বাঁশজানি, ফুলকুমার নদীর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল নাগেশ্বরী থানার রামখানা এবং পাগলা, কাশিমপুর, অনন্তপুরসহ সমগ্র ফুলবাড়ি থানা, অপর দিকে সঙ্কোষ নদীর পূর্ব পাড় সোনাহাটের উত্তর দিকে তিলাই, বহালগুড়ি, চর ভুরুঙ্গামারী, পাইকের ছড়া এবং

দক্ষিণে বলদিয়া, সুবল পাড়, কচাকাটা, মাদারগঞ্জ, নাইকের হাট, নারায়ণপুর ও চৌদ্দকুড়ি পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে প্রায় পঁচিশ মাইল ও প্রস্থে কোথাও চার মাইল, কোথাও পাঁচ এবং ছয় মাইল পর্যন্ত মুক্ত রাখতে আমরা সক্ষম হলাম। সোনাহাট এই মুক্ত এলাকার প্রধান ঘাঁটি এবং বলদিয়া, সুবল পাড় ও মাদারগঞ্জে ছোট ঘাঁটি তৈরি হলো। সঙ্কোষ নদীর পুলের মধ্যখানের দু'টি অংশ এর আগে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এই পুলের পূর্ব প্রান্তে নদীর কিনারা বরাবর আমরা শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করলাম।

সেই সাথে সোনাহাট, বলদিয়া, সুবল পাড় ও মাদারগঞ্জ ঘাঁটি থেকে সঙ্কোষ নদী অতিক্রম করে এবং পশ্চিমে সাহেবগঞ্জ, বামনহাট, চৌধুরীহাট, গীতালদহ ও ফুলবাড়ি ঘাঁটি থেকে পাকবাহিনীর দখলকৃত ভুরুঙ্গামারী, পাটেশ্বরী, জয়মনিরহাট, আন্ধারী ঝাড়, রায়গঞ্জ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম, উলিপুর, চিলমারী, লালমনিরহাট, মোগলহাট, হাতীবান্দা, বড়বাড়ি ইত্যাদি অবস্থানের ওপর আমরা আক্রমণ শুরু করলাম। নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, মোগলহাট ইত্যাদি হানাদার বাহিনীর অবস্থানের ওপর অভিযানে ফুলবাড়ি ও গীতালদহ মধ্যবর্তী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

এর আগে নাগেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী মুক্ত থাকাকালে আমাদের পাটেশ্বরী প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে ধরলা নদী অতিক্রম করে কুড়িগ্রামে পাকবাহিনীর অবস্থানের ওপর আমরা সফল অভিযান চালিয়েছি। এমনি এক অভিযানের সময় আমরা কুড়িগ্রাম শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হানাদার বাহিনীর দালাল পাট ব্যবসায়ী আহাম্মদ হোসেন সরকারের পাটের গুদামে আগুন ধরিয়ে দিই।

চৌদ্দ

ছাত্র ও যুবকদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ নিশ্চিত, তাঁদের অনুপ্রাণিত এবং সংগ্রহের জন্য সীমান্ত এলাকায় যুব শিবির স্থাপন করা হলো। ছাত্র-যুবকসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের এইসব যুব শিবিরে অভ্যর্থনা জানানো হয়। শিবিরগুলোতে সমবেত প্রশিক্ষণার্থীদের কয়েকদিন রাখার পর সরাসরি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রেরণ করা হতো। কুচবিহার জেলার টাপুরহাটে প্রধান যুব শিবির স্থাপন করার পর যুব শিবিরগুলো থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের টাপুরহাট শিবিরে এবং সেখান থেকে ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রেরণ করা হতো। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর কোম্পানি ও প্লাটুন গঠন করে অস্ত্রসহ সরাসরি সেক্টর, সাব-সেক্টর ও বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রেরণ করা হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা, দৈহিক গড়ন, বুদ্ধিমত্তা ও প্রশিক্ষণের সময় তাদের সাফল্যের ভিত্তিতে কোম্পানি কমান্ডার ও প্লাটুন কমান্ডার নির্বাচন করা হতো। অনেক সময় ট্রেনিং গ্রহণের আগেই ঐ সব নির্বাচন কাজ সম্পন্ন করা হতো। বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন নামকরণ করা হতো, যেমন, আলফা কোম্পানি, চার্লি কোম্পানি। কখনো এই নামকরণ করা হতো কোম্পানি কমান্ডার, উর্ধ্বতন কমান্ডার, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অক্ষরের নামানুসারে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার,

জুনিয়র অফিসার ও সদস্যরা প্রশিক্ষণ দিতেন। প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোর মধ্যে শিলিগুড়ির পরে কার্শিয়াং পাহাড়ী অঞ্চলের মূর্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মুজিব ক্যাম্প, ভাসানী ক্যাম্প এবং বিহারের চাকুলিয়া প্রশিক্ষণ শিবির অন্যতম। পনের, বিশ, বাইশ ও আঠাশ দিনের বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। আমাদের এই উত্তরাঞ্চলসমূহের প্রশিক্ষণার্থীদের কার্শিয়াং মূর্তি ও বিহারের চাকুলিয়ায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

ছয় নম্বর সেক্টর তথা উত্তরাঞ্চলে রংপুর জেলার সীমান্ত এলাকায় স্থাপিত যুব শিবির ও ব্যবস্থাপনা মন্ডলীর নাম নিচে দেয়া হলো :

যুব শিবিরের নাম	ভারতীয় এলাকা	বাংলাদেশ এলাকা	ব্যবস্থাপনা মন্ডলী
১. সোনাহাট [জুন মাসে বন্ধ করে দেয়া হয়]	আসাম [গোয়ালপাড়া জেলা]	ভুরুঙ্গামারী মুক্ত এলাকা	১. রহিমউদ্দিন মন্ডল ২. ইব্রাহীম আলী [শিক্ষক] ৩. আলাউদ্দিন মন্ডল ৪. শাহবাজউদ্দিন মন্ডল ৫. আব্দুল গফুর [শিক্ষক] ৬. জয়নাল আবেদীন [সরকারি কর্মচারি। ৭. ডাঃ মোজাদার হোসেন।
২. ঝাউকুটি	আসাম [গোয়ালপাড়া জেলা]	ভুরুঙ্গামারী থানা	১. অধ্যাপক মুজিবর রহমান ২. আব্দুল জব্বার সরকার ৩. শাহাদত হোসেন [শিক্ষক] ৪. আব্দুল কাদের বেপারী ৫. ডাঃ নিয়ামত আলী আকন্দ ৬. মোজাম্মেল হক
৩. নাজিরহাট	কুচবিহার জেলা [দিনহাটা মহকুমা]	ঐ	১. ডাঃ জোনাব আলী ২. জয়নাল আবেদীন খোকা ৩. মহিরউদ্দিন ৪. গিয়াসউদ্দিন [শিক্ষক] ৫. আজিজার রহমান [শিক্ষক]
৪. খোচাবাড়ি	ঐ	ঐ	১. আব্দুল গফুর [শিক্ষক] ২. নকীবউদ্দিন মন্ডল [শিক্ষক] ৩. আবু সাঈদ [শিক্ষক] ৪. আব্দুল হাকিম শিকদার [শিক্ষক]

৫. সাহেবগঞ্জ	ঐ	ঐ	১. মাজাহার হোসেন চৌধুরী [এম.এন.এ] ২. আব্দুল হাকিম [এম.পি.এ] ৩. অধ্যাপক হায়দার আলী ৪. নবাব আলী চৌধুরী ৫. আব্দুল মজিদ [শিক্ষক] ৬. পশিরউদ্দিন আহমেদ [চেয়ারম্যান] ৭. মোহাম্মদ আলী [শিক্ষক] ৮. মোকাররব হোসেন সাচ্চু
৬. বামনহাট	ঐ	ঐ	১. অধ্যাপক আব্দুল ওহাব তালুদকার ২. ডাঃ মজিবর রহমান ৩. আজিমউদ্দিন [শিক্ষক] ৪. মোজাম্মেল হক খোকা ৫. আব্দুল হাকিম [শিক্ষক] ৬. আবুল কাশেম [শিক্ষক]
৭. গীতালদহ	ঐ	লালমনিরহাট	১. চিত্তরঞ্জন দেব ২. শামছুল হুদা মন্টু ৩. আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী [জুলাই মাস পর্যন্ত]
৮. নটকোবাড়ি বালাহাট	ঐ	ফুলবাড়ি থানা	১. এ্যাডভোকেট আমানউল্ল্যা ২. আহম্মদ হোসেন মোক্তার ৩. হযরত আলী ৪. মোহাম্মদ ইউনুস ৫. জয়নাল আবেদীন [শিক্ষক]
৯. দিনহাটা শহীদ কর্নার	কুচবিহার		১. তমিজউদ্দিন [শিক্ষক] ২. আব্দুল সোবাহান ৩. শুভ্রাংশু কুমার চক্রবর্তী
১০. ওখড়াবাড়ি দিনহাটা	ঐ		১. মোজাহার হোসেন চৌধুরী [এম.এন.এ] ২. শামছুল হক চৌধুরী [এম.পি.এ]

			৩. আব্দুল হাকিম [এম.পি.এ] ৪. আবুল হোসেন [এম.পি.এ]
১১. শিতাই	কুচবিহার জেলা [দিনহাটা মহকুমা]	রংপুর জেলা [হাতীবান্দা থানা]	১. করিমউদ্দিন [এম.এন.এ]
১২. পাটগ্রাম মুক্ত এলাকা	জলপাইগুড়ি জেলা	রংপুর জেলা	১. আজিজার রহমান [এম.এন.এ] ২. আবেদ আলী [এম.পি.এ] ৩. আব্দুল জলিল
১৩. হলদিবাড়ি [জলপাইগুড়ি জেলা]	জলপাইগুড়ি	রংপুর জেলা [নীলফামারী মহকুমা]	১. আব্দুল রউফ [এম.এন.এ] ২. আফসার আলী [এম.এন.এ]
১৪. কুচবিহার	কুচবিহার জেলা	প্রধান শিবির	১. আব্দুল আউয়াল [এম.এন.এ] ২. শাহ আব্দুর রাজ্জাক [এম.এন.এ] ৩. শাহ আব্দুল হামিদ [এম.এন.এ] ৪. শামছুল হক চৌধুরী [এম.পি.এ] ৫. পেয়ারা
১৫. ধুবরী	আসাম [গোয়ালপাড়া' জেলা]		১. সাদাকাত হোসেন ছক্কু মিঞা [এম.এন.এ] ২. ডাঃ ওয়াসেক আহমেদ
১৬. রৌমারী মুক্ত এলাকা	আসাম [মানকেরচর],	কুড়িগ্রাম মহকুমা	১. পান্নু মিঞা [এম.পি.এ]

কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, গোয়ালপাড়া জেলা, ধুবরী [আসাম], মাথাভাঙা, ময়নাগুড়ি ও তুফানগঞ্জ কংগ্রেস নেতা ও কর্মীবৃন্দ এই সব যুব শিবির পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন। এর মধ্যে কুচবিহার জেলা কংগ্রেস সভাপতি অরুণদা, ধুবরীর শান্তিদা, দিনহাটার রাজেন চ্যাটার্জী এবং ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা কমল গুহ এবং তাঁর কর্মীদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বাঙালি জীবনের এক ঐতিহাসিক দিন। দু'শ' চৌদ্দ বছর আগে ভারতের পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত ও হত্যা করে ইংরেজ বেনিয়ারা বাংলার স্বাধীনতা হরণ করে। আর দু'শ' চৌদ্দ বছর পর ঠিক তার অপর প্রান্তে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে স্বাধীন বাংলার বিপ্লবী সরকার গঠিত হলো। এই সরকার বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার নামে খ্যাত। এখানে সকাল প্রায় আটটায় জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ, কর্নেল [অবঃ] আতাউল গনি ওসমানী ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা এসে পৌছেন। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে চেয়ার-টেবিল ও বেঞ্চ ইত্যাদি নিয়ে এসে নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকদের বসতে দেয়া হলো। চেয়ার-টেবিলগুলোর অধিকাংশই ছিল হাতল বা পা-ভাঙা। সকাল এগারোটার মধ্যে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা এসে পৌছলেন। পার্শ্ববর্তী এলাকার সর্বস্তরের মানুষসহ প্রায় দু'শ' দেশী-বিদেশী সাংবাদিকও মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আমবাগানের শ্যামল সবুজ ছাউনিতে সমবেত। উপস্থিত দেশী-বিদেশী সাংবাদিক ও মুক্তি প্রতীক্ষিত সর্বস্তরের মানুষের সামনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করা হলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে এই জায়গার নামকরণ করা হলো "মুজিবনগর"। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি ও বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নাম ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ই.পি.আরসহ কিছু মুক্তিযোদ্ধা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করলো।

প্রথম মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ

১. তাজউদ্দিন আহমেদ -- প্রধানমন্ত্রী

২. খন্দকার মোস্তাক আহমেদ -- আইন, সংসদীয় বিষয়ক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী

৩. এইচ. এ. কামারুজ্জামান -- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

৪. এম. মনসুর আলী -- অর্থমন্ত্রী

এই সাথে আওয়ামী লীগ দলীয় ও নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য কর্নেল [অবঃ] আতাউল গনি ওসমানী বাংলাদেশ বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার ইন-চীফ নিযুক্ত হলেন। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে বাঙালি জাতির জন্য বাংলাদেশ নামে এক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হলো। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা পাঠ করেন। স্বাধীনতার মূল ঘোষণাটি এর আগে ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগর থেকে প্রচার করা হয়েছে। ২৬ মার্চ, ১৯৭১ থেকে এই ঘোষণা কার্যকর করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন এবং প্রতিটি স্তরে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার বেসামরিক প্রশাসনকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করেন। উত্তরাঞ্চলীয় বেসামরিক প্রশাসন এর অন্যতম। কুচবিহার জেলা সদরে উত্তরাঞ্চল বেসামরিক প্রশাসনের অফিস স্থাপন করা হলো। বেসামরিক কর্মকর্তাদের নাম ও দফতর নিচে দেয়া হলো

১. মতিউর রহমান [এম.এন.এ] -- চেয়ারম্যান

২. শামছুল হক চৌধুরী [এম.পি.এ] -- প্রচার বিভাগ

৩. এম.এ.আউয়াল [এম.এন.এ] -- অর্থ বিভাগ

৪. শাহ আব্দুর রাজ্জাক [এম.পি.এ] -- শিক্ষা বিভাগ

৫. অধ্যাপক শ্রী বলাই চন্দ্র পাল -- সাংস্কৃতিক বিভাগ

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বহুসংখ্যক সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারি স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদের অবদান রাখার জন্য ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উত্তরাঞ্চল বেসামরিক প্রশাসনের সরকারি কর্মকর্তাদের নাম, পদবি ও কাজের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

১. ফয়েজউদ্দিন আহমেদ
[জেলা প্রশাসক দিনাজপুর] -- আঞ্চলিক প্রশাসক

২. শামসুজ্জামান ইঞ্জিনিয়ার -- সহকারী আঞ্চলিক প্রশাসক

৩. জহুরুল আলম ইঞ্জিনিয়ার -- সহকারী আঞ্চলিক প্রশাসক

৪. হাবিবুর রহমান -- নিরাপত্তা কর্মকর্তা

৫. ডাঃ আব্দুল মজিদ [এম.বি.বি.এস] -- স্বাস্থ্য কর্মকর্তা

উপ-আঞ্চলিক প্রশাসকদের নাম

১. জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ -- পাটগ্রাম থেকে গীতালদহ
[থানা ম্যাজিস্ট্রেট, ভুরুঙ্গামারী]

২. জনাব আব্দুল হালিম -- গীতালদহ থেকে সাহেবগঞ্জ,
[দ্বিতীয় অফিসার, কুড়িগ্রাম] ঝাউকুটি, ফুলবাড়ি

৩. ডাঃ আব্দুল মজিদ [এম.বি.বি.এস] -- নাগেশ্বরী ও ভুরুঙ্গামারী থানার উত্তর-পশ্চিম এবং মুক্তাঞ্চল

৪. জনাব হেলালউদ্দিন [ম্যাজিস্ট্রেট] -- ভুরুঙ্গামারী ও নাগেশ্বরী থানার পূর্বাঞ্চল এবং মুক্ত এলাকা

৫. জনাব আব্দুল লতিফ [ম্যাজিস্ট্রেট] -- রৌমারী থানা

ব্রহ্মপুত্র নদীর পূর্ব পাড়ে আসামের মানকেরচর সংলগ্ন রৌমারী থানা। এই থানা সবসময় মুক্তাঞ্চল ছিল। পাক দস্যু বাহিনী এই থানা কখনোই দখল করতে পারেনি।

ষোলো

ছাত্রলীগের উচ্চপর্যায় থেকে খবর পেলাম, জরুরী আলোচনার জন্য আমাকে ৮ জুন সকালে দিনহাটা উপস্থিত থাকতে হবে। দিনহাটা সময়মত পৌঁছে আব্দুল কুদ্দুস নান্নু ভাইকে পেলাম। নান্নু ভাইকেও আলোচনায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করলাম। দিনহাটা

শহীদ কর্নারস্থ কমল গুহের ফরোয়ার্ড ব্লক অফিসে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল শাখা ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম ও রংপুর জেলা ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি আবুল মনসুর সকাল এগারোটায় এসে পৌছলেন। আলোচনার জন্য আমরা হোটেল আঙ্গুরে বসলাম। সর্ব-জনাব শেখ ফজলুল হক মণি, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ ও সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে তখন ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ কর্মীদের অংশগ্রহণে স্বাধীনতা যুদ্ধ সফলভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স [বি.এল.এফ] গঠন করা হয়েছে। এই সংগঠনে ছাত্রলীগের সর্বপর্যায়ের নেতৃবৃন্দ রয়েছেন। বি.এল.এফ বাহিনী গঠনের সপক্ষে এই যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যেহেতু জেল ভেঙে বের হয়ে আসা দুষ্কৃতকারীসহ ভালমন্দ সব শ্রেণীর মানুষ, কেউ দেশকে ভালবেসে, কেউ জীবনের ভয় ও নিরাপত্তার কারণে, কেউবা সুবিধাবাদী পথে নিজের স্বার্থ হাসিলের আশায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, সেইহেতু মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পরিবেশে ভাল ও মন্দ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দেবে। সেহেতু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বাঙালির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তিসহ সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য দেশপ্রেমিক আদর্শবান ছাত্র-যুবকদের নিয়েই "বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স" (বি.এল.এফ) গঠন করা হয়েছে। তা'ছাড়া ১৯৬২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে উদ্দেশ্যে "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ" গঠন করেছিলেন, সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও সফল করার জন্য এই সংগঠন করা একান্ত আবশ্যক। বাংলাদেশকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। উল্লিখিত চার নেতা চার অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রধান। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা, যথা রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহী নিয়ে উত্তরাঞ্চল গঠন করা হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের আঞ্চলিক প্রধান জনাব সিরাজুল আলম খান ও উপ-আঞ্চলিক প্রধান জনাব মনিরুল ইসলাম মণি। তিনি মার্শাল মণি নামে খ্যাত। বি.এল.এফ সদস্যদের উন্নত ধরনের অস্ত্রসহ বিশেষ গেরিলা প্রশিক্ষণ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারণা দেয়া হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ শিবির দু'টির একটি ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত--এই উপমহাদেশের বৃহৎ মিলিটারি একাডেমি দেরাদুন এবং অন্যটি আসামের হাপলং। বিশ্বের অন্যতম গেরিলা কমান্ডো-বিশেষজ্ঞ ভারতের জেনারেল উবান-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির পাঙ্গায় উত্তরাঞ্চল বি.এল.এফ হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয়েছে।

কুড়িগ্রাম মহকুমার আটটি থানা, যথা ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ি, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, উলিপুর, চিলমারী ও রৌমারী থানা অর্থাৎ কুড়িগ্রাম মহকুমা বি.এল.এফ কমান্ডারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে। অতিসত্বর অর্থাৎ ২/১ দিনের মধ্যে পাঙ্গা হেড কোয়ার্টারে সিরাজুল আলম খানের সাথে আমাকে সাক্ষাৎ করতে হবে। নূরুল ইসলাম, আবুল মনসুর ও নান্নু ভাই চলে গেল। আমি আমার ক্যাম্পে ফিরলাম।

দু'দিন পর পাঙ্গা হেড কোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে মাথাভাঙ্গা রওয়ানা হলাম। মাথাভাঙ্গা কুচবিহার জেলার মহকুমা শহর। এখানে রংপুর শহরের ছাত্রলীগ কর্মী ও নেতৃবৃন্দ একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। মাথাভাঙ্গার কংগ্রেস নেতা মানুদা তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বি.এল.এফ-এর একটি শাখা ঘাঁটি হিসেবে এই বাড়ি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে মোখতার এলাহী, নূরুল ইসলাম, অলক, আব্দুস সালাম, রফিকুল ইসলাম অবস্থান করে। কুচবিহার থেকে বাসে করে মাথাভাঙ্গা ঘাটে এসে ইঞ্জিনচালিত নৌকোয় মানসাই নদী পার হলাম। এই নদী বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ধরলা নদী নামে পরিচিত। মাথাভাঙ্গা ঘাঁটিতে এসে মোখতার এলাহী, নূরুল ইসলাম ও অন্যদের পেলাম। পাশাপাশি তিনটি টিনের ঘর। মাটি থেকে ৪/৫ ফুট উঁচুতে কাঠের তক্তা বিছিয়ে ঘরের মেঝে তৈরি করা হয়েছে। ঘরের মেঝেয় কেউ বসে, কেউবা শুয়ে রয়েছে। এখানে তাড়াতাড়ি ডাল-ভাত খেয়ে নূরুল ইসলামসহ জলপাইগুড়ি যাওয়ার বাসে চাপলাম। সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি শহরে নেমে পাঙ্গা হেড কোয়ার্টারে পৌঁছলাম। গেটসহ শিবিরের চারদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত। জলপাইগুড়ি জেলা শহরের ৪/৫ মাইল উত্তরে পাহাড়ী ঝর্নার পাশে হালকা জঙ্গল-ঘেরা এই পাঙ্গা নামের স্থান। ছোট-বড় অনেকগুলো তাঁবুতে সবার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গেটের ভেতরে প্রবেশ করে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে শ্রমিক লীগের মান্নান ভাইকে পেলাম। তাঁবুতে অনেক রাত পর্যন্ত সিরাজুল আলম খানের সাথে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হলো। উত্তরাঞ্চল বি.এল.এফ-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর বালা রেড্ডি। আমার এলাকা অর্থাৎ কুড়িগ্রাম মহকুমার তত্ত্বাবধানে রয়েছেন দিনহাটায় নিয়োজিত ভারতীয় এস.এস.বি ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী। সিরাজুল আলম খানের কাছ থেকে বিস্তারিত কর্মসূচী ও পরিকল্পনা অবগত হয়ে ফিরে এলাম।

দিনহাটা ফরোয়ার্ড ব্লক অফিস সংলগ্ন শিবিরটিকে কুড়িগ্রাম মহকুমা বি.এল.এফ ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করার মনস্থ করলাম। কমল গুহ এতে আনন্দের সাথে সম্মতি প্রদান করলেন। দিনহাটা শহরে অবস্থিত এস.এস.বি ক্যাম্প থেকে ওয়্যারলেস, টেলিফোন, গাড়িসহ অন্যান্য যাবতীয় সুবিধা পেলাম। ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী একটি বাংলোতে থাকতেন। প্রয়োজনে তাঁর বাংলোতে যাওয়ার অবাধ সুযোগ আমাকে দেয়া হলো।

আসামের ধুবরী থেকে কুচবিহারের চৌধুরীহাট সীমান্তের যুব শিবিরসহ অন্যান্য শিবির থেকে কুড়িগ্রাম মহকুমার আটটি থানার প্রায় ষাটজন ছাত্রলীগ সদস্যকে সংগ্রহ করে প্রশিক্ষণের জন্য পাঙ্গা হেড কোয়ার্টারে প্রেরণ করলাম। আমাদের এফ.এফ-দের মধ্য থেকেও কয়েকজনকে বি.এল.এফ ট্রেনিং গ্রহণের জন্য প্রেরণ করলাম। আমাদের এই অঞ্চলে আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় এফ.এফ এবং বি.এল.এফ-এর মধ্যে কোনরকম বিভেদ না রেখে সহ-অবস্থানের নীতিতে প্রতিজ্ঞ হয়ে এক সাথে যুদ্ধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করলাম। তবে ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ, ক্যাপ্টেন দেলোয়ার ও ই.পি.আর সদস্যদের অলক্ষ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। তাদেরকে বি.এল.এফ সম্পর্কে জানতে দেয়া হলো না।

আমি ধুব্রী হয়ে সোনাহাটের মুক্ত এলাকায় গেলাম। সেখানে বি.এস.এফ ক্যাপ্টেন যাদব, ই.পি.আর সুবেদার বোরহান ও অন্যদের সাথে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় সরবরাহ এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হলো। মুক্ত এলাকা অর্থাৎ আমার গ্রামের বাড়ি চরবলদিয়ায় আব্বা-আম্মার সংবাদ নিয়ে আসার জন্য মুক্তিযোদ্ধা গেদা ও রহমানকে প্রেরণ করলাম। কিন্তু রহমান ও গেদা ফিরে আসার আগেই শিলিগুড়ি ও দিনহাটা থেকে ওয়্যারলেসে জরুরী সংবাদ আসায় আমাকে চলে আসতে হলো।

পাকহানাদার বাহিনী ধরলা, উত্তর নাগেশ্বরী ও ভুরুঙ্গামারী দখল করার কারণে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের একত্র করে জুন মাসের মধ্যেই সফলভাবে আগে উল্লিখিত বিভিন্ন অবস্থানে আমরা সুসংগঠিত হলাম। কোম্পানি কমান্ডার ই.পি.আর সদস্য যথাক্রমে রবিউল, আবদুল কুদ্দুস নান্নু, আব্দুল কাদের, শামসুল আলম, হাসেম আলী প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধা সোনাহাট মুক্ত অঞ্চলে অবস্থান গ্রহণ করলো। ফুলবাড়িতে কোম্পানী কমান্ডারবৃন্দ যথাক্রমে আব্দুল হক, সিরাজুল ইসলাম, বদরুদ্দোজা ও আব্দুস সামাদ এবং গীতালদহে আকরাম হোসেন, কাজী জাকির হাসান চন্দন, শামসুল কিবরিয়া, শহীদুল্লাহ, কামরুল হাসান, লুৎফর রহমান বুড়িমারীতে শামসুল আলম পাঠান, সানোয়ার হোসেন, আকবর আলী ; হিমকুমারীতে [নীলফামারী সীমান্ত] রওশনউল বারী, জি.এম. রাজ্জাক, হারেস আলী সরকার, মাহবুব খান, আলমগীর, আশরাফ হোসেন, অপিল উদ্দিন, মোশাররফ হোসেন, শহিদুল ইসলাম মঞ্জু, রিয়াজউদ্দিন ঠাকুরগাঁও সীমান্তে শাহজাহান, খলিলুর রহমান, আকবর আলী, চান মিঞা, আব্দুস সাত্তার প্রমুখ কোম্পানি কমান্ডার ও মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ গ্রহণশেষে অবস্থান নেয়। জহির, জয়নাল, আবু বকর, আনসার আলীসহ বিপুলসংখ্যক সদ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা সাহেবগঞ্জে আমাদের সাথে মিলিত হলো। জুলাই মাসের প্রথম থেকে আমরা এই এলাকার বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকদস্যুবাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্য আঘাত হেনে চললাম। ভুরুঙ্গামারী থানার পূর্ব-পশ্চিম অর্থাৎ সমগ্র থানা এলাকা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলো।

সি. আর. চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশেষ গেরিলা বাহিনীর সদস্যরা চর ভুরুঙ্গামারীর মুক্ত এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। তারা এই মুক্ত এলাকায় ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করলো। পাকবাহিনীর ভয়ে ভুরুঙ্গামারী এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কাপড় ও অন্যান্য ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষ এই এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। সি.আর. চৌধুরী ও তার দলবল এইসব ব্যবসায়ী ও অবস্থাপন্নসহ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কাপড়, টাকা-পয়সা লুট করতে থাকে। অত্যাচার-রাহাজানি করে মানুষের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করে চলে।

চর ভুরুঙ্গামারী এলাকায় আওয়ামী লীগ নেতা নূর মোহাম্মদ বেপারী ও তার পিতা ফয়েজউদ্দিন বেপারী এই সব অন্যায় থেকে তাদেরকে বিরত থাকতে বললে সি.আর চৌধুরী তার দলবল নিয়ে দুই পিতা-পুত্রকে এক সাথে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা

করে এবং ৫/৬টি টিনের ঘরসহ তাদের বাড়ি আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। এই সংবাদ পাওয়ার পর আমি সোনাহাট এলাম। শামছুল হক চৌধুরী কয়েকদিন আগ থেকেই সোনাহাট অবস্থান করছিলেন। বি.এস.এফ কর্নেল আর. দাস ও ক্যাপ্টেন যাদব তাদের লুটপাট ও অত্যাচারের কথা জানতে পেরেছিলেন। সুবেদার বোরহানসহ আমরা চর ভুরুঙ্গামারী গিয়ে সি. আর. চৌধুরী ও তার দলকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করলাম। তাদেরকে সোনাহাট বি.এস.এফ ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হলো, সাথে বিপুল পরিমাণ কাপড়, কিছু স্বর্ণালঙ্কার ও টাকা। সি.আর. চৌধুরীর দলের সবার জবানবন্দি নেয়া হলো। কুড়িগ্রামের সাহাব, আমানুর, সাজু, মালেক প্রমুখের জীবন বাঁচানোর জন্য আমি প্রচেষ্টা নিলাম। সবদিক বিশ্লেষণ করা হলো। দেখা গেল, সি.আর. চৌধুরী এবং রংপুর থেকে আগত সেনাবাহিনীর সদস্য বলে পরিচয়দানকারী বাবর ও রউফ সবচাইতে বেশি দোষী। সি. আর. চৌধুরীর কোন ঠিকানা ও পরিচয় পাওয়া গেল না। সে এর আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাবেক কমান্ডো বলে পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু সে কখনও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য ছিল না। পাটেশ্বরী ধরলা পাড়ে প্রতিরক্ষা অবস্থানে থাকাকালে সি. আর. চৌধুরী যখনই রাতে অভিযানের নামে ধরলা নদী পার হয়েছে, তখনই পাকবাহিনীর আক্রমণ বেড়েছে। তা'ছাড়া প্রায়শই পাকবাহিনী আমাদের অবস্থানের ওপর নির্ভুলভাবে গুলিবর্ষণ করেছে। আমাদের অনেক অবস্থানই পাকবাহিনীর কোনক্রমেই অবগত হওয়ার সুযোগ ছিল না। কিন্তু সে সব অবস্থানেও নির্ভুলভাবে গুলিবর্ষিত হয়েছে। অবশেষে সাক্ষ্য প্রমাণের ভেতর দিয়ে সি. আর. চৌধুরী, বাবর ও রউফ পাকবাহিনীর চর হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় তাদের তিনজনকে হত্যা করা হলো। সাজু, সাহাব, আমানুর, মোকসেদ, মালেক, রংপুরের টিপু ও জবাদের ধুবরী জেলে প্রেরণ করা হলো। জেলে পাঠিয়ে কৌশলে এদেরকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা হলো। শামছুল হক চৌধুরীর প্রচেষ্টায় তারা প্রাণে বেঁচে গেল। বি.এস.এফ কর্তৃপক্ষ এবং সুবেদার বোরহান সবাইকে হত্যার পক্ষপাতী ছিল। তিন মাস পর এদের সবাইকে জেল থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়। এদের জেল থেকে মুক্ত করার জন্য মঞ্জু মন্ডল যথেষ্ট পরিশ্রম করে।

সতেরো

যুদ্ধ জোরদার, ব্যাপক বিস্তৃত এবং নরপশু পাকবাহিনীকে বিতাড়িত করে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য হানাদার বাহিনীর দখল করা এলাকাগুলোয় আমাদের জন্য শেল্টার আর ছোট ছোট ঘাঁটি স্থাপনের সক্রিয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করলাম। ধরলা নদীর উত্তর দিকে কুড়িগ্রামের ভেতরবন্দ, যাত্রাপুর, ফুলবাড়ি দিয়ে ধরলা নদীর অপর পাড় ছিনাই নূরুল ইসলামের বাড়ি, পাইকপাড়ার আবুল বসুনিয়ার বাড়ি, চৌকাল ঘাট, জয়কুমার গ্রামের যতীন্দ্র মোহন চক্রবর্তীর বাড়ি, শিঙ্গিমারী, টগরাইহাট, কাঁঠালবাড়ি, বড়বাড়ি, পাঙ্গা গ্রাম, দুর্গাপুর, উলিপুর থানার নজিম খাঁ, দলদলিয়া, নতুন মন্ডলের হাট, থেত্রাই,

রাজারহাট, তিস্তা, কুড়িগ্রাম শহরের পাশে হরিকেশ, নেফার দরগা, মোগল বাছা, লালমনিরহাটের মহেন্দ্র নগর, কুলাঘাট, মোগলহাট ইত্যাদি স্থানে বহু বিপদ উপেক্ষা ও প্রাণান্ত পরিশ্রম করে আমাদের শেল্‌টার এবং ছোট আকারের ঘাঁটি স্থাপন করতে সক্ষম হলাম। এফ.এফ ও বি.এল.এফ সদস্যদের কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, উলিপুর, চিলমারী এবং উল্লিখিত ঘাঁটিসমূহে পৌছানোর জন্য ফুলবাড়ি, বালাহাট ; নাগেশ্বরী থানার জন্য চৌধুরীহাট, রামখানা, পাগলা, ভুরুঙ্গামারী থানার জন্য নাজিরহাট এবং মইদাম, বাঁশজানি, পাগলাহাট, ধামেরহাটের রুট ব্যবহার নিশ্চিত করলাম। ফুলবাড়ি মুক্ত এলাকায় কয়েকটি ছোট ঘাঁটি স্থাপন করা হলো। ধরলা নদী অপর পারের ঘাঁটিসমূহের সীমান্ত থেকে দূরত্ব অন্তত ২৫/৩০ মাইলের, সে কারণে ফুলবাড়ির ঘাঁটিসমূহে অবস্থান গ্রহণ করে ঐ সব ঘাঁটিতে যাওয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করতে হতো। ফুলবাড়ির এইসব ঘাঁটি হলো, ভারতের গীতালদহ সীমান্ত অতিক্রম করে করলা, ফুলমতি গ্রামের আমজাদ মিঞার বাড়ি, বালাহাটের জয়নাল মাস্টার সাহেবের বাড়ি এবং ধরলা নদীর পাশে কবির মামুদ গ্রামের আমজাদ মিঞার বাড়ি।

এই সব শেল্‌টার ও ঘাঁটি স্থাপনের জন্য ফুলবাড়ি থেকে ধরলা নদীর অপর পারে হানাদার বাহিনীর দখলকৃত এলাকায় অনেকবার আমাকে প্রবেশ করতে হয়েছে। এর মধ্যে একবার গীতালদহ সীমান্তে এসে আমাকে গাড়ি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। আমার সাথে ছিলেন কাউনিয়া থানা বি.এল.এফ কমান্ডার আব্দুল কুদ্দুস। গীতালদহ থেকে ফুলবাড়ি হেঁটে যেতে হবে। গীতালদহ থেকে প্রায় আট মাইল কাঁচা পথে হেঁটে বালাহাট পৌছলাম। এখানে জয়নাল মাস্টার সাহেবের বাড়িতে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে বালাহাট বাজারে এসে আমাদের লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ করে হেঁটে ফুলবাড়ি রওয়ানা হলাম। বিকেল তিনটায় আমাদের ঘাঁটিতে এসে কোম্পানি কমান্ডার সিরাজ, আব্দুল হক, সামাদদের সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলে ধরলা ঘাটের দিকে অগ্রসর হলাম। কোম্পানি কমান্ডার সিরাজ ও অন্য কয়েকজন নদীর ঘাট পর্যন্ত আমাকে পৌছে দিয়ে গেল। আগে থেকেই নৌকা তৈরি ছিল।

সন্ধ্যার পর নৌকায় ওঠার জন্য নদীর ঘাটে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। আরো চারজনকে অস্ত্রসহ সাথে নিলাম। নৌকা মাঝ–নদীতে আসার পর দক্ষিণ–পূর্ব কোণ থেকে [illegible]লো প্রচন্ড গোলাগুলি। হঠাৎ করে জোরে বাতাস উঠলো। আমাদের ছোট নৌকা [illegible]য়ের ভেতরে হেলেদুলে কোনমতে রাতের অন্ধকারে নদীর দক্ষিণ পার চৌকাল ঘাটে নেমে সিনাই নূরুল ইসলামের বাড়ি হয়ে পাইকপাড়ার আবুল বসুনিয়ার বাড়ির উদ্দেশ্যে চলতে থাকলাম। মানুষ চলাচল না করাতে সরু কাঁচা পথ জঙ্গলে ভরে গেছে। পথের ওপর গাছ–গাছালির অধিকাংশই চুত্‌রা পাতার গাছ। কোন শব্দ না করে সাবধানে পথ চলছি চুত্‌রা পাতার স্পর্শে নাক–মুখ–হাত–পা জ্বলে যেতে লাগলো। তার ওপর বিষধর সাপের অবাধ আনাগোনা। একটি ছোট খড়ের ঘরের পাশে এসে থেমে গেলাম। বাড়ির ভেতর থেকে খুব আস্তে 'সালাম সালাম হাজার সালাম' গান ভেসে আসছে। ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতেই দেখা গেল, স্ত্রী–পুরুষসহ প্রায় ১০/১৫ জন মানুষ

একটি রেডিওকে ঘিরে গোল হয়ে বসে তন্ময় হয়ে গান শুনছে। এক অপূর্ব অনুভূতিতে আমার অজান্তে চোখ দিয়ে পানি ঝরে পড়লো। আমরা আরো হাজারো গুণ বেশি সাহস ও প্রেরণা অনুভব করলাম। কুদ্দুস আমার হাত ধরে রয়েছে। অন্ধকারে সাথীদের দিকে তাকিয়ে চলতে শুরু করলাম। খেতের আল, বাঁশের ঝোপ, সুপারির বাগান আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, আবার কখনও পায়ে হাঁটা পথ ধরে রাত এগারোটায় পাইকপাড়া আবুল বসুনিয়ার বাড়িতে এসে পৌছলাম। আবুল বসুনিয়া বাড়িতেই ছিলেন। চুপি চুপি তাঁর ঘরে ঢুকলাম। তাঁর সাথে প্রয়োজনীয় কথা হলো। আবুল হোসেন বসুনিয়ার ছোট ভাই নজরুল ইসলাম বসুনিয়া স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য প্রতিদিন লালমনিরহাট যাতায়াত করেন। তাঁকে ডেকে পাকবাহিনী সম্পর্কে তথ্যাদি অবগত হলাম। রাত দুটায় সেখান থেকে প্রায় এক মাইল উত্তরে এসে বাঁশের ঝোপ, সুপারি গাছ ও জঙ্গলে ঘেরা প্রায় জনশূন্য এক বাড়িতে ঢুকলাম। বাড়িতে কোন লোকজন নেই, শুধু উত্তরের কোণায় এক ঘরে সামান্য আলো জ্বলছে। বোঝা গেল, বাড়িটি একটি হিন্দু বাড়ি। আশ্বস্ত হয়ে লোকটিকে ডাকা হলো। বৃদ্ধ লোকটি বেশ যত্ন করে আমাদের শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। রাতে শুধু মুড়ি ও পানি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। দু'জন পাহারায় থাকলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখা গেল, বেগুন ভর্তা, ডাল ও ভাত রান্না করা হয়েছে। সবাই এক সাথে বসে যথেষ্ট তৃপ্তি নিয়ে খেলাম। সারাদিন ধরে গোপনে পার্শ্ববর্তী এলাকার খবর সংগ্রহ করা হলো। রাতের অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে নজিম খাঁর উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করলাম। কাঁঠালবাড়ির এক মাইল পশ্চিম বরাবর লালমনিরহাট–কুড়িগ্রাম সড়ক পার হব, এমন সময় পশ্চিম ও পূর্বদিক থেকে মোটর গাড়ির হেড লাইটের আলো দেখা গেল। রাস্তার উত্তর পাশে বাঁশের জঙ্গলে লুকিয়ে পূর্ব–পশ্চিম এবং দক্ষিণ--এই তিনদিকে অবস্থান গ্রহণ করলাম। ভেবেছিলাম পাকবাহিনী হয়তো আমাদের খবর পেয়ে গেছে। যদি সত্যিই পাকবাহিনী আমাদের আগমনের খবর পেয়ে থাকে, তবে ধরা পড়তেই হবে, বাঁচার কোন উপায় নেই। ভরসা একমাত্র আল্লাহ। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, যদি পাকবাহিনী আমাদেরকে এই জঙ্গলে ধরতে আসে, তা'হলে আমরা যুদ্ধ করে মরবো। কোনক্রমেই ধরা দেব না। এই সঙ্কট ও উত্তেজনাকর মুহূর্তে খুবই শান্ত–চিত্তে নিঃশব্দে, যেন নিঃশ্বাসের শব্দ নেই, এমনিভাবে জঙ্গলের ভেতর তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে অস্ত্র হাতে শুয়ে রয়েছি। কিন্তু না, পাকবাহিনীর গাড়ি এখানে থামলো না। দ্রুত গতিতে চলে গেল। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রাস্তা পার হয়ে যতদূর সম্ভব দ্রুত চলার চেষ্টা করছি। টগরাইহাটের পশ্চিম দিয়ে রেললাইন অতিক্রম করার জন্য এগিয়ে চলেছি। টগরাইহাটের পশ্চিমে আহম্মদ মোক্তার সাহেবের বাড়ির কাছে পৌছলাম। এখান থেকে আধ মাইল দূরে রেললাইনের পাশে পাকবাহিনীর ক্যাম্পের আলো দেখা যাচ্ছিল। খালের মধ্য দিয়ে রেললাইনের পাশে এসে থামলাম, এদিক–ওদিক দেখে এক এক করে সবাই রেললাইন অতিক্রম করলাম। অন্ধকারে পথ চলতে কতবার যে আমরা হোঁচট খেয়ে পড়েছি, তার হিসেব নেই। সিন্দুর মতি হয়ে রাজারহাটের পুব দিয়ে শেষ রাতে নজিম খাঁ এসে পৌছলাম। এই এলাকাগুলো আমার সুপরিচিত। এখানে পরিচিত লোকজন আমাদের পেয়ে খুবই উৎসাহ বোধ করলো।

তারা সব ধরনের সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে জানালো। এখানে দু'দিন অবস্থান করে দলদলি, থেত্রাইসহ আগে উল্লিখিত বিভিন্ন জায়গায় কাজ সেরে রাতের অন্ধকারে বড়বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। রাজারহাট-শিঙ্গের ডাবরির মধ্য দিয়ে রেললাইন পার হয়ে বড়বাড়ি হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক কাশেম বি.এসসি সাহেবের বাড়িতে এসে উঠলাম। এখানে রাত কাটিয়ে পরের দিন শেষে রাতে একইভাবে সিনাই এসে একদিন অবস্থান করে কাজের অগ্রগতিতে সন্তুষ্টচিত্তে "ফাঁন্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে" গানের নদী ধরলা অতিক্রম করে ফিরে এলাম।

আঠারো

ভুরুঙ্গামারী, সোনাহাট, পাটেশ্বরী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম, উলিপুর, চিলমারী, বড়বাড়ি, মোগলহাট, লালমনিরহাট, পাটগ্রাম, বুড়িমারী, হাতীবান্দা, জলঢাকা, ডোমার, ডিমলা, দেওয়ানগঞ্জ, হিমকুমারী, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, খানসামা ইত্যাদি রণাঙ্গনে জুন মাসের শেষে এবং জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে হানাদার পাকবাহিনীর ওপর আমাদের আক্রমণ জোরদার করা হলো।

২ জুলাই রাতে একদল মুক্তিযোদ্ধা গীতালদহ ঘাঁটি থেকে মোগলহাট পুলের কাছ দিয়ে ধরলা নদী অতিক্রম করে পাকবাহিনীর অবস্থান মোগলহাটের পাশের দু'দিকের জঙ্গলের মধ্যে এ্যাম্বুস পেতে হানাদার বাহিনীর আগমনের অপেক্ষা করতে থাকে। ভোরে পাকবাহিনী এই রাস্তায় বের হওয়ার সাথে সাথে আক্রমণ ও গুলিবর্ষণ শুরু হলে প্রায় সাত-আটজন পাকসেনা নিহত হয়। স্বল্প সময়ের এই আক্রমণ অভিযানশেষে তড়িঘড়ি ফেরার পথে গোলক মন্ডলের নিকটবর্তী জঙ্গলের শেষপ্রান্তে পাকবাহিনীর পুঁতে রাখা এ্যান্টি পার্সোনাল মাইন বিস্ফোরিত হয়ে কাজী জাকির হাসান চন্দনের ডান পা উড়ে যায় এবং মারাত্মকভাবে আহত হয়। সাথী মুক্তিযোদ্ধারা জাকিরকে কাঁধে নিয়ে নদীর পাড়ে এসে নৌকাযোগে গীতালদহ আসার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর জীপে দ্রুত তাকে কুচবিহার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময় আমি সোনাহাট ঘাঁটিতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু জাকিরের আহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কুচবিহার হাসপাতালে ছুটে গেলাম। জাকির যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল আর আঘাতপ্রাপ্ত ডান পায়ে বার বার হাত রাখছিল। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলাম। সান্ত্বনা দেয়া ছাড়া আর কিই-বা করার ছিল! ওর কাছ থেকে চলে আসার সময় পেছনে ফিরে দেখলাম, জাকির মাথা কাত করে গমন পথের দিকে ছল ছল চোখে তাকিয়ে আছে। হয়তো ভাবছে, আমার সাথে এই তার শেষ দেখা। আমি ভাবছিলাম, জাকিরের মত অবস্থা আমারো হতে পারে, অথবা পাক-বর্বর বাহিনীর গুলির আঘাতে আমার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, রক্তাক্ত অবস্থায় পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে যাব। আমাদের যুদ্ধের প্রকৃতি ছিল পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে না গিয়ে আচমকা আক্রমণ ও আঘাত হেনে দ্রুত ফিরে

আসা। এভাবে আঘাতের পর আঘাত হেনে হানাদার বাহিনীকে দুর্বল এবং নিশ্চিহ্ন করে প্রাণের স্বদেশভূমিকে শত্রুমুক্ত করা, বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

৪ জুলাই দুপুরে গীতালদহ থেকে পঞ্চাশজন মুক্তিযোদ্ধা ধরলা নদী অতিক্রম করে বিকেল পাঁচটায় তিনদিক থেকে মোগলহাট পাকবাহিনীর অবস্থান আক্রমণ করে বসে। মুক্তিযোদ্ধাদের আচমকা আক্রমণে পাকবাহিনী মোগলহাট ছেড়ে পালিয়ে যায়। এখানে শত্রু বাহিনীর ১০/১২ জন সদস্য নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা জয়োল্লাসে মোগলহাটে ঢুকে যখন বাদবাকি হানাদার সেনাকে খুঁজতে থাকে, তখুনি পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালায়। পাকবাহিনীর গুলিতে নীলফামারীর আব্দুর রশিদ ও আবু বকর শহীদ এবং মাইনের আঘাতে শামসুল কিবরিয়া গুরুতর আহত হয়। আহত শামসুল কিবরিয়া ও শহীদ সাথীদের মরদেহ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা গীতালদহে ফিরে আসে। শামসুলকে কুচবিহার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং প্রাণপ্রিয় দুই শহীদ সাথীকে মোগলহাট পুলের কাছে সমাহিত করে চির বিদায় জানানো হলো। ১১ জুলাই কুচবিহার হাসপাতালে মারাত্মকভাবে আহত শামসুল কিবরিয়াকে দেখতে গেলাম। কিন্তু সকাল ন'টায় হাসপাতালে পৌছে এই বীর সন্তানকে কাফনের সাদা কাপড়ে আবৃত দেখতে হলো। ৪ জুলাই থেকে ১০ জুলাই রাত পর্যন্ত মৃত্যুর সাথে লড়াই করে বাংলা মায়ের এই দামাল ছেলে স্বাধীন মুক্ত স্বদেশ দেখার আগেই চলে গেল। হাসপাতাল থেকে কুচবিহারস্থ যুব শিবির ও বাংলাদেশ অফিসে খবর পাঠানো হলো। আমাদের লোকজনসহ কুচবিহারের সর্বস্তরের মানুষের দীর্ঘ মিছিল নিয়ে আমাদের প্রাণের সাথীকে কুচবিহার শহর সন্নিকটের কবরস্থানে বীরের মর্যাদায় সমাহিত করে চির বিদায় জানালাম। শামসুল কিবরিয়া ছিল নীলফামারী কলেজের দ্বিতীয় বর্ষ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। তার পিতার নাম শামসুল হুদা [পোস্ট মাস্টার, গ্রাম খোগাখরি বাড়ি, থানা ডিমলা]।

এরপর মুক্ত এলাকা পাটগ্রাম দখল করার জন্য পাকবাহিনী হাতীবান্দা থেকে বুড়িমারী আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের ওপর প্রচন্ড আঘাত হানে। ই.পি.আর মোহন মিয়া ও অন্যান্য ই.পি.আর সদস্যসহ মুক্তিযোদ্ধারা সফলভাবে এই আক্রমণ প্রতিহত করে। এই লড়াইয়ে ই.পি.আর সদস্য আনোয়ার বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে শহীদ হলো। পাকবাহিনীর গুলিবর্ষণ তীব্রতর হলে আনোয়ার এল.এম.জি নিয়ে ক্রলিং করে শত্রুর অবস্থানের প্রায় কাছে গিয়ে মুখোমুখি ব্রাস ফায়ার করতে থাকলে ১৫/২০ জন শত্রু-সেনা নিহত হয়। ঠিক এই অবস্থায় শত্রু বাহিনীর এক ঝাঁক গুলি বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারের দেহ ঝাঁঝরা করে দেয়। বাংলার আর একজন বীর সন্তানের দেহ মাতৃভূমি বাংলার মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তবে অকুতোভয় অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধার পাল্টা আক্রমণে শত্রু বাহিনী পিছু হটে হাতীবান্দায় চলে যায়। শহীদ আনোয়ার হোসেনকে পাটগ্রাম মুক্ত এলাকায় পূর্ণ মর্যাদায় সমাহিত করা হলো। এই দেশপ্রেমিক বীর সন্তানের কবর স্পর্শ করে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা শপথ নেয়। সাহস, শক্তি ও প্রতিশোধের তীব্র জ্বালা নিয়ে হানাদার বাহিনীর নিধনযজ্ঞে মেতে ওঠে। শহীদ আনোয়ার হোসেন ছিল সাবেক

ই.পি.আর সদস্য। তার ঠিকানা, গ্রাম ও পো গোপীনাথপুর, থানা কসবা, জেলা কুমিল্লা।

ভুরুঙ্গামারীতে হানাদার বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা হলো। পশ্চিমে সাহেবগঞ্জ থেকে ছোট্ট ফুলকুমার নদীর অপর পাড়ে এবং পূর্বে সোনাহাটের দুধকুমার নদী–তীরের অবস্থান থেকে নদী অতিক্রম করে পাটেশ্বরীর পরিত্যক্ত রেল স্টেশন, জয়মনিরহাট, আন্ধারী ঝাড়, ভুরুঙ্গামারী কলেজ ও হাই স্কুলে শত্রু বাহিনীর অবস্থানে মুহুর্মুহু চোরাগুপ্তা আক্রমণ চালিয়ে তছনছ করে শত্রুদের দিশেহারা করা হলো। আর প্রায় প্রতিদিনই আমাদের আক্রমণের শিকার হয়ে নরপশু পাকিস্তানী সৈন্যদের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে লাগলো।

বর্বর নরপশু পাকিস্তানীরা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শহর ও গ্রাম থেকে যুবতী, কিশোরী এবং গৃহবধূদের ধরে এনে তখন তাদের সম্ভ্রম নষ্ট করছে। পিতামাতার সামনে মেয়ের, স্বামীর সামনে স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করছে, বাবা–মায়ের সামনে ছেলেকে হত্যা করছে নয়তো মেয়েকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলের সামনে পিতাকে হত্যা করে, পরে ছেলেকে হত্যা করছে। গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর, মহল্লার পর মহল্লা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। যুবকদের ওপরেই তাদের আক্রোশ বেশি। তাদের চোখ উপড়ে, পায়ের আঙুল তুলে, গরম পানিতে ডুবিয়ে, শরীরে আগুন লাগিয়ে, দিনের পর দিন খেতে না দিয়ে অতীতের চরম নির্মমতার সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে বাড়িয়ে চলেছে তাদের এহেন বর্বর তৎপরতা। এই নৃশংসতার হাত থেকে মধ্য বয়সী বৃদ্ধ–বৃদ্ধা পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না। আর এসবের পেছনে মদত যোগাচ্ছে সত্য, শান্তি ও ন্যায়ের ধর্ম ইসলামের তথাকথিত সমর্থক জ্ঞানপাপী নিকৃষ্টতম ঘৃণিত সব ব্যক্তি। সমগ্র বাংলাদেশের গ্রাম, শহর, বন্দর, নগর ইয়াহিয়া, টিক্কা খান, নিয়াজী আর রাও ফরমান আলী নামের পাক পিশাচদের বন্দীশালায় পরিণত হয়েছে।

এদিকে খবর নিয়ে জানা গেলো, পাকবাহিনী প্রায়শ সকাল ও দুপুরে বাগভান্ডার ই.পি.আর ফাঁড়ির পশ্চিমে ফুলকুমার নদীর পার এবং উত্তরে কাঁচা রাস্তা পর্যন্ত এসে ফিরে যায়। ১১ অথবা ১২ জুলাই আমরা মধ্য রাতে ই.পি.আর ফাঁড়ির দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরের জঙ্গলের মধ্যে তিনদিক থেকে এ্যাম্বুশ পেতে অপেক্ষা করতে থাকলাম। সকাল আটটার সময় পাকবাহিনীর ১৫/২০ জনের একটি দলকে পাকা রাস্তা ধরে হেঁটে পশ্চিম দিকে নিশ্চিন্তে এগিয়ে আসতে দেখতে পেলাম। আমরা এখন ওদেরকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। একজন পশ্চিম দিকে হাত নেড়ে কি যেন বলছে। ই.পি.আর ফাঁড়ির পশ্চিম পাশে আসার সাথে সাথে প্রথমে দক্ষিণ এবং সাথে সাথে উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে আমরা এল.এম.জি ও রাইফেলের গুলি শুরু করলাম। জঙ্গলবেষ্টিত খালের মধ্যে আমাদের অবস্থান সুবিধাজনক ছিল। দেখতে পেলাম, আমাদের গুলির মুখে শত্রু সেনারা খোলা পাকা রাস্তার ওপর যেন শুয়ে পড়লো। আহতরা পড়ে কাতরাচ্ছিল। ওদের আড়ালে যাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। প্রায় পাঁচ মিনিট গুলি বিনিময় হলো। অবশেষে আহত ও নিহতদের ফেলে দস্যুরা পালিয়ে চলে গেল। এখানে পাকবাহিনীর ছ'জন নিহত হলো।

আহত দু'জনকে ঘেরাও করে ধরে নিয়ে দ্রুত আমাদের অবস্থান ছেড়ে সাহেবগঞ্জ চলে এলাম। ধৃত দুই পাঞ্জাবি সেনাকে দেখার জন্য শত শত মানুষ ভিড় জমালো। আমরা এদেরকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভারতীয় বাহিনী ও বি.এস.এফ-এর সদস্যরা এসে এই দুই খান সেনাকে নিয়ে চলে গেল।

উনিশ

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুগত ও স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পদস্থ সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের নিয়ে ১১ জুলাই থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের বি.এস.এফ অফিসে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। মুক্তিযুদ্ধকালে এই বি.এস.এফ অফিস প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে ব্যবহার করতে দেয়া হতো। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ। সম্মেলনে উপস্থিত সামরিক কর্মকর্তাদের নাম নিচে দেয়া হলো

১. কর্নেল [অবঃ] আতাউল গনি ওসমানী
২. লেঃ কর্নেল এম.এ. রব
৩. গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার
৪. মেজর [অবঃ] নূরুজ্জামান
৫. মেজর কে.এম. সফিউল্যা
৬. মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত
৭. মেজর জিয়াউর রহমান
৮. মেজর খালেদ মোশাররফ
৯. মেজর মীর শওকত আলী
১০. উইং কমান্ডার এম. কে. বাশার
১১. মেজর ওসমান চৌধুরী
১২. মেজর রফিকউল ইসলাম
১৩. মেজর নাজমুল হুদা
১৪. মেজর এম.এ. জলিল
১৫. মেজর এ. আর. চৌধুরী

সম্মেলনে লেঃ কর্নেল এম. এ. রব বাংলাদেশ বাহিনীর চীফ অব স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার ডিপুটি চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত হলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হলো। নিয়মিত বাহিনী বা আর্মি ব্যাটালিয়ন; সেক্টর ট্রুপস এবং এফ.এফ বা অনিয়মিত বাহিনী।

১. নিয়মিত বাহিনী বা আর্মি ব্যাটালিয়ন ও সেক্টর ট্রুপস

বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন থেকে লোক সংগ্রহ করে বাংলাদেশ বাহিনী গঠন করা হয়। সেক্টরগুলো থেকে লোক সংগ্রহ করে নিয়মিত বাহিনীর লোকবল বৃদ্ধি করা হয়। এগুলোকে ব্রিগেড গ্রুপে ভাগ করা হয়। এসব কে ফোর্স, জেড-ফোর্স ও এস-ফোর্স নামে নামকরণ করা হয়। নিয়মিত বাহিনীর অধিকাংশই ছিলো ই.পি.আর-এর সদস্য।

সেক্টর ট্রুপস

ব্যাটালিয়নসমূহে যে সব ই.পি.আর সেনাবাহিনীর সদস্য, পুলিশ ও আনসারদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি, তাদেরকে স্ব স্ব সেক্টরে ইউনিট ও সাব-ইউনিটে ভাগ করা হয়। নিয়মিত আর্মি ব্যাটালিয়ন ও সেক্টর ট্রুপস সংক্ষেপে মুক্তি ফৌজ, এম.এফ ও মুক্তিবাহিনী নামে পরিচিত ছিল। এই দুই গ্রুপই হলো নিয়মিত বাহিনী।

২. এফ.এফ. বা অনিয়মিত বাহিনী

স্বল্প সময়ে গেরিলা পদ্ধতিতে যাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো, তারা এফ.এফ. বা ফ্রিডম ফাইটার নামে পরিচিত। এদের সবাই ছিল ছাত্র ও যুবক, সাধারণ মানুষ, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও অল্পসংখ্যক উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। তবে অধিকাংশই কৃষক সমাজ থেকে আগত। শিক্ষিত,স্বল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত--সবাই এফ.এফ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিল। মুক্তি ফৌজরাও এফ.এফ নামে সমধিক পরিচিত ছিল। এফ.এফ সদস্যরা ট্রেনিং গ্রহণশেষে সাব-সেক্টর, মুক্ত এলাকা বা পাকবাহিনীর দখলকৃত এলাকায় শেল্টার ও ছোট ঘাঁটি তৈরি করে অবস্থান গ্রহণ করতো। তাদেরকে অস্ত্র, গোলা-বারুদ, ওয়্যারলেস ও কাপড় ইত্যাদি ট্রেনিংশেষে দেয়া হতো। এ ছাড়া বিভিন্ন রসদ, প্রয়োজনে গোলা-বারুদ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য, সেক্টর, সাব-সেক্টর এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বি.এস.এফ-এর তরফ থেকে সরবরাহ করা হতো। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছোট ছোট ঘাঁটি করে অবস্থানকালে অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের আহারের সংস্থান নিজেদেরকেই করতে হতো। এ ছাড়া ঐ সব এলাকার স্বাধীনতা ও মুক্তিকামী সাধারণ মানুষও তাদের আহারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অনেক সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী সরাসরি ফ্রিডম ফাইটারদেরকে অস্ত্রসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ও রসদ সরবরাহ করতো। মে মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের দায়িত্ব বি.এস.এফ-এর কাছ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী গ্রহণ করে। ভারতীয় বেসরকারি এবং বিদেশী সেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সরাসরি কাপড়, খাবার, থালা-বাটি, মগ, মশারি ও কাপড় ইত্যাদির মত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করে যেতে থাকে। ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর মধ্যে 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি' অন্যতম।

যুদ্ধের তীব্রতা সাধন, সুষ্ঠু সমন্বয় এবং শৃঙ্খলার স্বার্থে উল্লিখিত সম্মেলনেই বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয়। রংপুর ও দিনাজপুর জেলা নিয়ে ছয় নম্বর

সেক্টর গঠিত, সেই সাথে মুক্ত এলাকা পাটগ্রামে সেক্টর হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হলো। ছয় নম্বর সেক্টরকে আবার পাঁচটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হলো।

সাব-সেক্টরসমূহ

	সাব-সেক্টরের নাম	এলাকাসমূহ
১.	ভুরুঙ্গামারী-৫ হেড কোয়ার্টার সাহেবগঞ্জ	ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ি, কুড়িগ্রাম ও উলিপুর থানা, তিস্তা ও বড়বাড়ি।
২.	লালমনিরহাট-৪ হেড কোয়ার্টার গীতালদহ	লালমনিরহাট ও কালিগঞ্জ থানা।
৩.	বুড়িমারী-৩ হেড কোয়ার্টার বুড়িমারী	পাটগ্রাম, বুড়িমারী ও হাতীবান্দা।
৪.	নীলফামারী-২ হেড কোয়ার্টার চিলাহাটি	নীলফামারী, ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ থানা।
৫.	ঠাকুরগাঁও-১ হেড কোয়ার্টার ব্রাহ্মণপাড়া	তেতুলিয়া, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ, দিনাজপুর, জগদলহাট, খানসামা, অমর খানা ও বেরুবাড়ি।

উইং কমান্ডার এম. কে. বাশার ৬ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত হলেন। নিচে সাব-সেক্টর কমান্ডারদের নামোল্লেখ করা হলো

১.	ঠাকুরগাঁও	স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দিন
২.	নীলফামারী	ক্যাপ্টেন নজরুল হক [ফ্লাঃ লেঃ] ইকবাল রশীদ
৩.	বুড়িমারী	ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান
৪.	লালমনিরহাট	ক্যাপ্টেন দেলোয়ার হোসেন
৫.	ভুরুঙ্গামারী	ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ আহমেদ

ক্যাপ্টেন দেলোয়ার হোসেন পাকিস্তানের বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে বহু কষ্টে কাবুলে পৌছেন। সেখান থেকে প্রথমে দিল্লী এবং পরে কোলকাতার বাংলাদেশ অফিসে আসেন। মুক্তিবাহিনী হেড কোয়ার্টার কোলকাতা থেকে সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে পাটগ্রাম সেক্টর হেড কোয়ার্টারে প্রেরণ করে। এখান থেকেই তিনি গীতালদহে আসেন।

সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসে মুক্তিবাহিনীর প্রথম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিশন্ড অফিসারবৃন্দ যথাক্রমে ২য় লেঃ সামাদ, মাসুদ, ফারুক, আব্দুল মতিন চৌধুরী ও আব্দুল্লাহ ৬ নম্বর

সেক্টরের বিভিন্ন সাব-সেক্টরে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সেক্টর হেড কোয়ার্টারে স্টাফ অফিসার নিয়োজিত হলেন ২য় লেঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী, ফারুক, শাহরিয়ার রশিদ খান ও সার্জেন্ট আব্দুল জলিল প্রমুখ।

৬ নম্বর সেক্টর এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ষষ্ঠ মাউনটেন ডিভিশনকে নিয়োগ করা হলো। ব্রিগেডিয়ার জসি ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন। সাহেবগঞ্জে মেজর জেমস, গীতালদহে ক্যাপ্টেন শম্ভু, সোনাহাটে বি.এস.এফ ক্যাপ্টেন যাদব, ক্যাপ্টেন জেমস ও কর্নেল আর. দাস, বুড়িমারীতে ক্যাপ্টেন মেহেদী, দেওয়ানগঞ্জে মেজর ছাতোয়াল সিং এবং ঠাকুরগাঁয়ে মেজর শর্মা ভারতীয় সেনাবাহিনীর এইসব অফিসার আমাদের সাহায্য করা ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য নিয়োজিত হলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩৩ কোরের অভিজ্ঞ অধিনায়ক লেঃ জেনারেল থাপ্পা উত্তরাঞ্চলীয় এলাকাসমূহে যুদ্ধ পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত হলেন।

বিশ

বি.এল.এফ-এর প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য সদস্য সংগ্রহের দায়িত্ব আমার ওপর বর্তালো। আমি বিরাট এলাকা কুড়িগ্রাম মহকুমার পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলা, আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ধুবৃরীসহ বিভিন্ন জায়গায় রাত-দিন বৃষ্টিতে ভিজে, খর রোদে পুড়ে, কাদা-পানি উপেক্ষা করে বিভিন্ন যুব শিবির থেকে ছাত্রলীগ সমর্থিত সদস্য সংগ্রহ করে পূর্বপ্রশিক্ষণ শিবিরে প্রেরণ করতে থাকলাম। কুচবিহারের দিনহাটা, ওখরাবাড়ি, সাহেবগঞ্জ, বামনহাট, গীতালদহ, চৌধুরীহাট, ধাপ্‌রা, শীতলখুচি, খাড়ুভাজ্ঞা, নাজিরহাট, ঝাউকুটি, আসামের ধুবৃরী, মানকের চর, গোলকগঞ্জ, ছাত্রশাল, বক্‌সীর হাট ও সোনাহাট থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণেচ্ছু সদস্যদের সংগ্রহ করে কখনও মানসাই নদী পার হয়ে মাথাভাঙ্গা, জলপাইগুড়ি ও পাঙ্গা হেড কোয়ার্টারে, আবার কখনও কুচবিহার থেকে ট্রেনে করে নিউ জলপাইগুড়ি নিয়ে যেতাম। তাদেরকে এখান থেকে কখনো ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়িতে প্রেরণ করা হতো।

দিনহাটা, কুচবিহার, মাথাভাঙ্গা ও শিলিগুড়ি এস.এস.বি অফিসাররা আমাদেরকে যেকোন অবস্থায় প্রাণান্ত সহযোগিতা করেন। তাঁদের মধ্যে দিনহাটার ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী ও শিলিগুড়ির ক্যাপ্টেন মিত্রের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে কখনও কখনও আদাবাড়ি ঘাট, শিতাই, মাথাভাঙ্গা, চেংরাবান্দা, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, পাঙ্গা, শিলিগুড়ি, ধুবৃরী, সোনাহাট, মানকের চর ও রৌমারীতেও ছুটে যেতে হয়। সাথে থাকতো কখনও মঞ্জু মন্ডল, রুকু, মোখতার এলাহী, কুদ্দুস, টুকু, সারোয়ার হোসেন, কখনও নূরুল ইসলাম, আব্দুস সালাম ও তারেক আলী। একদিন মাথাভাঙ্গা ঘাঁটিতে এসে

দেখলাম, মোখতার এলাহী ভীষণ জ্বরে গোঙাচ্ছে। কিন্তু ওষুধ খেতে চায় না। অবশেষে ডাক্তার ডেকে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে প্রায় জোর করে ওষুধ খাওয়ানো হলো। অন্য একদিন এনামুল, ইসাহাক, আকবর, ওসমান, বদরুজ্জামান ও মন্টুকে ট্রেনিং ক্যাম্পে পাঠানোর জন্য সঙ্গে নিয়ে মাথাভাঙ্গা গেলাম। বিকেল থেকে বাম চোখে ব্যথা অনুভব করতে শুরু করলাম। রাতে চোখের ব্যথা ও জ্বালা প্রচন্ডভাবে শুরু হলে বদরুজ্জামান, ইসাহাক ও এনামুল সারা রাত জেগে আমার পরিচর্যা করলো।

রুকুকে সাথে নিয়ে মাথাভাঙ্গা থেকে কুচবিহার আসার পথে মানসাই নদীর ঘাটে ফেরীর জন্য অপেক্ষা করছি। এমন সময় একজন শ্মশ্রুমন্ডিত হিন্দু ব্যক্তি 'জয়বাংলার' লোক অর্থাৎ আমাদেরকে উদ্দেশ্যে করে নানা ধরনের অশোভন উক্তি করতে থাকে। আমি প্রতিবাদ করে তাকে তার এই আচরণ থেকে বিরত থাকতে বললাম। কিন্তু লোকটি আমার ওপর ক্ষেপে গেলে রুকু তাকে মারতে উদ্যত হলো। পাশের লোকজন হিন্দু লোকটিকে তিরস্কার করতে থাকে। হঠাৎ আমার অবাক হবার পালা। দেখতে পেলাম, দু'জন মেয়ে–একজনের বয়স ১২/১৪ এবং অন্যজনের ১৭/১৮--সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তাদের কান্নার হেতু কি--জিজ্ঞেস করতেই জানা গেলো পাকবাহিনীর ভয়ে ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে তারা পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে পালিয়ে আসার পথে সবাইকে হারিয়েছে। কাপড়–পোশাক আর টাকা–পয়সা বলতে কিছু নেই সাথে। সামান্য ভেবে ওখরাবাড়ি শরণার্থী শিবিরে পৌঁছে দিলাম।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি [মার্কসবাদী–লেনিনবাদী] ও নকশালপন্থী বিপ্লবীরা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে মেনে নিতে পারেনি। তারা সরাসরিই আমাদের বিরোধিতা করে বসে। অনেক জায়গায় নকশালরা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে হত্যা করেছে। এইসব সংগঠন চীনকে সমর্থন করে। চীন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী পাকবাহিনীকে ন্যক্কারজনকভাবে অস্ত্রসহ সব ধরনের সহযোগিতা করে চলেছে। অথচ তারা নাকি সাম্যবাদী; শোষক, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে! অত্যাচারিতের পক্ষে! ব্যাপক হত্যা, নির্যাতন, নারীর ওপর পাশবিক অত্যাচার ও মানুষের ওপর জুলুম করে যে বর্বর পাকিস্তানী সামরিক জান্তা বাঙালি জাতিকে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে, জানি না কোন্ আদর্শকে সামনে রেখে চীন তাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পারলো? যাহোক, পাঙ্গা হেড কোয়ার্টারে যাওয়ার জন্য একবার কুচবিহার থেকে এসে জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে নূরুল ইসলাম ও মোখতার এলাহির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় এস.এস.বি ক্যাপ্টেন মিত্র জীপ নিয়ে এসে পাশে থামলেন এবং আমার হাত ধরে প্রায় হেচ্কা টানে জীপে উঠিয়ে দ্রুত ছুটে চললেন। জানা গেল, কুচবিহার থেকে নক্শালরা আমার পিছু নিয়েছে। শেষে জানা গেল, জলপাইগুড়ি থেকে নক্শালরা আমাকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। এস.এস.বি কর্মকর্তারা তাই আমাকে এভাবে না আসার জন্য সতর্ক করে দিলেন।

আর একবার পাঙ্গা হেড কোয়ার্টার থেকে জলপাইগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসে চাপলাম। হেড কোয়ার্টারের অনেকেই শিলিগুড়িতে

সাবধানে থাকতে বললো। কেননা শিলিগুড়িতে নক্‌শালদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে এবং এমন পরিস্থিতি যে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ে। এমনি অবস্থায় শিলিগুড়ির হোটেল এয়ার ভিউতে এস.এস.বি–এর তত্ত্বাবধানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু সেখানে না গিয়ে বাসে করে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাস ডিপোতে এসে নামলাম। এ সময় বৃষ্টি পড়ছিল। বেশ ঠান্ডাও লাগছিল। বাস ডিপোর এলাকা বেশ উঁচুতে। ছোটখাটো পাহাড়ী টিলার ওপর এই বাস ডিপো। ডিপোর পাশে রাষ্ট্রীয় পরিবহনের রেস্ট হাউসে গিয়ে কোনমতে একটি কক্ষে রাতযাপনের ব্যবস্থা করা গেল। কিন্তু রাত প্রায় সাড়ে দশটা হলেও কোথাও কোন খাবার পেলাম না। বিছানায় শোয়ার কয়েক মিনিট পরেই উঠতে হলো। বিছানার ওপরে এবং সার্টের ভেতর হাত চালিয়ে দিলাম, ছোট পোকার মত কি যেন হাতের তালুতে গলে গেল। নাকের কাছে হাত নিলাম, বিশ্রী গন্ধ। সাথে সাথে বাতি জ্বালিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। ছারপোকা অসংখ্য! সমস্ত বিছানা ছারপোকায় ছেয়ে গেছে। অগত্যা মেঝেতেই শুয়ে পড়লাম। তবে একটু পরিষ্কার করে নিয়ে। আবার একই অবস্থা। বাতি জ্বালিয়ে এবার দেখা গেল, পিঁপড়ের মত ছারপোকার লাইন। এর আগে এমনি অবস্থার সম্মুখীন কোনদিনই হয়নি। কী আর করা! বাতি জ্বালিয়ে সারা রাত জেগে–বসেই কাটালাম। তার ওপর মশা আর ঠান্ডা। মাঝে মাঝে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি হচ্ছে। ভোর পাঁচটায় কুচবিহার যাওয়ার জন্য বাসে উঠলাম। ধীরে ধীরে সূর্য উঠছে। পথে বাস ছুটে চলেছে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে। পাহাড় আর পাথর কেটে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। ডানদিকে কয়েক হাজার ফুট নিচে কল কল করে নদী বয়ে যাচ্ছে। পানি উঁচু হয়ে তার ওপরই আবার আছড়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে নানা ধরনের বানর রাস্তা থেকে লাফ দিয়ে গাছে উঠে যাচ্ছে। পাশাপাশি দু'টি পাহাড় মধ্যখানে প্রায় এক মাইলের ব্যবধান। তার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত প্রবল বেগে স্রোতস্বিনী নদী। এক পাহাড়ের সাথে অন্য পাহাড়ের সংযোগ রক্ষা করা হয়েছে পুল স্থাপন করে। এইভাবে যাতায়াতের চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। থালার মত সূর্য তখন নদীর ওপারে পাহাড়ের চূড়ায় ভেসে উঠেছে। শুধুই তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। দৃষ্টি ফেরানো যায় না। ডান দিকে নিচে তাকালে মনে হয়, এই বুঝি নদীতে বাস উল্টে পড়ে গেল। নদীর বুকে স্থাপিত পুল অতিক্রম করে একসময় বাস এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে এসে পৌছল। সুদীর্ঘ পাহাড়ী সবুজ চা বাগানের উঁচু–নিচু সর্পিল পথ বেয়ে আমাদের বাস ছুটে চললো কুচবিহারের উদ্দেশ্যে।

বি.এল.এফ হেড কোয়ার্টার পাঙ্গা থেকে নূরুল ইসলাম সংবাদ নিয়ে এলো, অন্তত দশ বারোদিনের জন্য আমাকে ভারতীয় মিলিটারি ট্রেনিং একাডেমি উত্তর প্রদেশের দেরাদুন যেতে হবে। দেরাদুন মিলিটারি ট্রেনিং একাডেমি বিশ্বের দুই তিনটি শ্রেষ্ঠ মিলিটারি একাডেমির অন্যতম। ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজরা এই একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখানে বিশ্বের অন্যতম গেরিলা কমান্ডো বিশেষজ্ঞ জেনারেল উবান–এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে। তাই দেরাদুন দেখার কৌতূহল ও প্রবল ইচ্ছা জাগলো। আমার

এখ্তিয়ারাধীন ঘাঁটিসমূহের কাজ কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে আমার অনুপস্থিতিতে যাকে যে ভাবে দায়িত্ব দেয়ার প্রয়োজন, তা বুঝিয়ে দিলাম। আগেই উল্লেখ করেছি বি.এল.এফ সংগঠন সম্পর্কে আমার সাব-সেক্টর কমান্ডার ও সেক্টর কমান্ডার অবগত নন। তাঁদের অগোচরে অতিগোপনে এই বিশেষ গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলতে যাচ্ছি। সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন নওয়াজিশের সাথে বিভিন্ন কারণে আমার সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না। তাই সেক্টর কমান্ডার পরম শ্রদ্ধেয় উইং কমান্ডার এম. কে. বাশার সাহেবের কাছ থেকে আমার চিকিৎসার প্রয়োজনের কথা বলে পনেরো দিনের ছুটি চেয়ে নিলাম।

পাঙ্গা হেড কোয়ার্টারে এসে জানতে পেলাম, প্রথমে আমাকে কোলকাতা যেতে হবে এবং সেখান থেকে দেরাদুন। শিলিগুড়ির উত্তরে ভারতীয় বিমানবাহিনীর ঘাঁটি বাগডোগরা থেকে হেলিকপ্টারে কোলকাতা যেতে হবে। আমি হেলিকপ্টারে যেতে রাজি হলাম না। আমার ইচ্ছে ট্রেনে কোলকাতা যাব। কেননা ভারতে আসার পর থেকে সীমান্তে শুধু যুদ্ধ নিয়েই ব্যস্ত রয়েছি। ভারতের অভ্যন্তর ভাগের কোন এলাকা বা শহর দেখার সুযোগ এ পর্যন্ত হয়নি। এই সুযোগে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা এবং কোলকাতা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। মঞ্জুর হলো। সে অনুযায়ী তাই প্রথমে কোলকাতার ভবানীপুর উঠতে হবে। ভবানীপুরের ঠিকানা জেনে নিলাম। সানী ভিলা, ৪৬ অথবা ৪৭ ভবানীপুর, ছোট মাঠের পাশে চার/পাঁচতলা ভবন। আজ অনেক বছর পর সবকিছু স্পষ্ট মনে পড়ছে না। তা'ছাড়া স্বল্প সময়ের জন্য সেখানে ছিলাম। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে সকালে এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠলাম। যেতে যেতে দেখলাম বহু আকাঙ্ক্ষিত ও বিতর্কিত সেই ফারাক্কা বাঁধ। সারাদিন শেষে সন্ধ্যার পর রাতে শিয়ালদহ স্টেশনে নামলাম। জীবনে এই প্রথম শিয়ালদহ স্টেশনে। একটার পর একটা ট্রেন আসছে আর যাচ্ছে। মানুষের হুড়োহুড়িতে আমি প্রায় দিশেহারা হয়ে গেলাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না কোন্ দিকে যাব। পুলিশের সাহায্য নেয়ার জন্য এদিক-ওদিক তাকালাম ; কিন্তু পেলাম না। শুনেছি, এমনিতেই শিয়ালদহ স্টেশনে মানুষের খুব ভিড় থাকে, তার ওপর ভিটেমাটি ও মাতৃভূমি ছেড়ে জীবনের ভয়ে পালিয়ে আসা বাংলাদেশের অসংখ্য ছেলে-বুড়ো, শিশু, মহিলা-পুরুষ মানুষ। এদিক-সেদিক ঘুরে স্টেশন থেকে বের হয়ে ট্যাক্সির স্ট্যান্ডে এলাম। দেখলাম, সব ট্যাক্সিওয়ালাই হিন্দি ভাষায় কথা বলছে। আশেপাশের প্রায় সব মানুষও কথা বলছে হিন্দিতে। দোকান, হোটেল থেকে ভেসে আসছে হিন্দি গান। আর ছড়ানো ছিটানো আবর্জনার প্রবল দুর্গন্ধ। ভাবলাম, সত্যিই কি আমি বাঙালি অধ্যুষিত পশ্চিম বাংলার রাজধানী, তথা এই উপমহাদেশের বিখ্যাত মহানগরী কোলকাতায় এসেছি ? আমি আর বিলম্ব না করে মাথায় পাগড়ি-দাড়িওয়ালা একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললাম, ভবানীপুর চলো। হট্টগোলের মধ্যে সে বেচারা আমার কথা বুঝলো কি না বুঝলোনা, আমি কিন্তু ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। অল্প সময়ের মধ্যে এক হোটেলের সামনে এসে ট্যাক্সি দাঁড়ালো। দেখলাম, হোটেল পার্ক। আমি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললাম, হোটেল মে নেহী, ভবানীপুর যাইয়ে। ড্রাইভারকে ভবানীপুর সানী ভিলার ঠিকানা দিলাম। আর মনে মনে

শঙ্কিত হলাম, এবার না জানি সে কোথায় নিয়ে যায়। আবার এই ভেবেও আশ্বস্ত হলাম যে, ড্রাইভার একজন শিখ, বিহারি নয়। আমার ধারণা ঠিক হলো। সঠিকভাবেই সে ভবানীপুর সানী ভিলায় আমাকে পৌছে দিয়ে চলে গেলো।

এখানে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক মোস্তাক এলাহীর সাথে নিচে দেখা হলো। তিনি আমাকে দোতলায় নিয়ে গেলেন। সিরাজুল আলম খান ও তোফায়েল আহমেদ এখানেই ছিলেন। এই ঠিকানা এস.এস.বি–এর একটি অফিস ভবন। আলোচনা করে এখানে আমার নাম রাখা হলো অনিল কুমার। সবাই এখানে নাম পরিবর্তন করে হিন্দু পরিচয়ে থাকেন। বিশেষ করে রান্নার কাজে নিয়োজিত ঠাকুরদের কাছে হিন্দু পরিচয় দিতেই হবে। সিরাজুল আলম খানের নাম সরোজ বাবু আর তোফায়েল ভাইয়ের নাম তপন বাবু। রাজ্জাক ভাই ও মণি ভাইসহ এখানে অবস্থানরত সকলের নাম একই নিয়মে পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে। সিরাজ ভাই ও তোফায়েল ভাইয়ের সাথে অনেক রাত পর্যন্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হলো। সকালে সেনাবাহিনীর জীপে সিরাজুল আলম খান ও অন্যান্য জেলার দশজনসহ আমাদেরকে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হলো। এখানে নূরে আলম জিকু ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। আমি ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে এসে অভিভূত হয়ে পড়লাম। মনে পড়লো, ইংরেজদের বাংলার স্বাধীনতা হরণের একশ' বছর পর এই ব্যারাকপুরেই ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী সৈনিক মঙ্গল পান্ডে এক ইংরেজ কর্নেলকে রাইফেলের গুলি চালিয়ে হত্যা করে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা করেছিল। তার প্রায় একশ' চৌদ্দ বছর পর হাসিমুখে জীবন দেবার জন্য বিপ্লবের প্রেরণায় এই ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে আমরা সমবেত হয়েছি। নিজেকে ধন্য মনে করলাম। আমার ভাবনার এক পর্যায়ে সামরিক বাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এলেন এবং যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার পর আবার গাড়িতে চাপিয়ে আমাদেরকে বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে আসা হলো। সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমেদ ও কয়েকজন সামরিক বাহিনীর অফিসারসহ বিভিন্ন জেলার মোট চৌদ্দজন দেরাদুনের উদ্দেশে আকাশপথে রওয়ানা হলাম। পড়ন্ত বিকেলে আমাদের বিমান মাটি স্পর্শ করলো। এটি ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি ঘাঁটি। চারদিকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। মাইলের পর মাইল শুকনো মাঠ আর দূরে পাহাড় চোখে পড়ছে। অদূরে মাঝে মাঝে সারিবদ্ধ উট আর ঘোড়া। বোঝা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেনাবাহিনীর গাড়িতে আমরা রওয়ানা হলাম। বেশ কিছুদূর আসার পর লক্ষ্য করলাম, আমাদের গাড়ি ক্রমশ ওপরের দিকে উঠছে। বেশ ঠান্ডা অনুভব করলাম। সাথে গরম কাপড় যা ছিল, ব্যাগ থেকে তা বের করে গায়ে দিলাম। পাহাড়ী আঁকাবাঁকা পথ আর ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে গাড়ি শুধু ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। এইভাবে সন্ধ্যার পর আমরা ঘাঁটিতে পৌছে গেলাম। সে কী ঠান্ডা, যেন দেহের প্রতিটি হাড় ফুটো হয়ে যাবে। এ অবস্থায় বেটে অথচ একটু মোটা মতন একজন হাসিখুশি মুখ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর সাথে ছাত্রলীগ নেতা হাসানুল হক ইনু, নূরুল আম্বিয়া, কাজী আরিফ, মাহবুবুল হক, আব্দুর রশিদ এবং অন্য কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা। পরিচয়

পর্বে জানা গেল, এই হাসিখুশি বেটে মতন পদস্থ সামরিক কর্মকর্তাই স্বয়ং জেনারেল উবান। স্বল্প সময়ের মধ্যেই জেনারেল উবার তাঁর বন্ধুসুলভ ও প্রাণখোলা ব্যবহার দিয়ে আমাদের মন কেড়ে নিলেন। এই সময় হঠাৎ করে আমাদের একজন সাথী [সম্ভবতঃ ভোলার] হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। সাথে সাথে তার নাকের কাছে অক্সিজেন ধরা হলে কিছুক্ষণের মধ্যে তার জ্ঞান ফিরে এলো। আমারও নিঃশ্বাস নিতে সামান্য কষ্ট হচ্ছিল। আমরা চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থান করছিলাম। আমাদেরকে গরম কাপড় ও জুতো-মোজা সব দেয়া হলো। এখানে মূলত লিডারশীপ প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য আমাদের নিয়ে আসা হয়েছে। এরপর শুরু হলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ক্লাস। সংক্ষিপ্ত অস্ত্র চালনাও শেখানো হলো। ঘন জঙ্গল ও পাহাড়ী উঁচু-নিচু ঢালু জায়গা। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে শরীর শিউরে ওঠে। জঙ্গলে গাছের পাতায় পাতায় বড় ও ছোট--কোন্ কোনটি সরু ও লম্বাটে জোঁক ঝুলে রয়েছে। তারা এক পাতা থেকে অন্য পাতায় চলাফেরা করছে। সেই সাথে নানা ধরনের পোকামাকড় ইত্যাদিও ছুটোছুটি করছে। শুনেছি, অনেক বড় বড় এবং বিভিন্ন প্রকার বিষধর সাপও রয়েছে এই সব জঙ্গলে। এক জায়গায় দেখা গেল, ধূসর বর্ণের বেশ মোটা ও একটা বড় সাপ গাছের ডালের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। সময় খুব কম হওয়ার কারণে আমাদেরকে ঘন জঙ্গল ও অন্যান্য পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হলো না। সংক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র চালনা শেখানো হলো। যেমন বিভিন্ন প্রকার রাইফেল, তার মধ্যে ৭.৬২ রাইফেল, রিভলভার, পিস্তল, এস.এম.জি, এস.এল.আর, এল.এম.জি, এইচ.এম.জি, এম.এম.জি, আর.আর. গান চালনা, গ্রেনেড ও রকেট ল্যান্সার নিক্ষেপ, বুবি ট্র্যাপ ও মাইন স্থাপন, এক্সপ্লোসিভ ডেমনস্ট্রেশন এবং ওয়্যারলেসে সংবাদ গ্রহণ ও প্রেরণ। এসব অস্ত্রের মধ্যে প্রায় অধিকাংশেরই ব্যবহার এর আগে ই.পি.আর সদস্যদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছি। অন্যদিকে গেরিলা কমান্ডারের বিভিন্ন কৌশল ও নিয়ম, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক দর্শন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সমাজ ব্যবস্থা এবং সমাজতন্ত্র বিষয়ে ধারণা দেয়া হলো। এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা বেশ উন্নত ছিল। টিনের কৌটার মাছ-মাংস, শাকসবৃজি ও প্রচুর ফলমূল--সবই পাওয়া যেত। উন্নতমানের ফিল্টার সিগারেটও সরবরাহ করা হতো। আমাদেরকে অত্যন্ত সমাদর ও সম্মান দেখানো হয়েছে, যতদিন বেঁচে থাকবো আমার মনের মণি কোঠায় তা জেগে থাকবে। আজও বারে বারে ক্ষণে ক্ষণে সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। আর নিজের অজান্তেই চোখের পাতা ভিজে ওঠে।

যাহোক এখানে নয়দিনের প্রশিক্ষণশেষে আমাদের বিদায়ের পালা। এ উপলক্ষে প্রত্যেক সামরিক অফিসার ও ইন্‌স্ট্রাক্টরবৃন্দ সামরিক কায়দায় উষ্ণ অভিনন্দন জানালেন। জেনারেল উবান এক এক করে আমাদের সকলকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। একাডেমি থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে বি.এল.এফ সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যেকোন কাজের সুবিধার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহযোগিতা গ্রহণ নিমিত্তে কোড দেয়া হলো।

আমরা আবার ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে এলাম। এখানে আমাকে অতিরিক্ত চারদিন থাকতে হলো। জেদ করে বেশি আঙ্গুর খাওয়ার জন্য আমার মারাত্মক ডায়রিয়া হলে নেয়া হলো আমাকে হাসপাতালে। মনে হচ্ছিল, আমি বাঁচবো না,মরে যাব। উপর্যুপরি পাতলা দাস্ত ও বমি। যেন পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি সব বের হয়ে আসছে। সেনাবাহিনীর ডাক্তাররা সুচিকিৎসা করলেন। দু'জন মহিলা নার্স সবসময় আমার পাশে পরিচর্যার জন্য, একজন নেপালী, অন্যজন বাঙালি হিন্দু। আমার সমস্ত শরীর ঠান্ডা হিমশীতল হয়ে যাচ্ছিল, আর আমি কাঁপছিলাম। আমার জ্বর ও কাঁপুনি বন্ধ করার জন্য এ দু'জন নার্স আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে জড়িয়ে ধরে থাকে। তাঁদের অকৃত্রিম সেবা, পরিচর্যা ও সুচিকিৎসায় দ্রুত আরোগ্য হলাম। তাঁদের এ ঋণ কি শোধ করার? কি দিয়ে শোধ করা যাবে? হাসপাতাল থেকে বিদায়কালে এই দুই মায়াময় দেবীতুল্য নার্সের মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকলাম। কোন কথা বলতে পারছিলাম না। তাঁদেরই একজন সেই বাঙালি নার্সটি এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে মাথা ধরে আমার কপালে চুমু দিলেন, আর বললেন, তুমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, দেশের জন্য যুদ্ধ করছো, হয়তো দেশের জন্যই জীবন দেবে, শহীদ হবে অথবা বেঁচে থাকবে। বেঁচে থাকলেও আর কোনদিন দেখা হবে কি না জানি না। একজন মুক্তিযোদ্ধাকে সেবা করে আমরা গর্বিত। নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি।

শহরে শত্রু এলাকায় গেরিলা অভিযান পরিচালনা, সংবাদ সংগ্রহ ও প্রেরণের ওপর মহড়া প্রদানের জন্য ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে চলে আসার আগের দিন রিভলভার, এস.এম.জি ও গ্রেনেড সাথে দিয়ে সেনাবাহিনীর গাড়িতে করে কোলকাতা শহরে নিয়ে এসে আমাদেরকে ধর্মতলায় নামিয়ে দেয়া হলো। এখানে নিয়ে আসার আগে রাইটার্স বিল্ডিং, পোস্ট অফিস, ধর্মতলা স্ট্রিট, নিউ মার্কেট, গ্র্যান্ড হোটেল, ক্যাথে রেস্টুরেন্ট, এস.এম. ব্যানার্জী পার্ক, ইসলামিয়া হোটেল, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল ও রাজ ভবন সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। এসব জায়গায় নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে কাগজ রাখা হয়েছে, তা দশ মিনিটের মধ্যে নিয়ে গ্র্যান্ড হোটেলে আসতে হবে। আমাদের অন্য কয়েকজনকে ভিন্ন স্থানে যেতে হবে। মহড়া দেখার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসাররা সাদা পোশাকে আমাদের পেছনে রয়েছেন। চার-পাঁচজন পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা বায়নোকুলার হাতে এই এলাকার কয়েকটি বিল্ডিং-এর ওপর অবস্থান নিয়েছেন। পোস্ট অফিস থেকে খাম নিয়ে আমাকে এস.এম. ব্যানার্জী পার্কের কালো পাথরের মূর্তির নিচে রক্ষিত লাল কাগজ, ইসলামিয়া হোটেলের বেসিনের নিচে পাইপে আটকানো কাগজ নিয়ে গ্র্যান্ড হোটেলে প্রবেশ করার দরজার ডান পাশের বারান্দায় বইয়ের দোকানে দাঁড়ানো আমার লোককে নির্দেশ দিয়ে হোটেলে প্রবেশ করে বসতে হবে। এ কাজে আমার সময় লাগলো বিশ মিনিট। পোস্ট অফিস থেকে খাম নিয়ে রাস্তা অতিক্রম করার সময় প্রায় ট্রামের নিচে পড়তে যাচ্ছিলাম। পেছন থেকে অনুসরণরত সামরিক অফিসার আমাকে ধরে রাস্তার পাশে টেনে নিয়ে গেলেন। অন্যদের বেশ সময় লেগে যায়। গ্র্যান্ড হোটেলে দুপুরে আমাদেরকে খাওয়ানো হলো। সেনাবাহিনীর গাড়িতে ফেরার সময় ব্যারাকপুরের আগে চিড়িয়া মোড়ে আমাদের গাড়ি থামলো। এ সময় স্কুল-কলেজ ছুটি হয়েছে। আমাদেরকে

সেনাবাহিনীর গাড়িতে দেখে নিশ্চিত মুক্তিযোদ্ধা ভেবে শত শত ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষ গাড়ি ঘিরে দাঁড়ালো। সবাই আমাদের সাথে কথা বলতে চেষ্টা করছে। অনেকেই আপেল, আঙুর, কলা, ফল, মিষ্টি ও বিস্কুটের প্যাকেট ইত্যাদি আমাদের হাতে এবং গাড়িতে তুলে দিতে থাকে। ফল, মিষ্টি ও বিস্কুটের প্যাকেটে আমাদের গাড়ি প্রায় ভরে গেল। এখানে আর বিলম্ব না করে গাড়ি ব্যারাকপুরের দিকে ছুটে চললো।

আমি ব্যারাকপুর থেকে হেলিকপ্টারযোগে বাগডোগরা বিমানবাহিনীর ঘাঁটিতে নামলাম। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকজন পদস্থ অফিসারও এই হেলিকপ্টারে আসলেন। ক্যাপ্টেন সিনৃহা আমার জন্য গাড়ি নিয়ে এখানে অপেক্ষা করছিলেন। পাঙ্গা হেড কোয়ার্টার হয়ে ফিরে এলাম আমার ঘাঁটিতে। আমার চাচা জনাব শামছুল হক চৌধুরী খুব চিন্তিত ছিলেন। তাঁকে কেউ বলতে পারেনি আমি কোথায় রয়েছি। তিনি মনে করেছিলেন, বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করে হয়তো আমি পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছি। আমাকে দেখে তিনি আশ্বস্ত হলেন। তিনি জানালেন, আমার মা চিকিৎসার জন্য কুচবিহার এসেছিলেন এবং আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন। দু'দিন কুচবিহার থাকার পর সোনাহাট ফিরে গেছেন। মা আমাকে দেখতে চেয়ে অনেক দূর পর্যন্ত এসেও দেখা পেলেন না, ভেবে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। এমন সময় কমলদা [কমল গুহ] জীপ চালিয়ে আমাদের খোঁজ নিতে আসলেন।

৩১ জুলাই আকাশবাণী কোলকাতা থেকে প্রচারিত হলো, ১ আগস্ট থেকে বেতার এক ঘন্টা পরপর আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গতি, প্রকৃতি ও সাফল্য বিষয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করবে। এই ঘোষণা শোনার পর বেশ উৎফুল্ল বোধ করছিলাম। এখন থেকে বিশ্বের মানুষ আরো বেশি করে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা জানতে পারবে। পাক হানাদার দস্যু বাহিনীর অত্যাচার, হত্যা, ধর্ষণ ও বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্ব-বিবেক জাগ্রত হবে।

একুশ

আন্ধারী ঝাড় অভিযান

[১-৮-১৯৭১]

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার আগ মুহূর্ত এমন সময় ইনফরমার খবর নিয়ে এলো, আজ শেষ রাতে পাকবাহিনীর কয়েকজন পদস্থ কর্মকর্তা নাগেশ্বরী থেকে ভুরুঙ্গামারী আসবে। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, পাকা রাস্তা কেটে এ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন স্থাপন করে পাকবাহিনীর গাড়ি উড়িয়ে দেব। আন্ধারী ঝাড়ের উত্তরদিকে বাঁশের ঝোপের কাছে পাকা রাস্তা কেটে মাইন বসানো হবে। রাস্তার পাশের বাঁশের ঝোপ থেকে ফুলকুমার নদী প্রায় সিকি মাইল পশ্চিমে। প্রয়োজনে দ্রুত নদী অতিক্রম করে নিরাপদ ও সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব। সুতরাং এই জায়গাকেই মাইন বসানোর উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা হলো। রাতে সাধারণতঃ পাকবাহিনী খুব কম যাতায়াত করে। এসময় এসব

জায়গায় কেবল রাজাকাররা টহল দিয়ে বেড়ায়। আরো জানা গেল, আন্ধারী ঝাড় থেকে জয়মনিরহাট পর্যন্ত বিস্তৃত একমাত্র এই রাস্তা দিয়ে রাজাকাররা খুব কমই টহল দেয়। রাত এগারোটায় ক্যাম্প থেকে বের হওয়ার আগ মুহূর্তে অপারেশনে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দাঁড় করিয়ে ব্রিফ করা হলো। আমরা চারটি দলে বিভক্ত হলাম। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, প্রত্যেক দলে বিশজন এবং চতুর্থ দলে দশজন--মোট সত্তুরজন এই অপারেশনে অংশগ্রহণ করবো ঠিক হলো। প্রথম দল বাঁশ ঝোপের পাঁচশ' গজ উত্তরে ও দ্বিতীয় দল পাঁচশ' গজ দক্ষিণে অবস্থান গ্রহণ করবে। তৃতীয় দল রাস্তা কেটে মাইন স্থাপন করবে। চতুর্থ দল তৃতীয় দলের সোজা পশ্চিমে ফুলকুমার নদীর পাড়ে অবস্থান গ্রহণ এবং অপারেশনের সার্বিক তত্ত্বাবধান করবে। আমাদের প্রত্যেক দলের কাছে ওয়্যারলেস সেট, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রত্যেক দলের কাছে চারটি এল.এম.জি, বাকি সব অস্ত্র এস.এল.আর। তৃতীয় দলের কাছে শুধু মাইন আর রাস্তা কাটার কোদাল–শাবল। চতুর্থ দলের কাছে দু'টি এল.এম.জি, এস.এল.আর এবং এস.এম.জি। রাত একটার মধ্যে যার যার নির্ধারিত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করা হলো। প্রায় এক ঘন্টার মধ্যে অন্তত পনেরো হাত পাকা রাস্তা কাটা হয়ে গেল। রাস্তার পাকা স্তর চাপ চাপ করে কাটা হয়েছে। ছয়টি এ্যান্টি–ট্যাঙ্ক মাইন স্থাপন করা হলো এবং এগুলোকে আবৃত করা হলো এমন সুচারুভাবে, মাইন আছে--শত্রু সৈন্য যাতে কোন মতেই বুঝতে না পারে--এই রকম কৌশলে। নিরাপদে মাইন বসানোর কাজ স্বল্প সময়ে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হলে তৃতীয় দল চতুর্থ দলের সাথে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় দল এক সাথে পাঁচশ' গজ দূরত্বের ব্যবধানে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অবস্থান গ্রহণ করলো।

আমরা এখন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর গাড়ি বহরের অপেক্ষায়। মাইন স্থাপন করা জায়গা থেকে সোজা পেছন দিকে নদীর পশ্চিম পাড়ে কলাগাছ, বাঁশের ঝোপ ও ছোট গাছের নিচে আমাদের দুই দল সামান্য ব্যবধান রেখে অবস্থান গ্রহণ করে অপেক্ষা করছি। সন্ধ্যায় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে বৃষ্টিতে ভেজা ঘাস ও মাটির ওপর আমরা বসে। মশা কামড়াচ্ছে, ছোট ছোট জোঁক হাতে লাগছে, জোঁক কাপড়ের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে বাদুড় উড়ে যাওয়ার পাখার ঝাপটার শব্দে নীরবতা ভেঙে পাখিরা চিৎকার করে উঠছে। কিন্তু একই জায়গায় সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ। হানাদার বাহিনীর গাড়ি কখন আসবে, তারই অধীর অপেক্ষায় গুনছি প্রহর। ভোর চারটা/সাড়ে চারটায় রায়গঞ্জের দিক থেকে একটি গাড়ির দু'টি হেডলাইট ওপরে উঠে নিচে নেমে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল গাড়ি রায়গঞ্জ পুল পার হয়ে উত্তরে আন্ধারী ঝাড়ের দিকে আসছে। গাড়ি যতই অগ্রসর হচ্ছে, ততই আমাদের বুকের স্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে। আর কয়েক মুহূর্ত। ওইতো গাড়িটি মাইন বসানো স্থানে চলে এসেছে। আমরা দু'হাত দিয়ে কান চেপে ধরলাম। হঠাৎ গগন বিদারী গুড়ুম গুড়ুম বিকট শব্দে আকাশ যেন ভেঙে পড়লো। মাটি কেঁপে উঠলো। পাখিরা ভয়ে চিৎকার করতে করতে উড়তে থাকলো। মনে হলো, কান ফেটে গেছে। কয়েক মুহূর্তপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সবাইকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললাম। কিন্তু সবাই ছুটছে ঘটনাস্থলের দিকে। দেখা গেল, রাস্তার মধ্যে বিরাট

এক খাদ হয়ে গেছে। জীপের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। রাস্তার বেশ দূরে ক্ষেতের মধ্যে একটি টুপি আর ক্যাপ্টেনের ব্যাজ লাগানো সার্টের হাতাসহ একটি হাত পড়ে রয়েছে। বিলম্ব না করে এগুলো নিয়ে আমরা দ্রুত চলে এলাম। শত শত লোক ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা দাঁড়িয়ে। ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার জসি আমাদের অভিনন্দন জানালেন। জানা গেল, সাহেবগঞ্জসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বাড়িঘর, দিনহাটার পাকা ভবনগুলোও কেঁপে উঠেছিল। পাকবাহিনীর ঐ গাড়িতে একজন ক্যাপ্টেনসহ এগারোজন হানাদার বাহিনীর সদস্য ছিল। মাইনের আঘাতে লরি জীপসহ শয়তানদের সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পার্শ্ববর্তী দিনহাটা, কুচবিহার, তুফানগঞ্জ এবং দূর–দূরান্ত থেকে উৎসুক মানুষ কয়েকদিন যাবৎ আমাদের এই অপারেশনের সাফল্যের কথা জানতে এসেছে। মানুষের এই প্রাণঢালা ভালবাসা এবং আমাদের প্রতিটি সাফল্যে মানসিকভাবে উত্তরোত্তর আরো বেশি করে শক্তি অর্জন করতে লাগলাম।

শহীদ অধ্যাপক আব্দুল ওহাব তালুকদার
[৫–৮–১৯৭১]

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কয়েকদিন পর পর বাউসমারী ও শিংঝাড় এসে অল্প সময় অবস্থান করেই চলে যায়। শিংঝাড় ও বাউসমারীতে দস্যুবাহিনীকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো। তাদের গতিবিধি সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে সঠিক খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি। কুড়িগ্রাম কলেজের ইসলামের ইতিহাসের অধ্যাপক আব্দুল ওহাব তালুকদার বামনহাট যুব শিবিরের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি বাউসমারী গ্রামে। এই এলাকায় পাকবাহিনীর গতিবিধির ওপর তিনি সঠিক সংবাদ দিতে চাইলেন। ৫ আগস্ট তিনি ডাঃ মজিবর রহমান এবং অন্য একজনকে সাথে নিয়ে বামনহাট থেকে সীমান্ত পার হয়ে পরিত্যক্ত রেলপথ দিয়ে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে শিংঝাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এদিকে শত্রু বাহিনীও রেললাইনের পাশের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে লুকিয়ে সীমান্তের দিকে আসছিল। শিংঝাড়ের কাছে শত্রুরা অতর্কিতে তাঁদেরকে আক্রমণ ও গুলিবর্ষণ শুরু করে। অধ্যাপক ওহাব লাইনের পাশে একটা বরুই গাছের ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়েন। ডাঃ মজিবর ও অন্যজন রেললাইনের পাশে ইরিক্ষেতের পানির ক্যানেলের মধ্যে শুয়ে পড়েন। তাঁরা ক্যানেলের পানি কেটে কেটে শত্রুর নাগাল পেরিয়ে সীমান্তের দিকে এসে জীবন রক্ষা করেন। কিন্তু অধ্যাপক ওহাব আটকা পড়ে যান।

হানাদাররা গুলি করতে করতে তার কাছে এসে তাঁকে এল.এম.জি'র ব্রাস ফায়ারে নৃশংসভাবে হত্যা করে। গুলিতে গুলিতে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝাঁঝরা হয়ে যায়। লুঙ্গি ও জামা জালের ছিদ্রের আকার ধারণ করে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই নিবেদিতপ্রাণ শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আব্দুল ওহাব তালুকদারকে হত্যা করে বর্বর পাঞ্জাবিরা দ্রুত চলে যায়। আমরা সাথে সাথে এই জায়গায় গিয়ে শহীদ শিক্ষকের মরদেহ নিয়ে আসি। বামনহাট সীমান্তের কাছে ভারতের কালমাটি গ্রামে তাঁকে সমাহিত করে শেষ বিদায় জানালাম।

’৬৯, ’৭০ সাল এবং তারও আগে আয়ুবশাহীর শাসনের বিরুদ্ধে সূচিত আন্দোলনের সময় শিক্ষক জনাব আব্দুল ওহাব তালুকদার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করছেন। একবার কুড়িগ্রাম কলেজে পাকিস্তানী দালাল পনির মিঞার ছেলে ও মুসলিম লীগ, এন.এস. এফ. গুন্ডা বাহিনীর নেতা তাজুল ইসলাম একদল গুন্ডা এবং লাঠি, চাকু, চেন ইত্যাদি নিয়ে আমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব আব্দুল ওহাব তালুকদার ও মোজাম্মেল হক চৌধুরী শিক্ষক মিলনায়তন থেকে দ্রুত বের হয়ে এসে গুন্ডাদের বাধা প্রদান করেন। সেই অধ্যাপক ওহাব পাকবাহিনী কুড়িগ্রাম ও ভুরুঙ্গামারী প্রবেশ করার সাথে সাথে তাঁর তিন ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদেরকে সীমান্তে এক আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য আগত ছাত্র–যুবকদের অনুপ্রাণিত করার জন্য বামনহাট যুব শিবিরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত নিরলস পরিশ্রম করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

পাটেশ্বরী রেল স্টেশন অপারেশন

[৮–০৮–১৯৭১]

এর আগে উল্লেখ করেছি, পাটেশ্বরী ও সোনাহাটের মাঝে সঙ্কোষ নদীর ওপর ইংরেজদের তৈরি লোহার বড় রেল সেতু ভেঙে দিয়ে নদীর পূর্ব পাড় বরাবর আমরা অবস্থান নিয়েছি। এই নদীর অপর নাম দুধকুমার এবং এই নামেই খ্যাত। পাকবাহিনী নদী অতিক্রম করে সোনাহাটসহ পূর্ব পার দখল করতে সমর্থ হয়নি। তারা পাটেশ্বরী পরিত্যক্ত রেল স্টেশনে অবস্থান নেয়। শত্রুরা পাটেশ্বরী এবং নদীর পশ্চিম পার থেকে প্রায় প্রতিদিনই আমাদের অবস্থানের ওপর কামান ও অন্যান্য ভারি অস্ত্র দিয়ে গুলিবর্ষণ করে। আমাদের অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধারাও এই গুলিবর্ষণের জবাব দিতে থাকে। মাঝে মাঝে নদী পেরিয়ে পাটেশ্বরীতে অবস্থান নিয়ে শত্রু বাহিনীকে আক্রমণ করে বিতাড়িতও করা হয়। আবার পাকবাহিনীর আধুনিক অস্ত্রের প্রচন্ড আক্রমণে আমরা নদী অতিক্রম করে পূর্ব পারে অবস্থান নিয়ে থাকি। এর মধ্যে জানা গেল, পাকবাহিনী পাটেশ্বরী থেকে চলে গেছে। ৭ আগস্ট শেষ রাতে কোম্পানি কমান্ডার আব্দুল কুদ্দুস নান্নুর নেতৃত্বে একটি প্লাটুন নদী অতিক্রম করে পুলের পশ্চিম ও পাটেশ্বরী রেল স্টেশনের পুবে পাকা রাস্তা ও রেললাইনের উত্তর–দক্ষিণ উভয় পাশের খাল, নিচু স্থানের বটগাছ তলা, বাঁশ ঝাড় ও জঙ্গলের মধ্যে অবস্থান নেয়। হানাদাররা পাটেশ্বরী রেল স্টেশন ও বাজার ত্যাগ করে চলে গেছে, তাই মুক্তিযোদ্ধারা উৎফুল্ল হয়ে পড়ে। পুলের পশ্চিমে, স্টেশন ও বাজারের পুবে, রেললাইন এবং পাকা রাস্তার মাঝে জমির উঁচু আল আর বিন্না ঘাসের থোপকে আড়াল করে পশ্চিম দিক বরাবর দু’টি এল.এম.জি হাতে মকবুল, মহসীন, আজিজসহ ছয়–সাতজন অবস্থান নেয়। সকাল প্রায় এগারোটার সময় হঠাৎ দেখা গেল ২৫/৩০ জন খান সেনা রেললাইনের উত্তর পাশ দিয়ে পুব দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মহসীনদের প্রায় বাম দিকে চলে এসেছে পাকবাহিনী। পেছনের অবস্থানে সংবাদ প্রেরণ করার সময় বা উপায়

কোনটাই নেই। তাই সাথে সাথে তারা শত্রুদের ওপর এল.এম.জি দিয়ে গুলি চালাতে থাকে। অগ্রসররত পাকবাহিনীর প্রায় সবাই অব্যর্থ গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পাকবাহিনীর কয়েকজন সদস্য রেললাইনের দক্ষিণ পাশে অবস্থান নিয়ে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। ঠিক এই সময় পাকা রাস্তা দিয়ে একটি জীপ ও একটি লরি থেকে শত্রু বাহিনী প্রচন্ড গুলিবর্ষণ করতে করতে পুলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মহসীনরা পাল্টা গুলি করতে করতে পেছনে এসে পুলের কাছে আশ্রয় নেয়। পাকবাহিনী বৃষ্টির মত মেশিনগান ও মর্টার ইত্যাদি ভারি অস্ত্রের গুলি চালাতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারাও এই আক্রমণ প্রতিহত করে পাল্টা গুলি চালাতে থাকে। আমাদের সীমিত গুলি শেষ হয়ে আসে। কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা দক্ষিণ দিকে সরে গিয়ে এবং যে যার মত নদী অতিক্রম করে পুব পারে চলে আসে। মহসীন, মকবুল, আজিজ ও কোম্পানি কমান্ডার নান্নুসহ কয়েকজন সবার শেষে নৌকা দিয়ে নদী পার হতে থাকে। পাকবাহিনী নদীর পারে এসে এবং পুলে উঠে তাদের নৌকার ওপর গুলি চালায়। নান্নু ভাইয়ের কপালের চামড়া ঘেঁষে গুলি চলে যায়। তিনি সামান্য আহত হন। এই অবস্থায় সবাই পানিতে নেমে নৌকা ধরে নদী পার হতে থাকে। হঠাৎ মকবুল নৌকায় উঠে এল.এম.জি দিয়ে পুলের ওপর পাকবাহিনীর দিকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। তিনজন শত্রু সেনা পুলের ওপর পড়ে যায়। লড়াইয়ের এই পর্যায়ে হঠাৎ পাকবাহিনীর গুলির আঘাতে মকবুল ও আজিজ শহীদ এবং কপাল ও বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মহসীন গুরুতরভাবে আহত হলো। শহীদ আজিজের মরদেহ নদীতে ভেসে যায়।

এই দিন সোনাহাটস্থ ঘাঁটিতে আমি এসেছি। আহত মহসীন ও নান্নু ভাইকে নিয়ে আমরা ধুবুরী হাসপাতালে এলাম। মহসীনকে বাঁচানোর জন্য ডাক্তাররা আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। আমরা মহসীনের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছি। মহসীন শুধু একবার অতিকষ্টে আমাদের মুখের দিকে তাকালো। কি যেন বলতে চাইলো। কিন্তু পারলো না। সাথে সাথে এই বীর সন্তানের মাথা ঢলে পড়লো। হয়তো বলতে চেয়েছে, তোমরা আমার জন্য দুঃখ করো না। বাংলার স্বাধীনতার লাল সূর্য উঠবেই, জয় বাংলা। শহীদ মহসীনের মরদেহ নিয়ে এসে সোনাহাট হাই স্কুলের পুব পাশে এবং পুলের অবস্থানের পাশে শহীদ মকবুলকে সমাহিত করা হলো। নদীতে ভেসে যাওয়া শহীদ আব্দুল আজিজের লাশ উদ্ধার করে শত শত মানুষ হেলডাঙ্গা গ্রামে সমাহিত করে।

শহীদ মহসীন ছিল কুড়িগ্রাম কলেজের বি.এসসি পরীক্ষার্থী। তার ঠিকানা গ্রাম টগরাইহাট, কুড়িগ্রাম। শহীদ আব্দুল আজিজ ছিল স্কুল ছাত্র। ঠিকানা গ্রাম সিনাই, কুড়িগ্রাম। শহীদ মকবুল ছিল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ঠিকানা গ্রাম নজিম খাঁ, উলিপুর।

গীতালদহ ঘাঁটি

লালমনিহাট সাব-সেক্টরের প্রধান ঘাঁটি গীতালদহ। ক্যাপ্টেন দেলোয়ার হোসেন এই সাব-সেক্টরের কমান্ডার। এই ঘাঁটির সবাই এফ.এফ.। লালমনিরহাট, মোগলহাট,

দরিয়ারহাট, গোলক মন্ডল, কালীগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে শত্রু বাহিনীর ওপর আঘাত হানার জন্য ধরলা নদী অতিক্রম করে যেতে হয়। মোগলহাট, দরিয়ারহাট, গোলক মন্ডল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় শত্রু বাহিনী পাকা শক্ত বাঙ্কার তৈরি করে প্রতিরক্ষা ব্যূহ সৃষ্টি করেছে। মোগলহাটসহ এইসব এলাকা আক্রমণ করতে এসে প্রায়শই মুক্তিযোদ্ধারা আহত ও শহীদ হতে থাকে, তা সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন দেলোয়ার দিনের আলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের নদী ও পুল পার হয়ে একের পর এক অপরিকল্পিত আক্রমণের নির্দেশ দিতে থাকেন। মুক্তিযোদ্ধারা দিনের আলোতে নদী ও পুল অতিক্রম করে যাওয়ার সাথে সাথে পাকবাহিনী বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ শুরু করে। ফলে আমাদের হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিতাপের বিষয়, ক্যাপ্টেন দেলোয়ার নিজে কোন অভিযানেই অংশগ্রহণ করেন না। এসব অপরিকল্পিত ও অবাঞ্ছিত অভিযানের নির্দেশ দেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ জানায়। কিন্তু ক্যাপ্টেন তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে উত্তরোত্তর নির্দেশ দিতে থাকে। যে সব মুক্তিযোদ্ধা এই অভিযানে যেতে সম্মত হয় না, তাদেরকে স্টেশনের প্লাটফরমে সারিবদ্ধভাবে নিল ডাউন করিয়ে রাখা, সূর্যের দিক মুখ ও সামনে হাত উঁচু রেখে তার ওপর রাইফেল চাপিয়ে দিয়ে ঘন্টা পর ঘন্টার অমানবিক শাস্তি প্রদান করা হয়। এ কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ক্রমেই অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যেকোন সময় নিজেদের মধ্যে সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এই শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন দেলোয়ার বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রায়শ বলেন, সব গন্ডগোলের মূলে ছাত্ররা, আজ আমরা চাকরি ও বাড়িঘর ছেড়ে কষ্ট করছি, পাকিস্তানের বন্দী শিবিরে বাঙালি অফিসার ও তাদের পরিবারের সদস্যরা বন্দী জীবন কাটাচ্ছে। কাজেই যুদ্ধ করতে হবে ছাত্রদের, মরতেও হবে ছাত্রদের।

এই অবস্থায় একদিন গীতালদহে এসে ক্যাপ্টেন দেলোয়ারকে তাঁর এই আত্মঘাতী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আমি অনুরোধ করলাম। তিনি আমার ওপর ক্ষেপে গেলেন। আমি বললাম, আপনি পাকিস্তানী চর। আমাদের যুদ্ধের কৌশল লঙ্ঘন করে দিনের আলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। অহেতুক কতগুলো জীবন ঝরে যাচ্ছে, চিরতরে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে সাথী-যোদ্ধারা। একজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার অন্যায়ভাবে দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মুক্তিযোদ্ধাদের শাস্তি দিতে পারে না। এরপর আর কখনও অদূরদর্শিতার কোন অভিযানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণ এবং অন্যায়ভাবে তাদের শাস্তি দিলে আপনার ওপর গুলি চালানো হবে। এ ধরনের কথাবার্তা চলার সময় বেশ হট্টগোলের সৃষ্টি হলো। ভারতীয় বাহিনীর ক্যাপ্টেন শম্ভু এসে নিষ্পত্তির চেষ্টা করলেন। আমি চলে এসে সেক্টর কমান্ডার ও ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জসিকে সব অবহিত করলাম। অবশেষে তাদের হস্তক্ষেপে ক্যাপ্টেন দেলোয়ার অন্যায় আচরণ ও অদূরদর্শী অভিযানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণ থেকে বিরত হলেন।

কুলাঘাট অভিযান

শত্রু পাকসেনারা কয়েকদিন পর পর লালমনিরহাট থেকে কুলাঘাট এসে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে। গ্রামে ঢুকে টাকা-পয়সা-গহনা ইত্যাদি লুট, মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে এবং অনেক সময় তাদেরকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গ্রামের নিরীহ মানুষদের হত্যা করে। ফুলবাড়িতে অবস্থানরত কোম্পানি কমান্ডার সিরাজ আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে ভোর রাতে ধরলা নদী পার হয়ে কুলাঘাটের উজানে দু'টি গ্রামকে মাঝে রেখে উত্তর ও দক্ষিণ দু'দিকে অবস্থান নেয়। সকাল দশটায় পাকবাহিনীর পঁচিশজনের একটি দল এই গ্রামে ঢুকে নদী বরাবর আসতে থাকে। নদীর প্রায় কাছে আসার সাথে সাথে পেছনসহ তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলে মুক্তিযোদ্ধারা খান সেনাদের ওপর প্রচন্ড আক্রমণ ও গুলিবর্ষণ শুরু করে। প্রায় আধঘন্টা গুলি বিনিময়ে দশ-বারোজন পাক-সেনা নিহত হয়। এদের মধ্যে একজন পাক-সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে, বাকিরা পালিয়ে যায়। ধৃত খান-সেনাকে ফুলবাড়িতে নিয়ে আসা হয়। শত শত মানুষ এই শয়তানকে দেখার জন্য সমবেত হয় ও হাতের নাগালে পেয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মারমুখো হয়ে ওঠে। নাম জানা গেল মকবুল খান। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাকে নিয়ে চলে গেল।

এই অভিযানের কয়েকদিন পর পঞ্চাশ-ষাটজন পাক-সেনা কুলাঘাট থেকে বড় দু'টি নৌকায় নদী পার হতে থাকে। কিছু খান সেনা নদীর ঘাটে ভারি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কভারিং দেয়ার জন্য নদীর কিনারায় অবস্থান গ্রহণ করে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা নদীর পাড় ঘেঁষা চরের মধ্যে, কাশবন, ঝাউগাছ ও জঙ্গলের ভেতর ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। শত্রু বাহিনী নদীর মাঝ বরাবর আসার পর মুক্তিযোদ্ধারা রাইফেল, এস.এল.আর, এল.এম. জি ও দু'ইঞ্চি মর্টার দিয়ে বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ করে নৌকা দু'টি ডুবিয়ে দেয়। ধরলা নদীর বুকে প্রায় পঞ্চাশ/ষাটজন নর-পশুর সলিল সমাধি হলো। নদীর কিনারা থেকে খান-সেনারা অবস্থান তুলে পিছু হটে লালমনিরহাট চলে যায়। এই প্রচন্ড মার খাওয়ার পর কুলাঘাট দিয়ে নদী অতিক্রম করার সাহস শত্রুরা আর পায়নি।

দুর্গাপুর অপারেশন

শত্রু বাহিনী রংপুর থেকে কুড়িগ্রাম, উলিপুর ও চিলমারী ট্রেনে যাতায়াত ও রসদপত্র, মালামাল আনা-নেয়া করে। কুড়িগ্রাম ও উলিপুরের মধ্যবর্তী দুর্গাপুর স্টেশনের কাছে রেললাইনের নিচে মাইন স্থাপন করে শত্রু বাহিনীসহ ট্রেন উড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। দুর্গাপুর স্টেশনের উত্তর পাশের লাইনের নিচে মাইন বসানোর উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হলো। মাইন স্থাপনশেষে এখান থেকে অতি সহজে পুব দিকে ধরলা নদী অতিক্রম করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া সম্ভব। এখান থেকে ধরলা নদীর পুব পাড়, বেগমগঞ্জসহ কালীগঞ্জের বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল আমাদের দখলে। এখানে আমরা অবাধে চলাফেরা করে থাকি। কোম্পানি কমান্ডার আকরামের নেতৃত্বে বিশজনের একটি দল

মোগলবাছার দক্ষিণ দিক দিয়ে নদী পার হয়ে দুর্গাপুর স্টেশনের উত্তরে বাঁশের ঝোপের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ এবং অতি দ্রুত রেললাইনের কাঠের স্লিপারের নিচে চারটি এ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন যথাযথভাবে স্থাপনশেষে স্থান ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসতে সক্ষম হয়। ভোর রাতে পাকবাহিনী কুড়িগ্রাম থেকে উলিপুর যাওয়ার পথে দুর্গাপুরে বিকট দানবীয় শব্দে মাইন বিস্ফোরিত হলো। ইঞ্জিনসহ দু'টি বগি মাইনের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে পাশের খাদে পড়ে যায়। মাইন পেতে রাখা স্থানে বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়। প্রায় বিশ পঁচিশজন শত্রু সেনা নিহত হয় এবং এরপর উলিপুর ও চিলমারীতে অবস্থানরত শত্রু বাহিনীর জন্য নিয়ে আসা প্রচুর পরিমাণ রসদ ধ্বংস হয়ে যায়।

আমাদের বীরত্বপূর্ণ এইসব সফল অভিযানের সংবাদ ভারতীয়, রুশ, বৃটিশ, ফরাসী, জার্মান, আমেরিকান প্রভৃতি দেশের বহুল প্রচারিত পত্রিকাগুলোতে ফলাও করে প্রকাশিত হয়। বিবিসি, ভারতীয় বেতার আকাশবাণী এবং স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত হতে থাকে। স্বাধীন বাংলা বেতারের অতিপ্রিয় 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানে আমাদের সাফল্যের কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রচার করা হয়। এতে করে আমরা অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত বোধ করি এবং শত্রু সেনাদের ওপর আরো প্রবল আঘাত হানার অনুকূলে মনের সাহস সঞ্চয় করি।

বাইশ

আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কুড়িগ্রামের মহকুমা প্রশাসক আমার সাথে যোগাযোগ করেন। তাঁর নাম সম্ভবত আব্দুর রহমান। পাকবাহিনী, শান্তি কমিটি, রাজাকারদের সংবাদ সংগ্রহ, সেই সাথে আমাদের বিভিন্ন ঘাঁটির মধ্যে সংবাদ দেয়া-নেয়ার জন্য কিছুসংখ্যক কুরিয়ার এবং আমাদের এলাকার অভ্যন্তরে যাতায়াতের সাহায্যের জন্য গাইড নিয়োগ করা হয়। আমাদের এই সংবাদ-সংগ্রাহক মাঝে মাঝে কুড়িগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপাল জনাব আব্দুল ওহাবের কাছ থেকে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের তৎপরতা ইত্যাদি সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করে নিয়ে আসতো। এই সূত্রেই মহকুমা প্রশাসক আমার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাঁকে আমাদের কাছে চলে আসতে বলা হয়, কিন্তু পাকবাহিনী তাঁকে কড়া নজরে রাখার কারণে তিনি আসতে পারেননি। তিনি গ্রামে রিলিফ বিতরণের নামে ও বিভিন্নভাবে আমাদের গাইডের মাধ্যমে চাল, চিনি, আটা, কাপড় এবং টাকা আমার কাছে বেশ কয়েকবার প্রেরণ করেছেন।

জুন মাসের দিকে ছাত্রলীগ নেতা ও টাঙ্গাইলের আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী এম.এন.এ দিনহাটা শহীদ কর্নারস্থ যুব শিবিরে আসেন এবং এখান থেকে তিনি গীতালদহ যুব শিবিরে অবস্থান গ্রহণ করেন। কাদের সিদ্দিকী যুদ্ধ শুরু করেছেন জানতে পেরে জুলাই মাসের শেষে লতিফ সিদ্দিকী আসামের তুরায় চলে গেলেন। এ সময় টাঙ্গাইলের ছাত্রনেতা আব্দুল বাতেন আমাদের দিনহাটাস্থ ঘাঁটিতে এলেন। উত্তরাঞ্চলীয় বি.এল.এফ

হেড কোয়ার্টার পাঙ্গায় সিরাজুল আলম খানের সাথে শাহজাহান সিরাজ অবস্থান করছিলেন। তাই বাতেন প্রথমে পাঙ্গা এবং পরে এখান থেকে দেরাদুন প্রশিক্ষণ শিবিরে চলে যান।

ন্যাপ [ভাসানী] নেতা ও রংপুরের মশিউর রহমান যাদু মিঞা মে মাসের শেষে শিতাই সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে প্রথমে কুচবিহার ও জলপাইগুড়িতে অবস্থান করে পরে কোলকাতা চলে যান। তিনি ভারতে অবস্থানরত মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু মৌলানা ভাসানী যাদু মিঞাকে সাক্ষাৎ দিলেন না। দুঃখজনক হলেও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, একমাত্র মৌলানা ভাসানী ছাড়া তাঁর সংগঠনের প্রায় প্রত্যেক নেতা ও কর্মী আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং বর্বর দস্যু পাকিস্তানী বাহিনীর পক্ষে কাজ করে। যেহেতু চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সামরিক, অর্থনৈতিক সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করছে, সেহেতু ভাসানী ন্যাপের নেতা ও কর্মীরা পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে। একমাত্র মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য চীনের প্রতি আহ্বান জানান। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, মূল প্রধান নেতা একা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, আর তার দলের প্রত্যেক নেতা–কর্মী স্বাধীনতার বিপক্ষে কেন। এই প্রশ্নের উত্তর আজোও খুঁজে পাওয়া যায়নি। হয়তো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গবেষণার মাধ্যমে এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করবে। যাহোক, জুলাই মাসের মাঝামাঝি কোলকাতায় মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে মশিউর রহমান যাদু মিঞার যোগাযোগ ও সাক্ষাৎ ঘটে। এই মাসের পঁচিশ তারিখ রাতে জলপাইগুড়ি শহরে রুবি বোর্ডিং চত্বরে মেজর জিয়া ও যাদু মিঞাকে একই সাথে দেখা গেল। এই রাতেই দু'জন একই গাড়িতে জলপাইগুড়ি থেকে চলে গেলেন। যাদু মিঞাকে তুরায় নিয়ে আসা হলো এবং কয়েকদিনের মধ্যে রৌমারী হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর অপর পারে পাকবাহিনীর অবস্থান গাইবান্ধায় গোপনে তিনি চলে গেলেন।

এই জুলাই মাসেই মেজর জিয়া তাঁর বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানিকে সুবেদার আলতাফের নেতৃত্বে মুক্ত এলাকা রৌমারীতে অবস্থান গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে দিয়ে তিনি জেড–ফোর্স গঠন করলেন। সুবেদার আলতাফের নেতৃত্বে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যরা রৌমারী মুক্ত এলাকার মানুষের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করে। অবস্থাপন্ন মানুষের কাছ থেকে তারা হাজার হাজার টাকা চাঁদাস্বরূপ আদায় করতে থাকে। চাঁদা প্রদান করতে অসম্মত এবং চাঁদা আদায়ে বাঁধাদানকারীদেরকে লাঞ্ছিত করা হয়। অনেকের বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। কয়েকজনকে গুলি করে আহতও করে তারা। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে আসাম বি.এস.এফ কর্তৃপক্ষ সুবেদার আলতাফ ও তাঁর কোম্পানি রৌমারী থেকে তুরায় ফেরত যেতে বাধ্য করেন।

কুড়িগ্রাম কলেজের ছাত্র ও ছাত্রলীগ কর্মকর্তা শুভ্রাংশু কুমার চক্রবর্তী ভারতে এসে শিলিগুড়ি পিসির বাড়িতে আশ্রয় নেয়। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিনহাটা শহীদ কর্নারস্থ বি.এল.এফ ঘাঁটিতে এসে শুভ্রাংশু কুমার চক্রবর্তী আমার দেখা না পেয়ে পুকুরের অপর পারে ফরোয়ার্ড ব্লক অফিসে কমল গুহর কাছে আমার কথা জানতে

চায়। এ সময় আমি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছিলাম। শুভ্রাংশু বাবুর পরিচয় নেয়ার পর কমল গুহ রাগান্বিত হয়ে বলেন, তোমরা পিসি-মাসির বাড়িতে আরাম করে খাচ্ছ, ভারত সরকারের দয়ায় ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াচ্ছ। আখতারকে এখানে পাওয়ার আশা কি ভাবে কর? ওকে পেতে হলে যুদ্ধের ময়দানে যেতে হবে। তোমাদের দেখে মনে হয়, বাংলাদেশ শুধু এই মুসলমান ছেলেদেরই দেশ। 'জয় বাংলা' হিন্দু সম্প্রদায়ের নয়। এই ছেলেরা খেয়ে না খেয়ে জীবন বিপন্ন করে যুদ্ধ করছে, শহীদ হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হলে তোমরা হিন্দুরা দেশে ফিরে মজা করে মাছের মাথা খাবে। কমল গুহ এক পর্যায়ে ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী বিমলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, দিনহাটা থেকে 'জয় বাংলা'র সব হিন্দুকে পিটিয়ে বের করে দে, মাসি-পিসির বাড়িতে সুখে খাচ্ছে আর রাস্তায় রাস্তায় চেহারা দেখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

আমার দেখা না পেয়ে শুভ্রাংশু বাবু চলে যান এবং কয়েকদিন পর আবার এই ঘাঁটিতে এসে অপেক্ষা করতে থাকেন। ২২ আগস্ট দুপুরে আমি এই ঘাঁটিতে ফিরে এলাম। শামছুল হক চৌধুরী এম.পি.এ, পুলিশ অফিসার মকবুল হোসেন ও আব্দুস সোবহান সাহেবের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলাম। শুভ্রাংশু বাবুকে আমার এই ঘাঁটিতে সবসময় অবস্থান করার ব্যবস্থা করে দিলাম। তাঁকে কিছু দায়িত্ব দেয়া হলো। বি.এল.এফ-এর কুরিয়ার,গাইড ও বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রেরিত সংবাদ গ্রহণ এবং জরুরী কোন সংবাদ থাকলে আমার কাছে তা প্রেরণ করার দায়িত্ব। শুভ্রাংশু বাবুকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলাম। তিনি খুশি হয়ে আমার দেয়া দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

তেইশ

বি.এল.এফ ট্রেনিং গ্রহণের জন্য পর পর আরো তিনটি দলে কুড়িগ্রাম মহকুমার আটটি থানার মোট দু'শ' ছাত্রলীগ সদস্যকে প্রেরণ করা হলো। এর আগে দু'টি দলকে প্রেরণ করা হয়েছে। মোট পাঁচটি দলের মধ্যে ভুরুঙ্গামারী থানার হায়দার, এনামুল, মোজাম্মেল, আমীর, রশিদ, কাদের, খালেক, এজাজুল হক, মন্টু, মোহাম্মদ আলী, ওসমান, আকবর, ইসাহাক, নাগেশ্বরীর নূরুল আজীম, ফুলবাড়ির আবুল হোসেন, বদরুজ্জামান, লতিফ, এরফান, লতিফ, লালমনিরহাটের গোরা, রুমি, কুড়িগ্রামের মঞ্জু মন্ডল, রুকু, নূরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী, মালেক রফিক, উলিপুরের ইসাহাক, চিলমারীর আনোয়ার, রৌমারীর সিরাজুল ও নূরুল অন্যতম।

কাজের এই ব্যস্ততার মধ্যে এস.এস.বি ক্যাপ্টেন আমার কাছে সংবাদ নিয়ে এলেন আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বি.এল.এফ. সদস্যদের প্রথম দলের ইনডাকশন হবে। অর্থাৎ তাদেরকে আমার আওতাধীন এলাকার অভ্যন্তরে স্থাপিত ঘাঁটিতে প্রেরণ করতে এবং এর জন্য দিনহাটাস্থ বি.এল.এফ ঘাঁটি ও এস.এস.বি অফিসে আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। আমাদের তৈরি রুটগুলোর মধ্যে দু'টি, প্রথমত নাজিরহাট-

মইদাম–ভুরুঙ্গামারী, দ্বিতীয়ত গীতালদহ–বালাহাট–ফুলবাড়ি–সিনাই রুটের গাইড যথাক্রমে ফরমান, খবির, আমজাদ ও আমীরকে প্রস্তুত থাকার সংবাদ প্রেরণ করে আমি দিনহাটা বি.এস.এফ ঘাঁটিতে এসে পৌঁছলাম। রাতে ক্যাপ্টেন ব্যানার্জীর বাংলোতে এস.এস.বি অফিসারদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হলো। ২৯ আগস্ট রাতে ইনডাকশান হবে। কিন্তু ২৯ ও ৩০ আগস্ট ইনডাক্শন হলো না। ৩১ আগস্ট তারিখে ইনডাক্শন হবে কি না, নিশ্চিত কোন সংবাদ পেলাম না। হাতে কাজ নেই, সময় আর কাটতে চায় না। ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা কমল গুহ, বিমল বাবু, সূর্য বাবু ও আমাদের ঘাঁটির অন্য ক'জনের সাথে বিপ্লবী সুরেন্দ্র নাথ, বলিভিয়ার চেতগুয়েভারা, সুভাষ বোস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনের নানা ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করে এই দু'দিন কাটালাম। ৩০ আগস্ট সকাল এগারোটায় ২৮/২৯ বছরের একটি লোক আমার খোঁজে এখানে এসে উপস্থিত হলো। লোকটি গীতালদহ, চৌধুরীহাট ও সাহেবগঞ্জের এফ.এফ ঘাঁটি ঘুরে এখানে আমার সাথে দেখা করতে এসেছে। লোকটি জানালো, এম.এন.এ করিম সাহেব তার পরিচিত। লোকটির বিভিন্ন কথায় সন্দেহ জাগলে কিছু প্রশ্ন করার পর প্রমাণিত হলো, সে পাকবাহিনীর চর হিসেবে আমাদের বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য এসেছে। ঘাঁটির ভেতরে তাঁবুর আড়ালে নিয়ে কথা বের করার জন্য তাকে দৈহিক শাস্তি দেয়া হলো। সংবাদ পেয়ে এস.এস.বি ও পুলিশের কর্মকর্তারা এলে হানাদার বাহিনীর এই চরকে তাদের কাছে হস্তান্তর করা হলো। দুপুরে আমার জন্য কমলদা বেশ ভাল খাবারের ব্যবস্থা করলেন। কয়েকজন মিলে সে খাবার খেলাম। কিন্তু বিকেলেও ইনডাক্শনের কোন সঠিক খবর পেলাম না। ৩১ আগস্ট বিকেল পর্যন্ত একইভাবে কাটলো। সন্ধ্যার আগে কাউনিয়ার কুদ্দুসকে সাথে নিয়ে দিনহাটা শহরে বের হলাম। ঘুরতে ঘুরতে ভবানী সিনেমা হলের সামনে এসে "এক নান্নি মুন্নি লাড়কি থা" হিন্দি ছবির পোস্টারটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। এমন সময় একটি লোক এসে আমার সাথে করমর্দন করে পরিচয় দিলেন, তিনি সিনেমা হলের ম্যানেজার। প্রায় জোর করেই তাঁর অফিসে নিয়ে আমাদেরকে বসালেন। ভুরুঙ্গামারী মুক্ত থাকাকালে তিনি আমাদের ঐ হেড কোয়ার্টারে গিয়ে আমাকে দেখেছেন এবং কয়েকদিন আগে আমাদের একটি অভিযানের সাফল্যের খবর পত্রিকায় পড়েছেন বলে তিনি জানালেন। খুব আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি আমাদের দু'জনের সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। সিনেমা অর্ধেক দেখার আগেই এস.এস.বি–এর এক সদস্য এসে ঐ মুহূর্তে ঘাঁটিতে যেতে বললো। এসে দেখি মেজর রেড্ডি, ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী ও উত্তরাঞ্চলীয় বি.এল.এফ. উপ–আঞ্চলিক প্রধান মনিরুল ইসলাম [মার্শাল মণি] ঘাঁটিতে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি বিব্রত বোধ করছিলাম। মেজর রেড্ডি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "মিঃ জামান নাথিং টুবি ওরিড, লেটস মুভ। আজ রাতেই ইনডাক্শন হবে।" জানলাম, ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ি, লালমনিরহাট ও উলিপুর থানার চারটি দল দু'টি রুটে, যথা নাজিরহাট–মইদাম–ভুরুঙ্গামারী এবং গীতালগহ–ফুলবাড়ি–সিনাই রুটে ইনডাক্শন করা হবে। আমরা ওখড়াবাড়ি এস.এস.বি ক্যাম্পে এসে রাতের খাবার খাচ্ছি, এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি

নামলো। আজ রাতে শুধু নাজিরহাট-মইদাম-ভুরুঙ্গামারী রুটে ইনডাকশন করার প্রস্তাব দিলাম। মেজর রেড্ডি আমার প্রস্তাব সমর্থন করলেন। গাড়ির সামনে মেজর রেড্ডি ও আমি। বৃষ্টির মধ্যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। নাজিরহাট যাওয়ার রাস্তার মোড়ে আমরা গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। এখান থেকে পাঁচ/ছয় মাইল কাঁচা কর্দমাক্ত রাস্তা। ছোট নাজিরহাট এবং নাজিরহাট থেকে তিন-চার মাইল পায়ে হেঁটে সীমান্ত অতিক্রম করে মাইদামস্থ ঘাঁটিতে যেতে হবে। মেজর রেড্ডি ও অন্যান্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পথ হেঁটে নাজিরহাট পৌছেই গাইড ফরমান ও খবিরকে ডাকলাম। ওরা প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। আবার পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পথ হেঁটে ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে রাত তিনটায় আমাদের ঘাঁটি মইদামে এসে পৌছলাম। ভেজা কাপড় ছেড়ে সবার সাথে কথা বলতে বলতে রাত ফর্সা হয়ে আসলো। চিঁড়া ভিজিয়ে নাস্তা খাওয়াশেষে বি.এল.এফ. সদস্যদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দিনহাটা এস.এস.বি ঘাঁটিতে ফিরে এলাম। মেজর রেড্ডি ও উপ-আঞ্চলিক অধিনায়ক মণি ভাই আমার অপেক্ষায় ছিলেন। আজ পয়লা সেপ্টেম্বর, আজ রাতেই গীতালদহ-ফুলবাড়ি-সিনাই রুটে ফুলবাড়ি, লালমনিরহাট ও উলিপুরের বি.এল.এফ সদস্যদের ইনডাকশনের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা হলো।

রাত এগারোটায় একইভাবে এস.এস.বি-এর গাড়িতে আমরা গীতালদহ এসে পৌছলাম। আজ শুভ্রাংশু বাবুকে সাথে নিয়ে এসেছি। করলা সীমান্ত দিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। কখনও কাঁচা পথে, কখনও গরু গাড়িতে চেপে ভাঙ্গাচোরা রাস্তা দিয়ে। আকাশে ঘন কালো মেঘ, বৃষ্টি নেই। তবে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সামনে-পেছনে কোন কিছু দেখা যাচ্ছিল না। জঙ্গলের ভেতর খালের পাড় দিয়ে অবশেষে রাত আড়াইটায় বালাহাট ঘাঁটিতে পৌছলাম। গাইড আমজাদ হোসেন ও আমীর আলী আমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। বাকি রাত এবং পরের দিন এখানে সবাই এক সাথে কাটালাম। রাতের অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে সবাইকে প্রস্তুত হতে বললাম। ধরলা নদীর পাড়ে চরের মধ্যে কবির মামুদ গ্রামের ঘাঁটির উদ্দেশ্যে রাত দশটায় আমরা এগিয়ে চললাম। ঘন অন্ধকার। ধানক্ষেত ও বাঁশের ঝোপের মধ্য দিয়ে সরু আঁকাবাঁকা পায়েচলাপথে কাদা-পানি ভেঙে দ্বিপ্রহর রাতে ঘাঁটিতে এসে উঠলাম। এই ঘাঁটিতে এক দু'দিন অপেক্ষা করে সুযোগ মত লালমনিরহাট ও উলিপুরের বি.এল.এফ. সদস্যরা ধরলা নদীর অপর পাড় চৌকাল ঘাট দিয়ে গাইডদের সাথে করে নিজ নিজ অবস্থানে চলে যাবে। ফুলবাড়ির বি.এল.এফ. সদস্যরা এই মুক্ত এলাকার ঘাঁটিতে অবস্থান করবে। প্রয়োজন অনুযায়ী অগ্রবর্তীদেরকে সহায়তা করবে। তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে শুভ্রাংশু বাবুকে নিয়ে দিনহাটার ঘাঁটিতে ফিরে আসা এবং এস.এস.বি অফিস থেকে শিলিগুড়ি এবং পাঙ্গা হেড কোয়ার্টার ইনডাকশন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি প্রেরণ করলাম। বি.এল.এফ সদস্যরা গ্রামপর্যায় থেকে যুবকদের বাছাই করে অস্ত্র ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ দেবে এবং সেল ও সাব-সেল গঠন করে সংগঠন গড়ে তুলবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের তালিকা প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রের চাহিদা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে। অস্ত্রের চাহিদাসহ বিস্তারিত

খবর হেড কোয়ার্টারকে জানানো হবে এবং অস্ত্রপ্রাপ্তির পর তা তাদের স্ব স্ব দলের অর্থাৎ থানা বি.এল. এফ ইউনিটের কাছে প্রেরণ করা হবে। এইসব অস্ত্র তারা প্রশিক্ষণ-প্রাপ্তদের মধ্যে বিতরণ করবে। বি.এল.এফ সদস্যরা সুযোগমত হানাদার বাহিনীকে আক্রমণ এবং শত্রুদের যাতায়াত ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেবে। এছাড়া মহকুমা ও জেলা কমান্ডারদের নির্দেশমত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করবে। কারো চিকিৎসার প্রয়োজন হলে মহকুমা কমান্ডারকে জানাবে এবং তাঁর অনুমতিসাপেক্ষে ভারতে এসে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের এক পর্যায়ে আমরা এই এলাকায় সমাজ-বিরোধী তথা গরু চোর ও ড্াকাতদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করি। ইয়াহিয়া খানের সামরিক আইন জারির পর আমাকে গ্রেফতার করে বিশেষ সামরিক ট্রাইবুনালে বিচার করা হয়। সে কথা এর আগে উল্লেখ করেছি। বিচারকালে কিছু ডাকাত আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। আমরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করলে এই এলাকার সমাজ-বিরোধী ডাকাতরা জীবনের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে মুনসুর, গেদা ও রহমানসহ কয়েকজন ডাকাত সোনাহাট ঘাঁটিতে আত্মসমর্পণ করে জীবন ভিক্ষা চায়। আর কোনদিন চুরি-ডাকাতি কিংবা অন্যায় কাজ করবে না বলে অঙ্গীকার করে । এই অঙ্গীকার করার পর সোনাহাট ঘাঁটিতে রান্নার কাজে তাদেরকে নিয়োগ করলাম। কিছুদিন পর সোনাহাট বি.এস.এফ হাবিলদার এল. দত্ত এদের দশ-বারোজনকে অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণ দেয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বি.এস.এফ হাবিলদার এল. দত্তের আনুকূল্য পেয়ে এই দল মুক্ত এলাকাসহ অন্যান্য এলাকায় ডাকাতি, লুণ্ঠন ও ব্যাপক রাহাজানি শুরু করে। এদের অত্যাচারে এই সব এলাকার মানুষ অতিষ্ট হয়ে পড়ে। এই সব অত্যাচার থেকে তাদেরকে বিরত রাখার জন্য বি.এস.এফ কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু এল. দত্ত কর্মকর্তাদের নানাভাবে বুঝিয়ে নিবৃত্ত রাখেন। বি.এস.এফ-এর কারণে মুক্তিযোদ্ধারা এইসব দুষ্কৃতকারীকে বিরত রাখার, নির্মূল করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। তাই বাধ্য হয়ে বি.এল.এফ সদস্যদের প্রতি এই এলাকায় অতি দ্রুত সংগঠন তৈরি এবং গোপনে এদেরকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করলাম। মইদামে অবস্থানরত কিছুসংখ্যক বি.এল.এফ সদস্য পাগলাহাট দিয়ে দুধকুমার নদী পার হয়ে সোনাহাট আসে। ভুরুঙ্গামারী থানা বি.এল.এফ কমান্ডার হায়দার ও সদস্য ওসমানকে সোনাহাট বি.এস.এফ গ্রেফতার করে। এই সংবাদ আমি সঙ্গে সঙ্গে এস.এস.বি ক্যাপ্টেন ব্যানার্জীকে জানালাম এবং পাঙ্গা হেড কোয়ার্টার ও শিলিগুড়ি এক নম্বর মিলিটারি হেড কোয়ার্টারে মেজর রেড্ডির কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ওয়্যারলেস মারফত সংবাদ প্রেরণ করলাম। হায়দার ও ওসমানকে ছেড়ে দিয়ে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য শিলিগুড়ি মিলিটারি হেড কোয়ার্টার থেকে সোনাহাট বি.এস.এফকে নির্দেশ দেয়া হলো।

কয়েকদিনের মধ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বি.এল.এফ গেরিলা সদস্যরা সবার অলক্ষ্যে ডাকাত মনসুর ও রহমানকে পাটেশ্বরী পুলের কাছে নদীর পারে, বলদিয়া রাস্তার

পাশে বাঁশের জঙ্গলের মধ্যে সুনীল ও গেদাকে এবং পরে অন্য তিনজন দুষ্কৃতকারীসহ মোট সাতজনকে হত্যা করে। এই ডাকাতদের হত্যা করার ফলে এই বিস্তীর্ণ মুক্ত অঞ্চলে ডাকাতি, লুণ্ঠন, রাহাজানি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। এদের হত্যা করার কারণে হাবিলদার এল. দত্ত ও কিছুসংখ্যক বি.এস.এফ সদস্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করার প্রচেষ্টা চালায়। আমি শিলিগুড়ি মিলিটারি হেড কোয়ার্টারে মেজর রেড্ডিকে বিষয়টি অবগত করলাম। ভারতীয় সামরিক ও বি.এস.এফ-এর পদস্থ কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে অল্পদিনের মধ্যে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেল। হাবিলদার এল. দত্তকে শাস্তি প্রদান করে সোনাহাট বি.এস.এফ থেকে অন্যত্র বদলি করা হলো।

চব্বিশ

কাঁঠালবাড়ির নৃশংসতা

কুড়িগ্রাম মুসলিম লীগ নেতা ও পাঞ্জাবিদের দালাল পনিরউদ্দিন আহমেদের পুত্র তাজুল ইসলাম চৌধুরী মুক্ত এলাকা থেকে পালিয়ে কুড়িগ্রাম এসে পাকবাহিনীর সাথে মিলিত হয়, এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তাজুল ইসলাম পাক নরপশুদের সাথে নিয়ে কুড়িগ্রাম, কাঁঠালবাড়িসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিরীহ মানুষের ওপর বর্বর অত্যাচার শুরু করে। কাঁঠালবাড়ি এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি আছে জানতে পেরে পাকবাহিনীকে সাথে নিয়ে তাজুল ইসলাম এই এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করে। বহু লোককে ধরে বেঁধে অকথ্য নির্যাতন করে আর মুক্তিযোদ্ধারা কোথায়, সে কথা জনতে চায়। শুধু তাই নয় কাঁঠালবাড়িতে ওয়ারেসদের বাড়িসহ দু'টি গ্রামের বাড়ি-ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। প্রায় আশিজন মানুষকে হত্যা করে। শিশু, মহিলা, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগিও এই নরপশুদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। কেউ প্রাণভয়ে চলে যেতে থাকলে তাকেও গুলি করে হত্যা করে। পাঞ্জাবি নরপশুদের হাজার পৈশাচিক নির্যাতন সত্ত্বেও কেউই মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেনি।

বড় বাড়ির হত্যাকাণ্ড

মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয়ার অজুহাতে পাকবাহিনী বড়বাড়ি আক্রমণ করে এবং বড়বাড়িসহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের বাড়িঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভিটে শূন্য করে দেয়। গাছপালা পর্যন্ত আগুনে পুড়ে লাল হয়ে যায়। বৃদ্ধ, শিশু, মহিলা, জীবজন্তু, বাড়ি ঘর থেকে বের হতে না পেরে আগুনে পুড়ে করুণ মৃত্যুবরণ করে। এখানে অনেক নারী-পুরুষ ও শিশুকে নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করা হয়। তাদের মধ্যে বড়বাড়ি হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব আবুল কাসেম বি.এসসিকে এই নরপশু বর্বর পাকবাহিনী ধরে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে তাঁর চোখ দু'টি উপড়ে নেয়।

বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে ক্ষতাক্ত করে মুক্তিযোদ্ধারা কোথায়, জানতে চায়। এইভাবে বর্বরতম অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েই তাকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করে। এত নির্মম নির্যাতন চালানোর পরও তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের কোন তথ্য প্রকাশ করেননি। মৃত্যুর আগে বর্বর পশুদেরকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, "আমার এই রক্তের বিনিময়ে বাঙালিরা পাবে স্বাধীন বাংলাদেশ, জয়বাংলা।" অন্তিম এই উচ্চারণ করে দেশপ্রেমিক সর্বজনশ্রদ্ধেয় সমাজ সেবক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শহীদ মোখতার এলাহী

সেক্টর কমান্ডার উইং কমান্ডার এম. কে. বাশার সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আমাকে জানালেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া গেছে, কর্নেল এরশাদ পাকিস্তান থেকে রংপুর এসেছেন। রংপুর শহরে নিউ সেনপাড়ায় কর্নেল এরশাদের বাড়ি। কর্নেল এরশাদের সাথে যেকোনভাবে হোক যোগাযোগ করে তাঁকে ভারতে নিয়ে আসতে হবে। এই দায়িত্ব দেয়া হলো আমাকেই।

এ সময় রংপুর ও কাউনিয়ার বি.এল.এফ সদস্যদের ইনডাক্শন হবার কথা। গীতালদহ-বালাহাট-ফুলবাড়ি-সিনাই-নজিম খাঁ-খেত্রাই রুটে তিস্তা নদী পার হয়ে সুন্দরগঞ্জ, কাউনিয়া, মীরবাগ, হারাগাছ ও রংপুর পর্যন্ত তারা অগ্রসর হবে এবং এই সব স্থানে অবস্থান নেবে। তিস্তা অপর পারে মোখতার এলাহী গাইড হিসেবে বি. এল. এফ. সদস্যদের সাথে থাকবে। রংপুর শহরের নিউ সেনপাড়ায় মোখতার এলাহীর বাড়ি এবং কর্নেল এরশাদের পরিবারের সাথে তাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। স্থির হয়েছে কর্নেল কোথায় কোন্ অবস্থায় রয়েছেন, সে সম্পর্কে জানতে হবে, আর যদি তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হন, তবে সুযোগ সুবিধা মত তাঁকে নিয়ে আসতে হবে। তাঁর সাথে যোগাযোগ করাসহ তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ প্রেরণ করার দায়িত্ব আমি মোখতার এলাহীকে প্রদান করলাম। প্রয়োজন হলে তাঁকে নিয়ে আসার জন্য আমি সব ধরনের ব্যবস্থা করবো, এও তাকে বললাম।

মোখতার এলাহী ও কুদ্দুসসহ বি.এল.এফ সদস্যের তিনটি দলের মোট বিশজনকে নিয়ে বালাহাট ফুলবাড়ি দিয়ে চৌকাল ঘাট বরাবর ধরলা নদী পার হয়ে আমরা আমাদের সিনাই ঘাঁটিতে পৌছলাম। এখানে একদিন অবস্থানের পর আমাদের গাইড দিয়ে মোখতার এলাহী এবং তাঁর দলকে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সিদ্ধান্ত হলো, মোখতার এলাহী পাঁচদিনের মধ্যে ফিরবে এবং এ সময় আমি সিনাই ঘাঁটিতে অবস্থান করবো।

পাকিস্তানী নরপশুরা তাদের অপকর্মের দোসর ভেতরবন্ধের খন্দকার শামসুল হক মৌলানাকে চেয়ারম্যান করে কুড়িগ্রাম শান্তি কমিটি গঠন করেছে। কুড়িগ্রাম শহরের সবুজ পাড়ার অতুল চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে শান্তি কমিটির অফিস স্থাপিত হয়েছে। অতুল চৌধুরী বাড়ি-ঘর ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। মোখতার এলাহী চলে যাওয়ার পর এই শান্তি কমিটির অফিস অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। দশজন করে তিনটি দলের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হলো। রাত ন'টায় ধরলা নদীর পার বরাবর হেঁটে কুড়িগ্রাম

অভিমুখে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। নেফার দরগা এসে নদীর পারের নিচ দিয়ে খলিলগঞ্জ হাতের ডানে রেখে কুড়িগ্রাম শহরের পশ্চিমে হরিকেশ ও শহর কেন্দ্রের খালের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে একটি দল হরিকেশ থেকে শহরে প্রবেশের একমাত্র রাস্তার উত্তরে খালের কোনায়, অন্যদল রাস্তার পার ঘেঁষে দক্ষিণ পাশে অবস্থান গ্রহণ করলো। রাত দেড়টায় পাঁচজনের প্রত্যেককে দু'টি করে গ্রেনেড দিয়ে এবং অপর পাঁচজনকে নিয়ে শহর ঘেঁষে রাস্তার ছোট কালভার্টের নিচে শহরের প্রবেশমুখে অবস্থান নিলাম। গ্রেনেডসহ পাঁচজন রুকু ও তাতুদের বাড়ির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে আম, সুপারি ও নারিকেল গাছের নিচ দিয়ে অতুল চৌধুরীর বাড়ির সামনের রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ালো। আলো নেই, রাস্তা জনশূন্য। এই বাড়িতে স্থাপিত শান্তি কমিটির অফিসের নিচতলার কক্ষে হারিকেনের আলো জ্বলছে এবং জনাকয়েক লোক দেখা যাচ্ছিল। দ্রুত রাস্তা অতিক্রম করে তারা চালের কলঘর আড়াল করে খোলা জানালা ও দরজা দিয়ে ভেতরে পর পর তিনটি গ্রেনেড ছুঁড়ে বাকিগুলো অফিসের সামনে এবং পাকা রাস্তার পাশে ফেলে রেখে অতি দ্রুত আমাদের সাথে এসে মিলিত হলো। তিনটি গ্রেনেড বিস্ফোরণের বিকট শব্দে বাড়িঘর কেঁপে উঠলো। গাছের পাখি চিৎকার করে উড়তে থাকে। আমরা ততক্ষণে হরিকেশ ছেড়ে এসে নদীর পারের নিচ বরাবর আমাদের অবস্থানের দিকে ছুটে চললাম। শহরের দিক থেকে মোটরগাড়ি ছোটাছুটি ও থেকে থেকে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। পরে জানা গেল, এই গ্রেনেড অভিযানে দু'জন নিহত এবং শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান শামসুল হক খন্দকার সামান্য আহত হয়েছে।

এরপর তিনদিন ধরে আমাদের বিভিন্ন ঘাঁটির সাথে পূর্ণ যোগাযোগ করা ও খবরাখবর নেয়া হলো। ছ'দিন পর মোখতার এলাহী তার দু'জন সাথীসহ রংপুর থেকে ফিরে গভীর রাতে বড়বাড়ির কাছে এক বাড়িতে আশ্রয় নেয়। মোখতার এলাহীর আশ্রয় নেয়ার খবর পাকবাহিনীর চর রাতেই লালমনিরহাটের দখলদার বাহিনীকে জানায়। শেষ রাতে পাকবাহিনী বড়বাড়ি ঘিরে ফেলে। মোখতার এলাহীর সহযোদ্ধা দু'জন পালিয়ে আসতে সক্ষম হলেও মোখতার এলাহী নরপশুদের হাতে ধরা পড়লো। এই দেশপ্রেমিক বীর সন্তান, ছাত্রনেতা ও সংগঠককে সারা রাত ধরে নরপশুরা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সমগ্র শরীর ছিন্নভিন্ন করে নারকীয় নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে ফেলে রেখে চলে যায়। এই দিন খলিলগঞ্জ অপারেশন করার পরিকল্পনা করছিলাম। দীর্ঘদিনের সাথী, কারমাইকেল কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের অতিপ্রিয় মোখতার এলাহীর মর্মান্তিক ও পৈশাচিক হত্যাকান্ডের খবর পেয়ে আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। ভাবতে পারছিলাম না এই শান্ত নিরহঙ্কার সাথীকে আর কোনদিন পাশে পাব না। গভীর দুঃখ নিয়ে আমরা দু'টি দলে ভাগ হয়ে বড়বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম। বড়বাড়ির পুবে কুড়িগ্রাম-লালমনিরহাট সড়কের পাশে ডাকবাংলোর নামক স্থানে প্রাইমারী স্কুলের পূর্বপ্রান্তে স্থানীয় সাধারণ মানুষ মোখতার এলাহীর দাফনের ব্যবস্থা করেছে। আমরা এখানে পৌঁছে অতিদ্রুত আমাদের প্রাণপ্রিয় সাথী সহযোদ্ধাকে চিরবিদায় জানালাম। বেয়নেট দিয়ে খোঁচানো শহীদ মোখতার এলাহীর শতছিদ্র গেঞ্জিটি নিয়ে এসে সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টরে

অবস্থানরত নেভীর সদস্য মঞ্জুর এলাহীর হাতে তুলে দিলাম। রক্তমাখা ছিদ্র গেঞ্জি বুকে চেপে ধরে মঞ্জুর এলাহী মর্মস্পর্শী প্রাণ ফাটানো কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হলো।

পরে জেনেছিলাম মোখতার এলাহী রংপুর পৌঁছে বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে কর্নেল এরশাদ নাকি রংপুর এসেছেন। মোখতার এলাহী তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোন ক্রমেই কর্নেলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

শহীদ আব্দুল খালেক

আব্দুল খালেক [পিতা : আদির শেখ, গ্রাম : বানুরকুটি, বলদিয়া ইউনিয়ন, থানা : ভুরুঙ্গামারী] অত্যন্ত গরীব ও সাধারণ ঘরের ছেলে। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর গরীব হওয়ার কারণে তার পক্ষে আর লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। জীবনধারণের তাগিদে অন্যের বাড়িতে তাকে কাজ গ্রহণ করতে হয়। দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই কিশোর ঘর ছেড়ে আমার ছোট ভাই আলমের সাথে ট্রেনিং গ্রহণের জন্য ঝাউকুটি যুব শিবির হয়ে টাপুরহাট শিবিরে যায়। এখানে ট্রেনিং গ্রহণের জন্য ওরা মনোনীত হয়। শামছুল হক চৌধুরী এম.পি.এ আমার ঘাঁটিতে এসে ওদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হওয়ার কথা জানালেন। আমাদের ঘাঁটিসমূহে সমবেত কম বয়সের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে খুব একটা অপারেশনে নিয়ে যাওয়া হতো না। তাদেরকে ক্যাম্প পরিচ্ছন্ন, অস্ত্র পরিষ্কারসহ অনবিধ কাজ ও ক্যাম্প নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হতো। আমি ভাবলাম, ট্রেনিং গ্রহণশেষে হয়তো ওরা আমাদের এই এলাকায় আসবে। কিন্তু প্রশিক্ষণ নেয়ার পর আলম নীলফামারী ও খালেক হাতিবান্দা এলাকায় যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়লো।

বুড়িমারীতে আমাদের শক্ত অবস্থান। ওদিকে পাক দখলদার বাহিনী হাতীবান্দায় ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। হাতীবান্দা থেকে তারা সবসময় ভারি অস্ত্রের যেমন কামান, ছাব্বিশ ইঞ্চি মর্টার ও এইচ.এম.জি দিয়ে আমাদের অবস্থানের ওপর প্রচন্ড গুলিবর্ষণ করে। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা জবাবে আঘাতের পর আঘাত হেনে শত্রুতে পর্যুদস্ত করতে থাকে। এমনি এক অভিযানে মুক্তিযোদ্ধারা হাতীবান্দায় পাকবাহিনীকে দুই দিক থেকে ঘিরে ফেলে। পাকা বাঙ্কারের ভেতর থেকে পাকবাহিনী এইচ.এম.জি দিয়ে বিরামহীনভাবে গুলি চালাচ্ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা অগ্রসর হতে পারছিল না। ফলে অসুবিধায় পড়ে গেল। খালেক এই বিপজ্জনক অবস্থায় ক্রলিং করে এইচ.এম.জি পোস্টের কাছে গিয়ে বাঙ্কারের ভেতর পর পর দু'টি গ্রেনেড ছুঁড়ে এইচ.এম.জি-কে স্তব্ধ করে দিল। পাকবাহিনী এবার তিনদিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেলে। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা যে যার মত সুবিধাজনক স্থানে সরে যায়। খালেক শত্রুদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেলে অনিবার্য মৃত্যুর মুখেই নিজের এস. এল. আর দিয়ে গুলি ছুঁড়ে পাঁচ-ছ'জন হানাদারকে হত্যা করে এক পর্যায়ে শত্রু বাহিনীর এক ঝাঁক গুলি এসে বাংলার এই দেশপ্রেমিক দামাল ছেলের শরীরে বিদ্ধ

হয়। আহত অবস্থায়ই খালেক শত্রু বাহিনীর হাতে ধরা পড়লো। নরপিশাচ শয়তানরা বর্বরতার সীমা লংঘন করে জীপের পেছনে খালেককে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে হিঁচড়ে হত্যা করে। বীর যোদ্ধা খালেক তাঁর লাল রক্তে বাংলার মাটি সিক্ত করে শহীদের বেশে আমাদের ছেড়ে চলে গেল অনন্তলোকে।

ক্যাপ্টেন দেলোয়ারের নির্দেশ

ফুলবাড়িতে অবস্থানরত বি.এল.এফ সদস্যরা সেল ও সাব-সেলের এবং অন্যান্য দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদন করে যাচ্ছিল। কিন্তু গীতালদহে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন দেলোয়ার তাদেরকে ধরে নিয়ে আসার জন্য এফ.এফ-এর একটি দল প্রেরণ করে। বি.এল.এফ ও এফ.এফ উভয়ের মধ্যে যাতে কোন সংঘর্ষ বা সমস্যার সৃষ্টি না হয়, আমি আগে থেকেই এর সঙ্গতিপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলাম। ক্যাপ্টেন দেলোয়ারের নির্দেশে আগত এফ এফ দল বাধ্য হয়ে তাই ফুলবাড়ির বালাহাটে যায়। এফ.এফ ও বি.এল.এফ সদস্যদের মধ্যে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে শুধু লতিফকেই একটি ৭.৬২ রাইফেলসহ গীতালদহে নিয়ে আসা হলো। ক্যাপ্টেন দেলোয়ার লতিফকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে। লতিফ তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করে সব কিছু অবগত হতে বলে। লতিফকে মারতে উদ্যত হলে উপস্থিত এফ.এফ সদস্যরা বাধা প্রদান করে এবং এ ধরনের কাজ থেকে ক্যাপ্টেনকে বিরত থাকতে বলে। ক্যাপ্টেন দেলোয়ার প্রথমে সাহেবগঞ্জ গিয়ে আমাকে না পেয়ে রাত দশটার পর বৃষ্টির মধ্যে আমাদের নিয়ে আসা কুড়িগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের গাড়িতে পেছনে বসিয়ে ছ'জন এফ.এফ-এর পাহারায় লতিফকে নিয়ে দিনহাটা আসে। লতিফকে নিয়ে ক্যাপ্টেন উভয় সঙ্কটে পড়ে যায়। দিনহাটাস্থ কুড়িগ্রাম বি.এল.এফ প্রধান ঘাঁটিতে না এসে তাকে নিয়ে যায় দিনহাটা থানায় সোপর্দ করতে। থানার সম্মুখে গাড়ি দাঁড় করানোর পর দেখা গেল ছয়জন পাহারা থাকা সত্ত্বেও তার মধ্য থেকেই লতিফ নেই, হাওয়া হয়ে গেছে। উপায় না দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ক্যাপ্টেন বি.এল.এফ ঘাঁটিতে ফিরে আসে। আমি সন্ধ্যার আগে এখানে এসেছি এবং এ সময় ঘাঁটিতে তাঁবুর মধ্যে কয়েকজনের সাথে কথা বলছিলাম। ঝম্‌ঝম্ করে মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছিল। ক্যাপ্টেন দেলোয়ারের গাড়ি গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি ক্যাপ্টেনসহ সবাইকে ভেতরে আসতে বললাম। লতিফ সম্পর্কে তাঁর কাছে সব শুনে আমি ক্ষেপে গিয়ে তাকে বললাম, "আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ যার যার অবস্থান থেকে যে যতটুকু পারে, সেইভাবে চালিয়ে যাবে, তাতে আপনার অসুবিধাটা কোথায়? নিজের দায়িত্ব পালন করুন। প্রয়োজন মনে করলে বাংলাদেশ সরকারকে অবগত করুন। এখন লতিফকে পাওয়া না পাওয়ার ওপর আপনার ভালমন্দ নির্ভর করছে।" আমি তাঁকে সাথে নিয়ে ক্যাপ্টেন ব্যানার্জীর বাংলোতে গেলাম। বি.এল.এফ-এর সাথে কোন সংঘর্ষে না যাওয়ার এবং যেভাবেই হোক তিনদিনের মধ্যে লতিফকে ফিরিয়ে দিতে বলে ক্যাপ্টেন দেলোয়ারকে বিদায় দেয়া হলো। পরদিন সমস্ত বি.এল.এফ ঘাঁটিতে সংবাদ প্রেরণ করা হলো যেন লতিফকে পাওয়ার সাথে সাথে আমার কাছে

পাঠানো হয়। পাঙ্গা হেড কোয়ার্টার ও শিলিগুড়ি মিলিটারি হেড কোয়ার্টারে লতিফের বিষয়ে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করা হলো। তিনদিন পর ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী ও আমি গীতালদহ গেলাম। ক্যাপ্টেন দেলোয়ার জানালেন, লতিফের অনেক খোঁজ করা হয়েছে ; কিন্তু তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বললাম, এই মুহূর্তে লতিফকে ফিরিয়ে দিতে হবে। ক্যাপ্টেন কিছুই বলতে পারছিল না। তিনি ভাবতে পারেননি এমন অসুবিধায় তাকে পড়তে হবে। ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী ও গীতালদহে অবস্থানরত ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন শম্ভুর মধ্যস্থতায় ক্যাপ্টেন দেলোয়ারকে আরো কয়েকদিন সময় দেয়া হলো।

কয়েকদিন পর ক্যাপ্টেন ব্যানার্জীর সাথে আলোচনা করে লতিফের নিখোঁজ সংবাদ পাঙ্গা ও শিলিগুড়িতে প্রেরণ করে বি.এল.এফ ঘাঁটিতে ফিরে এসে লতিফকে বসা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। লতিফকে থানায় সোপর্দ করতে নিয়ে যাওয়ার সময় দিনহাটা থানার কাছে মোড় ফেরার জন্য গাড়ির গতি কমে আসলে হাত বাঁধা অবস্থায়ই লাফিয়ে পড়ে এবং অন্ধকার ও বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে রেললাইনের কাছে এসে অনেক কষ্টে রেললাইনের সাথে হাতের বাঁধন ঘষে ঘষে খুলে ফেলে। পরে এখান থেকে হেঁটে বাসস্ট্যান্ডে আসে। বাসে চেপে সাহেবগঞ্জ নেমে রাতেই চৌধুরীহাট দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ফুলবাড়ি এলাকায় আত্মগোপন করে এবং অন্য বি.এল.এফ সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে সব সংবাদ জেনে লতিফ আমার কাছে চলে আসে। লতিফকে পাওয়ার খবর পাঙ্গা ও শিলিগুড়িতে ওয়্যারলেস মারফত প্রেরণ করা হলো। পরদিন ক্যাপ্টেন ব্যানার্জীসহ লতিফকে গীতালদহে নিয়ে এসে অস্ত্রসহ কয়েকজন এফ.এফ-এর সাথে পাঠিয়ে দেয়া হলো। যাওয়ার সময় লতিফের পিঠ চাপড়ে ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী বললেন, "তুম্ রিয়েল গেরিলা ফাইটার! জয় বাংলা আজাদ করনেকা লিয়ে এইসাহি গেরিলা ফাইটার জরুরাত হ্যায়। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, ইন্দিরা মাইকী জয়।"

ভুরুঙ্গামারী কলেজ আক্রমণ

পাকবাহিনী ভুরুঙ্গামারী কলেজে শক্ত ঘাঁটি তৈরি করে অবস্থান নিয়েছে। এখানে একজন মেজরসহ হানাদার বাহিনীর কয়েকজন অফিসারও আছে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে দখলদার বাহিনীর কলেজের এই ঘাঁটিতে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তিনটি দল প্রস্তুত করা হলো। সিদ্ধান্ত হলো দু'টি রেইড পার্টি নিয়ে কলেজ রেইড করা হবে। অপর দলটি নিয়ে ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ মর্টার ও এম.এম.জি ইত্যাদি অস্ত্রের সাহায্যে আমাদের রেইড পার্টিকে কভারিং ফায়ার দেবে। ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ তার দল নিয়ে সাহেবগঞ্জ থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে ভোটহাট ও মানিককাজী দিয়ে এসে সোনাতলার পুবে অবস্থান নেবে। আমরা একই পথে সোনাতলা থেকে দু'টি দলের প্রথম দল কলেজের দক্ষিণ পাশ দিয়ে এসে পুবদিক এবং দ্বিতীয় দল দক্ষিণ থেকে এসে কলেজে অবস্থানরত দস্যু বাহিনীর ওপর ঝটিকা আক্রমণ করবো। কথা হলো হানাদার বাহিনীর ঘাঁটিতে অভিযান ও পর পর দু'বার এল.এম.জি থেকে ব্রাস ফায়ার করার

সাথে সাথে ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ কলেজের দক্ষিণ–পশ্চিম কোণ তার সোনাতলা অবস্থান থেকে উত্তর–পূর্ব কোণ বরাবর কভারিং গোলাবর্ষণ করতে থাকবে। প্রস্তুত হয়ে যাত্রা শুরু করার আগে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ব্রিফ করা হলো। পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যাপ্টেন নওয়াজিশের দল রওয়ানা হওয়ার আগেই আমরা সীমান্ত ও ফুলকুমার নদী অতিক্রম করে আমাদের লক্ষ্যস্থল অভিমুখে অগ্রসর হলাম। অন্ধকার, কাদা–পানি ভরা ক্ষেতের আল, বাঁশ–ঝোপ, ছোট ছোট জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমরা কলেজের কাছে এসে ক্ষেতের আলের পাশে পাশে ক্রলিং করে কলেজের পূর্বদিকে ক্ষেতের আলের পাশে কাদা–পানির মধ্যে শুয়ে পড়লাম। অপর দল একইভাবে কলেজের দক্ষিণ পাশে অবস্থান গ্রহণ করলো। চারদিকে, বিশেষ করে উত্তর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে কলেজের পুব পাশের পুকুরের পূর্ব–দক্ষিণ কোণায় পাকবাহিনীর এইচ.এম.জি পোস্টে বাঙ্কারের প্রতি দু'জন ও পুকুরের উত্তর–পূর্ব কোণায় দু'জন ক্রলিং করে গিয়ে এক সাথে পর পর তিনটি গ্রেনেড ছুঁড়ে এইচ.এম.জিসহ বাঙ্কার উড়িয়ে দেয়া হলো। এই সাথে দু'বার এল.এম.জি'র ব্রাস ফায়ার করে পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে প্রচন্ড গুলিবর্ষণ করতে করতে আমরা পুকুরের ভেতরের পাড়ে এবং কলেজের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আমাদের আকস্মিক আক্রমণে কলেজে অবস্থানরত হানাদার বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। কয়েকজন শত্রু–সেনা গুলি ছুঁড়ে এই আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের তড়িৎ–তীব্র আক্রমণে শয়তানরা নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কলেজের মধ্যে নরপশু পাঞ্জাবিদের অনেকগুলো লাশ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, আহত হয়ে কয়েকজন কাতরাচ্ছে দেখা গেল। কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ কভারিং ফায়ার দিল না। এবার কলেজের উত্তরে বাজারের দিক থেকে প্রচন্ড শেলিং ও গুলিবর্ষণ করতে করতে পাকবাহিনী অগ্রসর হতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা কলেজের ভেতর শত্রুদের অবস্থান খুঁজে খুঁজে দেখছিল। শত্রু বাহিনী গুলিবর্ষণ ও কলেজের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে সাথে সাথে সবাইকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কলেজের পশ্চিম–দক্ষিণ বরাবর যার যার পথে দ্রুত চলে যেতে নির্দেশ দেয়া হলো। কলেজ ত্যাগ করার সময় কয়েকটি চায়নিজ স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও এল.এম.জিসহ সামনে যা পাওয়া গেল নিয়ে নেয়া হলো। প্রায় সবাই নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছে। আমরা কয়েকজন পেছনে পড়ে গেলাম। কলেজের উত্তর দিক থেকে এবার শত্রু বাহিনী আমাদেরকে প্রায় ঘিরে ফেললো। বৃষ্টির মত গুলি ও মুহুর্মুহু শেল সশব্দে ফেটে মাটি ছিটকে পড়ছিল। কলেজের মাঠের পশ্চিম পাশে বাঁশের ঝোপের ভেতর আমরা ড্রাইভ দিয়ে ঢুকে দক্ষিণ–পশ্চিম দিকে ছুটলাম। বাঁশ গাছে গুলি লেগে ফট ফট আওয়াজ হচ্ছিল। আমরা অবিশ্বাস্যভাবে অতি দ্রুত ফুলকুমার নদী অতিক্রম করে পূর্ব নির্ধারিত নিরাপদ জায়গায় সবার সাথে মিলিত হলাম। আমাদেরকে পেয়ে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। আল্লার অশেষ কৃপায় আমাদের শরীরে গুলি বা শেলের আঘাত লাগলো না। অথচ যে অবস্থায় পড়েছিলাম, তাতে স্থির নিশ্চিতভাবে শত্রুপক্ষের গুলি ও শেলের আঘাতে আমাদের শতছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ পরিকল্পিত কভারিং ফায়ার দিলে আমরা নির্বিঘ্নে চলে আসতে সক্ষম হতাম। প্রায় পাঁচ মিনিটের এই ঝটিকা

আক্রমণে একজন মেজরসহ প্রায় ১৫/২০ জন দখলদার নরপশু নিহত ও ১০/১২ জন আহত হয়। বাকিরা ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে জীবন বাঁচায়।

মসজিদ থেকে আযানের সুমধুর পবিত্র ধ্বনি ভেসে আসছে। আমরা তৃপ্ত অনুভূতি নিয়ে ঘাঁটিতে ফিরে আসলাম। ক্যাপ্টেন নওয়াজিশকে সাহেবগঞ্জে দেখা গেল না। জানা গেল, তিনি চৌধুরীহাটে অবস্থান করছেন। দু'দিন পর তিনি সাহেবগঞ্জে ফিরে এলেন। সেক্টর কমান্ডার উইং কমান্ডার জনাব এম. কে. বাশার ও ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জসি ক্যাপ্টেন নওয়াজিশকে তিরস্কার করলেন।

গাগলা অভিযান

গাগলা বাজারের পুব পাশে উত্তর–দক্ষিণ বরাবর লম্বা খালের ওপরে নির্মিত পাকা কালভার্টটি ডিনামাইট দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে। পাকিস্তানী দস্যু বাহিনী গাগলার এই খালের পুব পার পর্যন্ত এসে প্রায়শই ফিরে যায়। খবর পাওয়া গেল, পাকিস্তানী শয়তান চক্র বিহারি ও পাকিস্তানের জেল থেকে সংগৃহীত দুষ্কৃতকারীদের নিয়ে ই. পি. ক্যাফ নামে একটি বাহিনী গঠন করেছে। বাহিনীটির সম্পূর্ণ নাম ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস। রাজাকার বাহিনী ও শান্তি কমিটির সহায়তায় হানাদার নরপশুরা এবং ই.পি ক্যাফ বাহিনী গ্রামেগঞ্জে ও শহরে ধর্ষণ, লুণ্ঠন, হত্যাযজ্ঞসহ নৃশংস সব অত্যাচার চালায়। পাকিস্তানী বাহিনীর সহযোগী বাহিনী হিসেবে ই.পি ক্যাফ ভুরুঙ্গামারী ও নাগেশ্বরীতেও আসে। হানাদার বাহিনী, ই.পি. ক্যাফ ও রাজাকাররা গাগলা এবং পাশের গ্রামগুলোতে প্রায়ই এসে লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার করে চলে যায়। দস্যু বাহিনীকে এখানে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে কোম্পানি কমান্ডার আবুল হকের নেতৃত্বে পঞ্চাশজন মুক্তিযোদ্ধা রাত তিনটায় গাগলার খাল পার হয়ে নাগেশ্বরী–ফুলবাড়ি রাস্তার দু'পাশে উত্তর ও দক্ষিণ বরাবর সুবিধামত কয়েকটি বাড়ির কাছে বাঁশের ঝোপ এবং জঙ্গলের মধ্যে ওঁৎ পেতে থাকে। সকাল দশটার পর পাকবাহিনী ও ই.পি. ক্যাফের দু'টি দল এই পথ ধরে গাগলার দিকে এগিয়ে আসে। ওঁৎ পেতে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের পেছনে রেখে শয়তানরা যেইমাত্র গাগলা খালের পাশে পৌঁছেছে, ঠিক তখনই মুক্তিযোদ্ধারা দু'দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ করে প্রচন্ড গুলিবর্ষণ করতে থাকে। পাক দস্যুরা গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কয়েকজন রাস্তার নিচে নেমে উঁচু রাস্তাকে আড়াল করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গুলি ছুঁড়তে থাকে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচন্ড আক্রমণের তোড়ে টিকতে না পেরে পাক–সেনাদের আক্রমণ বন্ধ হয়ে আসে। এমন সময় নাগেশ্বরী থেকে অগ্রসরমান পাকবাহিনীর অপর দল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা এই আক্রমণ প্রতিহত করে পেছনে সরে খাল অতিক্রম করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসে। কোম্পানি কমান্ডার আব্দুল হকসহ তিনজনের খালের পারে আসতে বিলম্ব হয়। ফলে পাক–সেনারা তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। আব্দুল হকসহ তিনজন লাফ দিয়ে খালের পানির মধ্যে পড়ে কচুরিপানার মধ্যে লুকিয়ে পানির নিচে ডুব দিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা

করতে থাকে। এরপর পাকবাহিনীর সদস্যরা খালের পাড়ে এসে পানির মধ্যে আব্দুল হকদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এদিকে খাল পার হয়ে আসা মুক্তিযোদ্ধারা গাগলা বাজারের উত্তর–দক্ষিণ পাশে অবস্থান নিয়ে পাকবাহিনীর ওপর বৃষ্টির মত গুলি চালাতে লাগলো। আব্দুল হকসহ তিনজন মুক্তিযোদ্ধা কচুরিপানার মধ্যেই লুকিয়ে পানিতে ডুবে ডুবে খালের পাড়ের জঙ্গল দিয়ে সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলিত হলো। মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা আক্রমণ ও গুলিবর্ষণে দস্যু বাহিনী টিকতে না পেরে অবশেষে এই জায়গা ত্যাগ করে এবং পিছু হটে নাগেশ্বরীর দিকে চলে যায়। এই অভিযানে প্রায় ২০/২৫ জন দস্যু সেনা নিহত হয়। তারা পিছু হটে যাওয়ার সময় নিহত নরপশুদের লাশ নিয়ে যায়।

মৃত্যুহত মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় কিশোর আলমগীর ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র হলেও মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের আহ্বানে তাকে ঘরের কোণে মায়ের আদর আটকিয়ে রাখতে পারেনি। বাংলা মায়ের বীর সন্তান শহীদ আবদুল খালেকসহ আলম যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, সে কথা আগেই লিখেছি। কোম্পানি কমান্ডার মাহবুব খানের সাথে আলম নীলফামারী এলাকায় যুদ্ধ করার জন্য হিমকুমারী ঘাঁটিতে আসে। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার হলদিবাড়ির পাশে হিমকুমারী মুক্তিযোদ্ধাদের একটি উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি। পাক দখলদার বাহিনীর দখলকৃত নীলফামারী, ডোমার, ডিমলা, কিশোরগঞ্জ ও জলঢাকা থানা এলাকার ওপর এই ঘাঁটি থেকে মুক্তিযোদ্ধারা আঘাতের পর আঘাত হেনে শত্রু বাহিনীকে নির্মূল করতে থাকে। হানাদার শত্রু বাহিনী জলঢাকায় শক্ত ঘাঁটি তৈরি করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। সীমান্ত থেকে তিন/চার মাইল অভ্যন্তরে জলঢাকা ও ডিমলা এলাকার মধ্যখানে ছাতনাই বালাপাড়ায় পাকবাহিনী ও রাজাকারদের অবস্থান। এ ছাড়া টুনিরহাট, খোকারহাট ও শটিবাড়িতেও হানাদার শত্রু বাহিনীর অবস্থান। ছাতনাই বালাপাড়া প্রাইমারী স্কুলে পাকবাহিনী, স্কুলের পুব পাশের বাড়িতে রাজাকার এবং রাজাকার ক্যাম্পের পেছনে পাকবাহিনীর আরো একটি অবস্থান।

ছাতনাই বালাপাড়ার শত্রু বাহিনীর অবস্থানের ওপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য কোম্পানি কমান্ডার মাহবুব খানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা ৩ নভেম্বর রাতে হিমকুমারী ঘাঁটি থেকে যাত্রা শুরু করে। রাত একটায় প্রাইমারী স্কুলের পাশের খাল অতিক্রম করে মুক্তিযোদ্ধারা স্কুলসহ শত্রুদের অবস্থান তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং প্রচন্ড গুলিবর্ষণ করতে করতে স্কুলের ভেতর ঢুকে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আকস্মিক আক্রমণে শত্রুরা হতভম্ব হয়ে প্রতিরোধ করার সুযোগ হারিয়ে ফেলে। আক্রমণে পাকবাহিনীর স্কুলের এই ঘাঁটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। প্রায় পঁচিশ/ত্রিশজন শত্রু সেনা নিহত ও তাদের ঘাঁটি তছনছ হয়ে যায়। রাজাকাররা তাদের ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই ঝটিকা আক্রমণ চালাতে সামান্য সময় বেশি লাগার ফলে রাজাকার ক্যাম্পের

পেছনের অবস্থান থেকে পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পেছন দিক থেকে ঘিরে ফেলে আক্রমণ ও গুলিবর্ষণ শুরু করে। এল.এম.জি ম্যান ও আলম পাকবাহিনীর প্রতি গুলিবর্ষণ করে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। এই ফাঁকে মুক্তিযোদ্ধারা যার যার সুবিধামত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে সক্ষম হয়। এক পর্যায়ে এল.এম.জি ম্যান ও আলমের এস.এল.আর-এর গুলি শেষ হয়ে আসতে থাকে। এ অবস্থায় শত্রু বাহিনীর চাইনিজ রাইফেলের দু'টি গুলি আলমের কোমরের মধ্য দিয়ে বিদ্ধ হয়ে তলপেটের সামান্য ওপর দিয়ে বের হয়ে যায়। আলমের হাত-পা, পেটসহ শরীরে মোট ছ'টি গুলিবিদ্ধ হলো। গায়ের চাদর দিয়ে পেট বেঁধে আলম ধান ক্ষেতের আলের পাশের ঘাস ও ধান গাছের মধ্যে শুয়ে পড়ে আত্মগোপন করে থাকে। এল.এম.জি ম্যান, এল.এম.জি হেলপার ও গাইড মকবুল শত্রু বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। ইতিমধ্যে সূর্য উঠে সকাল হয়ে যায়। পাকবাহিনী আলমকে পেছনে রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু পিছু কিছুদূর অগ্রসর হয়। আলম খুব কষ্টে ক্রলিং করে কখনো গড়িয়ে গড়িয়ে পাশের পুকুর পাড়ে গিয়ে পুকুরের পানিতে মুখ লাগিয়ে জল পানের চেষ্টা করতে থাকে। এমন সময় জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা গ্রামের এক বৃদ্ধ আলমকে দেখে কাছে আসে এবং তাকে নিয়ে প্রথমে অরহর ডালের গাছের নিচে এবং পরে খড়ের একটা টিপির মধ্যে লুকিয়ে রাখে। এদিকে দস্যু বাহিনী ফিরে এসে বৃদ্ধের বাড়ির প্রতি ঘরে ঘরে তল্লাশি করে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে না পেয়ে চলে যায়। এরপর বৃদ্ধের বাড়ির পাশে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা নীলফামারীর কয়েকজন বি.এল.এফ সদস্য অজ্ঞান ও মৃতপ্রায় আলমকে হিমকুমারী ঘাঁটিতে নিয়ে আসে। এখান থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়িতে করে দ্রুত তাকে হলদিবাড়ি হয়ে প্রথমে জলপাইগুড়ি হাসপাতাল এবং সেখান থেকে বাগডোগরা মিলিটারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পাকিস্তানী নরপশু বাহিনীর হাতে ধরা পড়া গাইড মকবুলসহ অপর তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করা হয়।

আলমকে হলদিবাড়ি নেয়ার পর অচেতন অবস্থায় শুধু একবার আমার নাম ধরে 'ভাই' বলে ডেকে ওঠে। এখানকার প্রায় অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা আমার পরিচিত। মিঠাপুকুরের জনাব হামিদুজ্জামান এম.পি.এ'র মাধ্যমে তারা আলমের আহত হওয়ার খবর আমার কাছে প্রেরণ করে। হামিদুজ্জামান এম.পি.এ ৬ নভেম্বর আমাকে জানালেন, আলমকে মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়া হয়েছে, হয়তো বেঁচে নেই, মৃত্যুবরণ করেছে। এ সময় পাক বাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্য বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য আমরা খুবই ব্যস্ত ছিলাম। ফলে আলমের সর্বশেষ সংবাদ নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। নিজের মনকে প্রবোধ দিলাম এই ভেবে যে, অনেক সাথী মুক্তিযোদ্ধা ভাই দেশের মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য নিজেদের মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করে গেল, নিজের হাতে অনেক প্রাণের সাথীকে মাটির শয্যায় চিরবিদায় জানালাম, ওরা কোনদিন আর পৃথিবীর আলো-বাতাসের স্পর্শ পাবে না। হয়তো আমাদেরও একই পরিণতি হবে।

সেক্টর কমান্ডার উইং কমান্ডার মোঃ খাদেমুল বাশার

সর্বজনশ্রদ্ধেয় আমাদের প্রাণপ্রিয় সেক্টর কমান্ডার এম. কে. বাশার ছয় নম্বর সেক্টরের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার অবিচল আস্থা অর্জন করেছিলেন। রংপুর–দিনাজপুর জেলার বিশাল এলাকা জুড়ে ছিল ছয় নম্বর সেক্টর। প্রতিটি এলাকার প্রতিটি ঘাঁটিতে অবস্থানরত অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধার সাথে অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন, সময় সুযোগমত তাদেরকে সঙ্গ দেয়ার চেষ্টা করতেন। তাঁর অমায়িক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সেনা–নায়কোচিত ব্যবহার আমাদেরকে মুগ্ধ করেছিল।

রোজা শুরু হওয়ার আগের দিন দুপুরের পর তিনি আমাদের ঘাঁটিতে এলেন। ভুরুঙ্গামারীস্থ পাক দখলদার পশুবাহিনীর অবস্থানের ওপর আক্রমণ অভিযান পরিকল্পনার জন্য সন্ধ্যার কিছু আগেই সাব–সেক্টর অফিসে ক্যাপ্টেন নওয়াজিশসহ আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে তিনি আলোচনায় বসলেন। একটির পর একটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এক পর্যায়ে ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ বললেন, "স্যার, আপনি অনেকদিন যাবৎ পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন, কোন সংবাদ পাননি, তাই তাদেরকে দেখে এলে ভাল হতো।" বীর সেনানায়ক সেক্টর কমান্ডার তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মৃদু হেসে বললেন, "ঠিকই বলেছ, তবে কি জানো? তোমরা মুক্তিযোদ্ধারাই আমার পরিবারের আপন সদস্য। তোমাদের সাথে থাকা আর আমার পরিবারের সাথে থাকা একই কথা। আগে অভিযান সফল করো, পরে তাদের সাথে দেখা হবে। শত্রুকে আঘাত হেনে অভিযান সফল করলে আনন্দ পাওয়া যাবে। তা'ছাড়া তোমরা হানাদার শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে, আর আমি পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করবো, তা কি করে হয়?"

সেক্টর কমান্ডারের পরিকল্পনা ও নির্দেশ অনুযায়ী রোজার এই আগের রাতে ভুরুঙ্গামারী হাই স্কুলস্থ হানাদার বাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হলো। অভিযানে অংশগ্রহণকারী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে দাঁড়িয়ে রাত ন'টায় তিনি এক আবেগময় বক্তৃতা করলেন, " জয় বাংলা, বাংলার জয়" এবং "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি" গান দু'টি টেপ রেকর্ডারে বাজিয়ে শোনানো হলো। অভিযানে অংশগ্রহণকারী দেড়শ' মুক্তিযোদ্ধার প্রত্যেকের সাথে তিনি হাত মেলালেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আদর করলেন।

আমরা এখন চারটি দলে বিভক্ত। সিদ্ধান্ত হলো, প্রথম দলের পঁয়তাল্লিশজন ভুরুঙ্গামারী বাগভান্ডার পাকা রাস্তায় ভুরুঙ্গামারী বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে, দ্বিতীয় দলের চল্লিশজন বাজারের উত্তর মোড়ের পশ্চিম দিকে জয়নাল (খোকা) ভাইদের বাড়ির রাস্তায় অবস্থান নেবে, যাতে পাকবাহিনী এই রাস্তা দু'টি দিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর না হতে পারে। তৃতীয় দলের পঞ্চান্নজন ফজলার রহমান ও রমজান মৌলবীদের বাড়ির পশ্চিম দিক থেকে হাইস্কুলে ঠাঁই নেয়া শত্রু বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাবে। চতুর্থ দলের পনেরজন উল্লিখিত তিন দলের মধ্যে সমন্বয় ও অভিযান পরিচালনা করবে এবং সাহেবগঞ্জ ঘাঁটিতে সেক্টর কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ রাখবে। আমাদের প্রত্যেক দলের

সাথে পোর্টেবল ওয়্যারলেস, প্রথম ও দ্বিতীয় দল এল.এম.জি, এস.এল.আর, রাইফেল, তৃতীয় দল এল.এম.জি, এস.এল.আর, এস.এম.জি, রকেট, রকেট ল্যান্সার, দুই ইঞ্চি মর্টার, গ্রেনেড এবং আমাদের চতুর্থ দল এস.এল. আর, এস.এম.জি ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত।

সীমান্ত দিয়ে ফুলকুমার নদী অতিক্রম করে ঈশ্বর বড়ুয়া গ্রাম এবং বাগভান্ডারের মধ্য দিয়ে পাকা রাস্তাকে ডানে রেখে বাঁশের ঝোপ, ছোট জঙ্গল ও ঘরবাড়ির আড়াল পেরিয়ে, ক্ষেতে শুকিয়ে যাওয়া ধান ও পাট গাছ মাড়িয়ে রাত একটায় আমরা যার যার অবস্থান গ্রহণ করলাম। এমন সময় বাজারের দক্ষিণ মোড় থেকে শত্রু বাহিনীর একটি গাড়ি উত্তরে হাই স্কুলের দিকে আসছিল। মসজিদের কাছে আসতেই গাড়ি লক্ষ্য করে রকেট ল্যান্সার ও অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে স্কুলের ওপর গুলিবর্ষণ করা হলো। রকেট ল্যান্সারের আঘাতে গাড়িতে আগুন ধরে যায়। দখলদার হানাদার বাহিনী হয়তো ভেবেছিল, রোজার সময় আমরা আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবো। ফলে পাঁচ মিনিটের এই তীব্র ঝটিকা আক্রমণে শত্রু বাহিনীর সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়লো। আক্রমণ অভিযানশেষে আমরা ঘাঁটিতে ফিরে আসলাম।

আমাদের সফল আক্রমণ এবং নিরাপদে ডেরায় ফিরে আসতে পারায় সেক্টর কমান্ডার খুশিতে প্রায় কেঁদে ফেললেন এবং সকলকে একে একে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য আর অনুভূতি। এই অভূতপূর্ব আবেগময় দৃশ্য দেখে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার ও সৈনিকদের চোখ পানিতে টলমল করছিল। এই সফল অভিযানে শত্রু বাহিনীর দশ–বারোজন সদস্য নিহত, কয়েকজন আহত এবং তাদের কয়েকটি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়।

অপারেশন থেকে আমরা ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত সেক্টর কমান্ডার এক মুহূর্তের জন্যও স্থির হয়ে বসে থাকেননি। তিনি পায়চারি করেছেন আর মুহূর্তে মুহূর্তে ওয়্যারলেস সেটের সামনে এসেছেন। তাঁর পরিকল্পনা ও অধিনায়কত্বে শত্রু বাহিনীর ওপর সফল আক্রমণ চালিয়ে নিরাপদে ফিরে আসা সম্ভব হলো। যুদ্ধের ময়দানে বিভিন্ন সময় তাঁর সাহসিকতাপূর্ণ অসাধারণ কৃতিত্বের প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বড় ও ছোট ঝুঁকিপূর্ণ আক্রমণ পরিচালনা, এ্যামবুশ ও রেইড ইত্যাদি মাঝে মাঝে তিনি নিজেই পরিচালনা করতেন। তিনি একজন প্রথম সারির সেনানায়ক, বীর মুক্তিযোদ্ধা। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলো তাঁর। সফল রণকৌশল, অস্ত্র চালনা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, আত্মবিশ্বাস, সেই সাথে সহকর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর গভীর অনুভূতি, স্নেহ, অমায়িক ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার আমাদের মন থেকে কোনদিন মুছে যাবে না। মুছে যাবার নয়। প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ক্ষণ এই মহান বীর মুক্তিযোদ্ধার অতুলনীয় সাহচর্যের স্মৃতি মনকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তোলে।

স্বাধীনতার পর মাঝে মাঝে আমার সাথে আমাদের প্রাণপ্রিয় সেক্টর কমান্ডারের সাক্ষাৎ হয়েছে। অতি আপনজনের মত কথা বলেছেন, কুশল জিজ্ঞেস করেছেন। সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়ে জানতে চেয়েছেন, তাদের কে কোথায় আছে খোঁজ–খবর নেয়ার

চেষ্টা করেছেন। কখনো তাদের অসহায় করুণ অবস্থার কথা শুনে ব্যথিত হয়েছেন। ১৯৭৬ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর। রমজান মাস। এই দিন প্লেনে ঠাকুরগাঁও হয়ে আমি রংপুর যাব। বিমানবাহিনী অফিসার্স মেসে বন্ধুদের সাথে দেখা করার আশায় সকাল ন'টার কিছু আগে তেজগাঁও বিমানবন্দরে এলাম। এখানে পৌঁছার সাথে সাথে বিকট একটা শব্দ হলো। কিছু বুঝতে পারছিলাম না। সবাই যে যেদিকে পারছে, দৌড়াচ্ছে। বেবীট্যাক্সি ছেড়ে আমি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের অফিসে ঢুকে পড়লাম। দেয়ালে লাগানো কাচের মধ্য দিয়ে দেখা গেল একটি ট্রেনিং বিমানের অর্ধেক অংশ টারমিনাল ভবনের ওপর এবং অন্য অংশটি পড়ে আছে নিচে। সেখান থেকে বের হচ্ছে ধোঁয়া। কিছুক্ষণের মধ্যে জিয়াউর রহমান এলেন। বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এম. কে. বাশার ও স্কোয়াড্রন লিডার মফিজুল ইসলামের মরদেহ কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। স্বাধীন বাংলাদেশের পুণ্যভূমিতে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন।

উত্তরাঞ্চল সাংস্কৃতিক পরিষদ

কুড়িগ্রাম কলেজের অধ্যাপক বলাইচন্দ্র পালের নেতৃত্বে উত্তরাঞ্চল সাংস্কৃতিক পরিষদ গঠন করা হয়। এই সাংস্কৃতিক পরিষদ ছয় নম্বর সেক্টরের বিভিন্ন ঘাঁটিতে দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান করে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করে। এছাড়া বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে অনুষ্ঠান করে মাতৃভূমিহারা নারী–পুরুষ–শিশু–বৃদ্ধসহ সর্বশ্রেণীর শরণার্থীদের সাহস ও প্রেরণাদান এবং কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার সকল শহর ও বন্দরে গান গেয়ে স্বাধীনতার পক্ষে সফল প্রচারণা পরিচালনা করে। সাংস্কৃতিক পরিষদের অন্যান্য সদস্য ছিল [সকলের নাম এখন আর মনে করা সম্ভব হচ্ছে না] দেবব্রত বকসী বুলবুল, কেষ্ট চন্দ্র সরখেল ও সাহানা প্রমুখ শিল্পী।

এর মধ্যে একদিন দিনহাটা শহীদ কর্নারস্থ কুড়িগ্রাম মহকুমা বি.এল.এফ ঘাঁটিতে অনুষ্ঠান করার জন্য বলাইচন্দ্র পাল অনুমতি চাইলেন। আমি সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। মঞ্চ তৈরি করার জন্য কাপড়, বাঁশ ইত্যাদি কমল গুহ সরবরাহ করলেন। কেবল চার ডজন সেফটি পিন পঁচাত্তর পয়সা দিয়ে কেনা হলো। সেফটি পিন কেনার পয়সা কমলদা দিলেন। রুকু, নূরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ আলী মঞ্চ তৈরির দায়িত্বে থাকলো। মঞ্চসজ্জা ও অনুষ্ঠান পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করলো মঞ্জু মন্ডল। সুন্দর ও আকর্ষণীয় মঞ্চের ওপর রাত ন'টায় অনুষ্ঠান শুরু হলো। অনুষ্ঠানে এখানে আশ্রিত শরণার্থী ও দিনহাটার স্থানীয় মহিলা–পুরুষ, ছেলে–মেয়ে–বৃদ্ধসহ সকল শ্রেণীর প্রচুর মানুষের সমাগম হলো। স্থান সঙ্কুলান না হওয়ার কারণে মানুষ রাস্তায় এবং পার্শ্ববর্তী ঘরবাড়ির বারান্দায় ও বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রায় সারা রাত অনুষ্ঠান চললো। উপস্থিত মানুষ জন মন্ত্রমুগ্ধের মত আমাদের শিল্পীদের গান শোনেন। দিনহাটার মানুষ মঞ্চসজ্জা, ব্যবস্থাপনা ও অনুষ্ঠান পরিচালনায় বাংলার দামাল ছেলেদের ভূয়সী প্রশংসা করতে থাকেন।

অনেকদিন যাবৎ লোকমুখে শুধু প্রশংসাই শোনা গেল। অনেকে বলেন, এর আগে কোনদিন দিনহাটায় এমন সুন্দর মঞ্চ তৈরি ও অনুষ্ঠান হয়নি।

পিশাচ মৌলানা আব্দুল লতিফ

ভুরুঙ্গামারী অধিকৃত হওয়ার সাথে সাথে প্রিন্সিপাল কামরুদ্দিনসহ অন্য কয়েকজন এবং এখানকার জামে মসজিদের ইমাম মৌলানা আব্দুল লতিফ পাকবাহিনীর সহযোগীতে পরিণত হয়, একথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। লতিফ মৌলানারা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান সংবাদ সংগ্রহ করা ও তা পাকসেনাদের জানানো, তাদের ধরিয়ে দেয়াসহ নরপশুদেরকে সব ধরনের কুকর্মে সহযোগিতা করতে থাকে। গ্রামগঞ্জ থেকে মেয়েদেরকে জোর করে ধরে এনে পাকিস্তানী নরপিশাচদের মনোরঞ্জন করা, তাদের অনুগ্রহ লাভ করা, নারী ধর্ষণ, মানুষ হত্যা, লুণ্ঠন, অত্যাচারসহ যাবতীয় হীন কাজে মানুষরূপী এইসব শয়তান তাদের পাক-প্রভুদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ওঠে। লতিফ মৌলানার দুই স্ত্রীর মধ্যে ছোট স্ত্রী ছিল অল্প বয়সী এবং বেশ সুন্দরী। ভুরুঙ্গামারী হাই স্কুলে অবস্থানরত পাকবাহিনীর এক মেজরকে খুশি করার জন্য লতিফ মৌলানা তার সুন্দরী স্ত্রীকে মিথ্যা কথা বলে একটি রাতের জন্য এখানে নিয়ে আসে। মেজর সারা রাত ধরে এই মহিলার ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। পশুরা পালাক্রমে এই মহিলাকে এমনভাবে ধর্ষণ করে যে, এক পর্যায়ে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। নরপশুদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর এই মহিলার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। ভুরুঙ্গামারী বাজারের দেড় মাইল উত্তরে নলেয়ার পাড়ে এই দালাল লতিফ মৌলানার বাড়ি। আমাদের খবর সংগ্রাহকের গোপন খবরের ভিত্তিতে রাতে মৌলানার বাড়ির পাশে অবস্থান নেয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল প্রেরণ করা হলো। মুক্তিযোদ্ধাদের এই দলটি রাত একটার দিকে মৌলানার বাড়ির পশ্চিম-উত্তর ও পূর্বদিকের বাঁশের ঝোপ ও জঙ্গলের মধ্যে অবস্থান নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। ঠিক এই সময় শাড়ি পরা অবস্থায় তিনজন সহযোগীসহ মৌলানা রাত তিনটার দিকে তার বাড়িতে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে অতর্কিতে ঘেরাও করে ধরে ফেলে এবং ধামেরহাট নিয়ে আসে। পরে এই ঘৃণ্য নরপশুদের হত্যা করা হয়।

ভুরুঙ্গামারী শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করার পর লতিফ মৌলানার স্ত্রীকে মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রথমে স্থানীয় চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং পরে দেশকে শত্রুমুক্ত করার পর তাকে পাবনার হেমায়েতপুর মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। অনেকদিন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে এই মহিলা ভুরুঙ্গামারী ফিরে আসে এবং কিছুদিনের মধ্যে পুনরায় তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। পাঞ্জাবি নরপশুদের হিংস্র ছোবলের জ্বালা গভীর মর্মে পুষে রেখে আজো এই মহিলা গ্রামে-গঞ্জে-প্রান্তরে আর হাট-বাজারের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রাজাকার বেলাল

মুক্ত এলাকা সোনাহাট থেকে বেলাল চলে গিয়ে পাকবাহিনীর সাথে মিলিত হয় এবং রাজাকার হিসেবে ট্রেনিং গ্রহণ করে। এই শয়তান পাটেশ্বরী, হেলডাঙ্গা, কালীরহাট, ধাউরার কুটি, আন্ধারী ঝাড়, রায়গঞ্জ, রতনপুর ইত্যাদি গ্রাম থেকে বহুসংখ্যক বিভিন্ন বয়সের মেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে সরবরাহ করে। এই সব এলাকার মহিলাসহ সকল শ্রেণীর মানুষ এই ঘৃণ্য রাজাকারের অত্যাচারে দিনের পর দিন জর্জরিত হতে থাকে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে বেলাল ধাউরার কুটি গ্রামে মেয়ে ধরতে এলে সোনাহাট ঘাঁটি থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে। গ্রামের সরলা মহিলারা বেলালকে তাদের হাতে দেয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অনুরোধ জানায়। মহিলারা বলেন, "বেলালের মাথা আমরা চিবিয়ে খাবো, ওর রক্ত মেখে আমরা প্রাণ জুড়াবো।" মুক্তিযোদ্ধারা বেলালকে সোনাহাট নিয়ে আসে। পাকবাহিনীর দোসর, তাদের অপকর্মের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ঘৃণ্য এই শয়তানকে হত্যা করা হয়।

সৈয়দপুরে বিহারিদের একটি নৃশংসতা

২৫ মার্চ '৭১-এর পর সৈয়দপুরের বিহারিরা বাঙালিদের ওপর নৃশংস অত্যাচার শুরু করে। লুটপাট, বাড়িঘরে আগুন জ্বালানোসহ নারী-পুরুষ ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। তেমনি এক নির্মম নৃশংসতার শিকার ধনীর আদরের দুলালী গৃহবধূ রানু।

কুড়িগ্রাম শহরের নিচ দিয়ে প্রবাহিত ধরলা নদীর উত্তর পারে পাটেশ্বরীর ধনাঢ্য ব্যক্তি গেন্দু মিঞার অতি আদরে লালিত সুন্দরী কন্যা রানুর সাথে সৈয়দপুর রেল বিভাগে কর্মরত এক সহজ সরল পবিত্র মনের অধিকারী ইঞ্জিনিয়ারের বিয়ে হয়। তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখে ও সুন্দরভাবে কেটে যাচ্ছিল। রানুর কোলজোড়া সুন্দর ফুটফুটে দু'টি পুত্রসন্তান। একটির বয়স প্রায় ৪/৫ বছর, অন্যটির বয়স ১/২। তারা সৈয়দপুর রেল কোয়ার্টারে থাকতো। '৭১-এর ৩০ মার্চ বর্বর পাক হানাদার বাহিনী চারদিকে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সৈয়দপুরে ঢুকে পড়ে। বাঙালি নারী-পুরুষ-শিশু-আবালবৃদ্ধবনিতা জীবনের ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে থাকে। প্রতিবেশীরা রানুকে পালাতে বলে। কিন্তু রানুর ধর্মভীরু নির্লোভ নিরহঙ্কার ইঞ্জিনিয়ার স্বামী নামাজ শেষ করে কোথাও পালানোর কথা বলে মসজিদে আছরের নামাজ আদায় করতে বাইরে যান। ঠিক তখনই তাঁর অধস্তন কর্মচারি পাষণ্ড বিহারি রেল কর্মচারি ও অন্যান্য বিহারি তাঁকে ধরে নিয়ে রেল ওয়ার্কসপের বয়লারের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে পৈশাচিকভাবে হত্যা করে। বয়লারে তাঁকে নিক্ষেপ করার আগে বহু অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি-মিনতি করেও রেহাই পেলেন না তিনি বাঙালি বলে। তাঁকে হত্যা করার পর সেই একই বিহারিরা তাঁর বাসায় এসে রানুকে জোর করে চুল ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায়। এমন সময় এক ফাঁকে তাদের ছোট্ট কাজের মেয়েটি রানুর ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে পালিয়ে

গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। অপর ছেলেটি নিজেই ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গ্রামের দিকে চলে যায়।

একদিন স্বাধীনতার রক্তিম লাল সূর্য উদিত হলো। স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনলাম। কিন্তু আমরা রানুকে আর পেলাম না, চিরতরে সে হারিয়ে গেল। রানুর মা-বাবা-ভাই আর আত্মীয়স্বজনরা অনেক খোঁজ করেছেন তাঁর, কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। নীলফামারীর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামে অনেক খোঁজাখুঁজির পর নীলফামারীর গ্রামের এক বাড়িতে প্রথমে ছোট্ট ছেলেসহ কাজের মেয়েকে পাওয়া গেল। আরো পরে ঐ এলাকার এক বাড়ি থেকে রানুর বড় ছেলেকেও পাওয়া গেলো এবং তাদের নিয়ে আসা হয় রানুর বাবার বাড়িতে।

রানুর মা-বাবা প্রতীক্ষার অধীরতা নিয়ে প্রহর গুণছেন আজো আর রানু ও রানুর স্বামীর অতৃপ্ত আত্মার আর্ত চিৎকার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয়ে ঘুরে ফিরছে।

চূড়ান্ত লড়াই

প্রচন্ড আঘাত হেনে ভুরুঙ্গামারীস্থ দখলদার পাকবাহিনীর অবস্থানগুলো ধ্বংস করে ভুরুঙ্গামারী উদ্ধার করার জন্য নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নির্দেশ পাওয়া গেল এবং আমরা মরণপণ প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম। সেক্টর কমান্ডার এম. কে. বাশার, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জসিসহ উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ সাহেবগঞ্জস্থ আমাদের সাব-সেক্টর হেড কোয়ার্টারে এলেন। আমাদের সাথে ভারতীয় ষষ্ঠ মাউন্টেন ডিভিশনের একটি ব্রিগেড এবং বি.এস.এফ-এর কয়েকটি কোম্পানিও সার্বিক সমর-সজ্জায় সজ্জিত হলো।

নেয়া হলো ভুরুঙ্গামারীর দক্ষিণ দিক খোলা রেখে পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বদিক থেকে আক্রমণ রচনার সিদ্ধান্ত। ভুরুঙ্গামারীর পূর্বের মুক্তাঞ্চল সোনাহাট ঘাঁটি থেকে সঙ্কোষ নদী অতিক্রম করে আক্রমণের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আসামের ভারতীয় ৭৮-ব্যাটালিয়ন বি.এস.এফ থাকবে। ৭৮-ব্যাটালিয়নের নেতৃত্বে নিয়োজিত হলেন কর্নেল আর. দাস, তাঁর সাথে ক্যাপ্টেন যাদব ও অন্যান্য অফিসার। পশ্চিম-উত্তর দিক থেকে ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্বে থাকলেন ব্রিগেডিয়ার জসি, মেজর জেম্‌স্‌, মেজর গুরুদয়াল সিং ক্যাপ্টেন শম্ভু, ক্যাপ্টেন মেহেদী ও অন্যান্য অফিসার।

সহজে অল্প সময়ের মধ্যে রংপুর উদ্ধার করার জন্য গীতালদহ থেকে মোগলহাট, লালমনিরহাট দিয়ে রংপুর এবং পাকবাহিনীর অবস্থানসমূহ ও ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করা হবে। পাটগ্রাম থেকে বুড়িমারী, কালীগঞ্জ, হাতীবান্দা দিয়ে রংপুর আক্রমণকারীদের সহযোগিতা ও তাদের শক্তি বৃদ্ধি করার ব্যবস্থাও নেয়া হলো। পাটগ্রাম বা অন্যান্য এলাকার তুলনায় গীতালদহ থেকে রংপুরের দূরত্ব অনেক কম এবং রংপুরে পাকবাহিনীকে আক্রমণের এই রুট উপযোগী ও সুবিধাজনক বিবেচিত হলো।

জলপাইগুড়ির হলদিবাড়ির ও হিমকুমারী থেকে জলঢাকা, ডোমার, ডিমলা দিয়ে নীলফামারী এবং সৈয়দপুরে হানাদার পাকবাহিনীর অবস্থানসমূহ আক্রমণ করে এইসব

অঞ্চল উদ্ধার ও শত্রুমুক্ত করার সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছে। এখানে ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্বে থাকলেন মেজর ছাতোয়াল সিং, মেজর সিনহা ও অন্যান্য অফিসার।

প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে তেঁতুলিয়া থেকে পঞ্চগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও উদ্ধারের এবং খানসামা ও হিলি থেকে দিনাজপুর উদ্ধারের জন্য জোর আক্রমণ প্রস্তুতি। এখানে ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্বে থাকলেন ৭১ ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার কাথা পালিয়া এবং ২০ মাউন্টেন ডিভিশনের মেজর জেনারেল লছমন সিং লেহী।

ছয় নম্বর অঞ্চলসমূহে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর নেতৃত্বে থাকলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩১ কোরের অধিনায়ক লেঃ জেনারেল থাপ্পা। মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে থাকলেন এই সব এলাকার আগে উল্লিখিত সাব-সেক্টর কমান্ডার এবং এফ.এফ কমান্ডারবৃন্দ, সেই সাথে ছয় নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার উইং কমান্ডার এম. কে. বাশার।

১১ নভেম্বর রাতে ভুরুঙ্গামারীর পশ্চিম ও উত্তরদিক থেকে পাকবাহিনীর অবস্থানের ওপর আমরা আক্রমণ শুরু করলাম। ১২ নভেম্বর সকাল আটটায় পাটেশ্বরী রেল স্টেশনে হানাদার বাহিনীর অবস্থানের ওপর ভারতীয় বিমানবাহিনীর জেট বিমান আক্রমণ চালালো। বিমান থেকে বোমা ও গুলিবর্ষণের ফলে স্টেশনের পশ্চিম পাশের দোতলা বিল্ডিংসহ কয়েকটি পাকা ঘর ধ্বংস হয়ে গেলো। আকাশ ও স্থলপথে মিত্র-বাহিনী, সেই সাথে আমাদের তীব্র আক্রমণের ফলে পাটেশ্বরীতে পাকবাহিনীর বিপুলসংখ্যক সৈন্য নিহত হলো। শেষ পর্যন্ত তারা এখানে টিকতে না পেরে এখানকার অবস্থান ছেড়ে চলে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা পাটেশ্বরী দখল করে ভুরুঙ্গামারীর প্রায় পুবে এসে শত্রু বাহিনীর ওপর আক্রমণ ও গুলিবর্ষণ করতে থাকে। ১৩ নভেম্বর উল্লিখিত অবস্থান থেকে আমরা প্রবল আক্রমণ শুরু করলাম। ভারতীয় মিত্র-বাহিনী কামান, মর্টার, এইচ.এম.জি ও আর.আর ইত্যাদি ভারি অস্ত্র সহযোগে শয়তান বাহিনীর ওপর বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ শুরু করে দিলো। সেই সাথে ভারতীয় যুদ্ধ বিমান আকাশে বার বার চক্কর দিতে থাকে। তবে একদিন আগে থেকেই মিত্র বাহিনীর বিমান শত্রুদের অবস্থানের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে দিয়েছিলো। সন্ধ্যার আগে আমরা ভুরুঙ্গামারীর প্রায় কাছে এসে উল্লিখিত তিনদিক থেকে বর্বর বাহিনীকে ঘিরে তাদের অবস্থানের ওপর আঘাত হেনে চলেছি। মধ্যরাতে শত্রু বাহিনীর গুলির আওয়াজ স্তিমিত হয়ে এলো। ভোর হওয়ার আগেই পাকবাহিনীর গুলির আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। ১৪ নভেম্বর পুবের আকাশ ফরসা করে লাল রক্তিম সূর্য হেলেদুলে ওঠার সাথে সাথে 'জয় বাংলা' ধ্বনি তুলে আমরা ভুরুঙ্গামারীতে ঢুকে পড়লাম। পাকবাহিনী যত্রতত্র পুঁতে রাখা মাইনের কারণে জয়োল্লাসরত মুক্তিযোদ্ধাদের সড়ক ব্যতীত মাঠে বা জঙ্গলে যেতে নিষেধ করা হলো। ভুরুঙ্গামারী হাই স্কুল ও সিও অফিসের কাছ থেকে ষাটজন ই.পি. ক্যাফ এবং প্রায় তিরিশ/চল্লিশজন পাকিস্তানী বর্বর পশু বাহিনীর সদস্যকে ঘেরাও করে ধরা হলো। এদের অস্ত্রের গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় মিত্র বাহিনী ধৃত নরপশুদের হত্যা করার সুযোগ না দিয়ে তাদেরকে ভারতে নিয়ে চলে

গেলো। পাকিস্তানী নরপিশাচ বাহিনীর দুশ্চরিত্র ক্যাপ্টেন আতাউল্ল্যা খান ও একজন নির্যাতিতা বাঙালি মহিলাকে বোমার আঘাতে বিক্ষত অবস্থায় সিও অফিসের পাশের এক বিধ্বস্ত বাঙ্কারে পাওয়া গেল। নরপশু ক্যাপ্টেন এই মহিলাকে জড়িয়ে ধরে ছিল এবং এভাবেই নিহত হয়। এই যুদ্ধে প্রায় চল্লিশ/পঞ্চাশজন শত্রু-সেনা নিহত হয়। ভুরুঙ্গামারীর পুব দিকের চৌমাথায় ও কলেজের দক্ষিণে আমরা অবস্থান গ্রহণ করলাম। মাতৃভূমি জন্মভূমি উদ্ধার করার আনন্দে চোখের জল বের হয়ে এলো। স্বাধীন বাংলার পবিত্র জন্মভূমির মাটি হাতের মুঠোয় নিয়ে বুকে আর কপালে মাখলাম। গাঢ় সবুজ ক্ষেত্র আর রক্তলাল বৃত্তের মাঝে সোনালি রং দিয়ে আঁকা বাংলাদেশের মানচিত্রবিশিষ্ট স্বাধীন বাংলার পতাকা সিও অফিসের সম্মুখে তুলে দিলাম। বিজয়োল্লাসে পতাকা পৎ পৎ করে উড়তে থাকলো। এই আনন্দ আর অনুভূতি শুধু অনুভবই করা যায়, প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

পাকা রাস্তা দিয়ে সকাল ন'টায় ভুরুঙ্গামারীর পুবে আমাদের অবস্থানে যাচ্ছিলাম। এই সময় ওয়্যারলেসে পেছন থেকে সংবাদ দেয়া হলো, আমাকে সিও অফিসের কাছে যেতে হবে। সিও'র বাসভবনের দোতলায় জানালার ফাঁক দিয়ে কয়েকজন মহিলাকে দেখা গেল। আমরা কয়েকজন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দেখলাম, বাইরে থেকে দরজায় তালা আটকানো। রাইফেলের বাঁট দিয়ে তালা ভেঙে ঘরের ভেতরে ঢুকে চোখ বন্ধ করে বের হয়ে এসে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেললাম। কয়েক মুহূর্ত এভাবে কাটলো। ঘরের ভেতর চারজন মেয়ে, দু'জন সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় এবং দু'জন শুধু জাঙ্গিয়া পরে রয়েছে। আমাদের চারটি লুঙ্গি ও চারটি শতরঞ্জি দরজার বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে ছুঁড়ে দিলাম। আমরা দরজার বাইরে থেকে মেয়েগুলোর সাথে কথা বলার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মেয়েগুলো কথা বলতে পারছিল না। তাদের সমগ্র শরীর নরপশু হিংস্র হায়েনা শয়তানদের নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তাদের এক একজন প্রায় ৬/৭ মাসের গর্ভবতী। আমি এই দৃশ্য দেখে নীরব হয়ে গেলাম, আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছিল না। একজনের সামান্য পরিচয় পাওয়া গেল, ময়মনসিংহ কলেজের ছাত্রী। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল কোরের গাড়িতে করে তাদেরকে চিকিৎসার জন্য সাথে সাথে ভারত নিয়ে যাওয়া হলো। একইভাবে ভুরুঙ্গামারী হাই স্কুলের তালাবন্ধ একটি কক্ষ থেকে ষোলজন নির্যাতিতা মহিলাকে উদ্ধার করা হলো। তাদেরকেও ভারতে নিয়ে যাওয়া হলো। সিও অফিসের দোতলায় দক্ষিণ সিঁড়ির পাশের কক্ষে দেখা গেল, কক্ষের সমস্ত মেঝে জুড়ে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। ছেঁড়া শাড়ি-ব্লাউজ, পেটিকোট, ব্রেশিয়ার, মেয়েদের ছেঁড়া চুল কক্ষের মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। পুব পাশে জানালার লোহার রডের সাথে সূতার রশি বাঁধা রয়েছে। এই রশি দিয়ে মেয়েদেরকে বেঁধে শয়তানরা উপর্যুপরি ধর্ষণ ও পাশবিক অত্যাচার চালাতো। চোখে পড়লো কক্ষের উত্তর দেয়ালে রক্ত দিয়ে মোটা অক্ষরে ৭/৮ ইঞ্চি দূরত্ব রেখে লেখা 'জ--বা' শব্দ। সম্ভবত রক্তাক্ত আঙুল দিয়ে লিখেছে। যে মেয়েটি লিখেছে, তার নাম হয়তো জবা অথবা সে বাঙালির প্রাণের শব্দ "জয় বাংলা" লেখার চেষ্টা করেছিল।

এই দিনই আমরা জয়মনিরহাটের দিকে অগ্রসর হলাম এবং বিকেলে এখানে অবস্থান গ্রহণ করলাম। চৌমাথা থেকে সোনাহাট যাওয়ার রাস্তার দক্ষিণে এবং জয়মনিরহাট রাস্তার পুব পাশে প্রায় চার/পাঁচ বিঘা জায়গা জুড়ে পাকবাহিনী মাইন পুঁতে রেখেছে। এই মাইন স্থাপিত স্থানটি তার দিয়ে ঘিরে রাখার ব্যবস্থা করা হলো। পাকা রাস্তার উভয় পাশের ঘাসের নিচের মাটিতেও শত্রু বাহিনী মাইন পুঁতে রেখেছিল। মিত্র বাহিনীর সদস্যরা মাইন ডিটেক্টর দিয়ে এইসব মাইন অপসারণ করতে থাকে। আমাদের প্রচন্ড আঘাতে মার খেয়ে পাকিস্তানী দস্যু বাহিনী পিছু হটে রায়গঞ্জে অবস্থান নেয়। ষোলই নভেম্বর আমরা আন্ধারী ঝাড়ে অবস্থান গ্রহণ করে রায়গঞ্জে দস্যু বাহিনীর ওপর আক্রমণ ও গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখলাম। উনিশে নভেম্বর রাতে রায়গঞ্জের পশ্চিম ও পূর্বদিক এবং উত্তরে আন্ধারী ঝাড়সহ তিনদিক থেকে আক্রমণ রচনা করলাম। ফুলকুমার নদী অতিক্রম করে পরিকল্পনা অনুযায়ী মধ্যরাত হতেই রায়গঞ্জে শত্রু বাহিনীর অবস্থান ঘিরে প্রচন্ড আক্রমণ চালানো হলো। ভোর রাত থেকে শত্রুদের গুলির শব্দ নীরব হয়ে এলো। সূর্য ওঠার সাথে সাথে আমরা রায়গঞ্জে ঢুকে পড়লাম। বাজার হাসপাতাল ও রাস্তার পাশে পঁচিশ/তিরিশজন আহত বর্বর শত্রু-সেনা কাতরাচ্ছিল। আমাদের প্রচন্ড আক্রমণ ও গুলিবর্ষণের মুখে শত্রুরা তাদের সাথীদেরকে ফেলে রেখে গেছে। কয়েকজন আহত নরপশু শত্রুকে আমরা গুলি করে হত্যা করলাম। ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সদস্যরা বাকি শত্রুদেরকে হত্যা করতে দিল না। রায়গঞ্জের যুদ্ধে প্রায় তিরিশ/পঁয়ত্রিশজন নরপশু পাকসেনা নিহত হয়। রায়গঞ্জ শত্রুমুক্ত হলো। ঠিক এই পর্যায়ে শত্রু-সেনার গুলিতে লেঃ সামাদের শহীদ হওয়ার সংবাদ একজন দৌড়ে এসে জানালো। ফুলকুমার নদীর উত্তর পারে পাকা রাস্তার পাশে চারজন শহীদের মরদেহ উদ্ধার করলাম। শত্রু বাহিনী রায়গঞ্জ থেকে চলে গেছে মনে করে বিশে নভেম্বর সকাল সাড়ে পাঁচটায় লেঃ সামাদ ও ভারতীয় বাহিনীর মেজর জেমস সোজা পাকা রাস্তার ওপর দিয়ে জীপ নিয়ে রায়গঞ্জের দিকে অগ্রসর হন। রায়গঞ্জ পুলের প্রায় কাছে আসতেই পুলের অপর পার থেকে শত্রু বাহিনী এম.এম.জি দিয়ে অগ্রসরমান লেঃ সামাদের প্রতি গুলিবর্ষণ করে। শত্রুদের এই গুলিতে লেঃ সামাদ, মেজর জেমস, রামখানার দুই ভাই আবুল হোসেন ও আবদুল আজিজ এবং একজন ভারতীয় সৈন্য শহীদ হলেন। মাতৃভূমি উদ্ধারের জয়োল্লাস ও আনন্দের মাঝে বিষাদ নেমে এলো। বীর শহীদ আব্দুল আজিজ আবুল হোসেন ও শহীদ লেঃ সামাদকে জয়মনিরহাট মসজিদের পাশে বীরের মর্যাদায় সমাহিত করে আমরা তাঁদের শেষ বিদায় জানালাম। জয়মনিরহাটের নতুন নামকরণ করা হলো শহীদ সামাদনগর। মিত্র বাহিনীর বীরযোদ্ধা শহীদ মেজর জেমস্ ও মিত্র বাহিনীর শহীদ অন্য সদস্যদের মরদেহ মিত্র বাহিনী নিয়ে গেল। রায়গঞ্জে আমরা স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করলাম।

২১ নভেম্বর আমরা নাগেশ্বরী উদ্ধার করলাম। ভিরবন্দ, নুন খাওয়া, যাত্রাপুর ও পাটেশ্বরী মুক্ত করে ২৩ নভেম্বর আমরা পাটেশ্বরী এবং ধরলা নদীর উত্তর পারে অবস্থান গ্রহণ করে ধরলার উত্তর দিকের দু'টি থানা--ভুরুঙ্গামারী ও নাগেশ্বরী উদ্ধার করে

ফুলবাড়ি থানাসহ তিনটি থানা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখলাম। এর আগেই উল্লেখ করেছি, ফুলবাড়ি থানা শত্রু বাহিনী দখল করতে পারেনি। আমরা বরাবর এই থানা মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম।

হানাদার শত্রু বাহিনীর অবস্থান কুড়িগ্রাম আক্রমণ করে কুড়িগ্রাম উদ্ধারের লক্ষ্যে ২৪ নভেম্বর রাতে ধরলা নদী পার হয়ে কুড়িগ্রামের পশ্চিমে হরিকেশ ও পুবে মোগলবাছা এবং পাটেশ্বরীর ঘাট দিয়ে নদী অতিক্রম করে মিত্র বাহিনীসহ আমরা তিনদিক থেকে শত্রু বাহিনীর ওপর প্রচন্ড আক্রমণ শুরু করলাম। গ্রামের সাধারণ খেটে-খাওয়া শত শত মানুষ আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে থাকে। ২৫ নভেম্বর সকালে মিত্র বাহিনীর বিমান কুড়িগ্রাম শহরের ওপর চক্কর দিতে থাকে। সকাল এগারোটার মধ্যে পাকিস্তানী বর্বর শত্রু বাহিনী কুড়িগ্রাম থেকে পালিয়ে চলে যায়। আমরা ২৫ নভেম্বর কুড়িগ্রাম উদ্ধার করে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসলাম। সাথী মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্র বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে কুড়িগ্রাম কোর্ট ভবনে বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলার পতাকা আমি নিজে উত্তোলন করলাম।

টগরাইহাট, কাঁঠালবাড়ি, বড়বাড়ি, শিঙ্গের ডাববি, উলিপুর, চিলমারী একের পর এক আমরা উদ্ধার করে গেলাম এবং পাক হানাদার দস্যু বাহিনীকে বিতাড়িত করে ২৯ নভেম্বর তিস্তা উদ্ধার করে তিস্তা এবং তিস্তা পুলের কাছে নদীর পারে আমরা অবস্থান গ্রহণ করলাম। পাকবাহিনী তিস্তা নদী অতিক্রম করে কাউনিয়ায় অবস্থান নিয়ে এই দিন বিকেলে তিস্তা পুলের পশ্চিম পার ভেঙে দিল, যাতে আমরা তিস্তা নদী অতিক্রম করে তাদেরকে ধাওয়া এবং আক্রমণ করতে না পারি।

ভুরুঙ্গামারী, রায়গঞ্জ ও কুড়িগ্রামে পাকবাহিনীর কাছ থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র, গোলা-বারুদ, ছয়টি জীপ ও দশটি মিলিটারি ট্রাকসহ অন্যান্য যানবাহন এবং চাইনিজ এস.এল.আর, চাইনিজ এল.এম.জি, বৃটিশ এল. এম. জি, ২৬ ইঞ্চি পাউডার কামান, বিভিন্ন প্রকার মর্টার, এম.এম.জি, এইচ.এম.জি, স্টেনগান, বিভিন্ন প্রকার রাইফেল, রকেট ল্যান্সার, গ্রেনেড, মাইন, এক্সপ্লোসিভ, এয়ারবার্স্ট কামান, সেল, পোর্টেবল ও দূরপাল্লার ওয়্যারলেস ইত্যাদি দখল করতে সক্ষম হই।

কুড়িগ্রামে আমাদের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করা হলো। বি.এস.এফ কমান্ডার কর্নেল আর. দাস তার দল নিয়ে কুড়িগ্রাম ফায়ার ব্রিগেডে অবস্থান গ্রহণ করলেন। আমরা (এফ.এফ) ভোকেশনাল ট্রেনিং স্কুল, পিটিআই, ঘোষপাড়া ডাকবাংলো, ওয়াপদা ডাকবাংলো, সবুজ পাড়ায় নাসির সোপ ফ্যাক্টরির অবাঙালি মালিকের বাড়ি ও পার্শ্ববর্তী বিহারিদের বাড়ি, দাদা কোম্পানি এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিলাম। কোর্ট বিল্ডিং, নিউটাউনস্থ অফিসার্স কোয়ার্টার, মিতালী সিনেমা হলের পাশে মঞ্জু মন্ডলের বাড়ি এবং খলিলগঞ্জে এম.এফ সদস্যরা (ই.পি.আর) অবস্থান গ্রহণ করে। বি.এল.এফ-এর কয়েকটি দলকে মোল্লাপাড়াস্থ আনসার মিঞার বাড়ি ও অন্যান্য স্থানে অবস্থান নেয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম। তিস্তার অবস্থান সুদৃঢ় করার পর সমগ্র কুড়িগ্রাম মহকুমায় আমাদের বিজয় ঘোষিত হলো।

আমাদের নিয়ন্ত্রিত মুক্ত এলাকায় বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হলো। কুড়িগ্রাম মহকুমা উদ্ধারের সাথে সাথে ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীরা দলে দলে নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে আসতে থাকে। কুড়িগ্রামের দ্বিতীয় অফিসার আব্দুল হালিম, ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল লতিফ, জিয়াউদ্দিন আহমেদসহ ভারতে আশ্রয় নেয়া অফিসারবৃন্দকে কুড়িগ্রাম নিয়ে আসা হলো। তাঁদের সহায়তায় আমরা বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তুললাম। ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ি, উলিপুর, চিলমারী, লালমনিরহাট ও রৌমারীতে বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য এইসব থানায় অন্তত একটি করে এফ.এফ. কোম্পানি রাখা হলো। এমনিভাবে বি.এল.এফ-এর প্রত্যেক থানার দলকে তাদের স্ব-স্ব থানায় অবস্থানের জন্য আমি নির্দেশ প্রদান করলাম। ভুরুঙ্গামারী বি.এল.এফ সদস্য ওসমান, আকবর, মোজাম্মেল, রশিদসহ কুড়িগ্রাম থানার বি.এল.এফ সদস্যদের আমার নিজের কাছে রাখলাম। প্রথমে আমি সবুজপাড়ায় নাসের সোপ ফ্যাক্টরির মালিকের বাসায় এবং পরে ঘোষপাড়াস্থ ডাকবাংলোতে অবস্থান গ্রহণ করলাম। পাকবাহিনী স্থাপিত দাদা কোম্পানিস্থ রাজাকার হেড কোয়ার্টার থেকে রাজাকারদের তালিকা ও অতুল চৌধুরীর বাড়িতে স্থাপিত শান্তি কমিটির অফিস থেকে শান্তি কমিটির কর্মকর্তাদের তালিকা এবং দলিলপত্র আমরা সংগ্রহ করলাম। দাদা কোম্পানিস্থ রাজাকার হেড কোয়ার্টারে প্রাপ্ত নগদ চব্বিশ হাজার টাকা ও অন্যান্য প্রাপ্ত জিনিসপত্র পাক দস্যুবাহিনী এবং তাদের অনুচর দালালরা যেসব এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, সেসব এলাকায় আমরা বিতরণ করলাম।

জনাব শামছুল হক চৌধুরী এম.পি.এ, মোজাহার চৌধুরী এম.এন.এ, অন্যান্য এম.পি.এ ও এম.এন.এ এবং আমাদের সার্বিক সহায়তায় জনাব আব্দুল হালিম, দ্বিতীয় অফিসার ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল লতিফ, জিয়াউদ্দিন আহমেদ, মহকুমা খাদ্য কর্মকর্তা কামাল সাহেব, অন্যান্য অফিসার ও কর্মকর্তা সমন্বয়ে বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তুললেন। জনাব শামছুল হক চৌধুরী মূলত কুড়িগ্রাম মহকুমার বেসামরিক প্রশাসনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। এখানে উল্লেখ্য, কুড়িগ্রামে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ই.পি.আর সুবেদার আরব আলী, সুবেদার মোস্তফা এবং সুবেদার শামছুল কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে। আমি সুবেদার শামছুল হককে মঞ্জু মন্ডলের বাড়ি থেকে কোর্ট ভবনে স্থানান্তর করলাম। তারা বেশ কিছু অন্যায় কাজ করার চেষ্টা করলে আমি তাতে বাধা দিয়ে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করি। প্রফেসর হায়দার আলী ও ঠিকাদার তোসাদ্দাক হোসেন এইসব সুবেদারকে অন্যায় কাজ করতে ইন্ধন জোগায়।

ইতিমধ্যে এফ.এফ মতিউর রহমান ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন শিখ সদস্য ভুরুঙ্গামারীর পুবদিকের চৌমাথায় রাস্তার পাশে কথা বলতে বলতে যেই ঘাসের ওপর পা রেখেছে, সাথে সাথে পাকবাহিনীর পুঁতে রাখা একটি এ্যান্টি পার্সোনাল মাইন বিস্ফোরিত হয়ে মতিউর রহমানের ডান পা এবং মিত্র শিখসেনার একটি পা উড়ে যায়।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল কোরের সদস্যরা তাঁদেরকে সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় হাসপাতালে প্রেরণ করেন। এরপর মাইন অপসারণের কাজে নিয়োজিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা দ্রুত সেইসব মাইন অপসারণ করেন।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সদস্যরা লালমনিরহাট বরাবর তিস্তা নদী অতিক্রম করে হারাগাছ দিয়ে, তিস্তায় তিস্তা নদী অতিক্রম করে কাউনিয়া এবং মাহিগঞ্জ দিয়ে রংপুরে দস্যু পাকিস্তানী বাহিনীকে অবরোধ করে ফেলে। অন্যদিকে জলঢাকা, ডোমার, ডিমলা হয়ে নীলফামারী ও সৈয়দপুর এবং অপর দল পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর হয়ে নীলফামারী ও সৈয়দপুর উদ্ধারশেষে রংপুর অবরোধ করে। একটি দল হিলি থেকে পীরগঞ্জ দিয়ে রংপুর অবরোধ এবং অপর দল হিলি থেকে পলাশবাড়ির ভেতর দিয়ে গাইবান্ধা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গাইবান্ধা ও ফুলছড়ি ঘাট উদ্ধার করে। এভাবে অবরোধ সৃষ্টি করে রংপুর থেকে নরপশু পাকিস্তানী দস্যুদের পলায়নের সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হলো। এছাড়া আসাম এলাকা থেকে ব্রহ্মপুত্র নদী অতিক্রম করে মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্র বাহিনী বাহাদুরাবাদ দিয়ে জামালপুর ও ময়মনসিংহ অভিমুখে অগ্রসর হয়।

৬ ডিসেম্বর একটি অনন্য দিন

৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলার ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক অনন্য দিন হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতীয় পার্লামেন্ট সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে ঐতিহাসিক অনুমোদন দানের পর এইদিন আমাদের তথা বাঙালি জাতির অকৃত্রিম বন্ধু, কোটি বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়–দাত্রী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে তাঁর সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারসহ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করলেন। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ভাষণে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললেন, "এই নতুন রাষ্ট্রের যিনি জনক এবং প্রতিষ্ঠাতা, বর্তমান মুহূর্তে আমাদের সমস্ত ভাবনা তাঁকেই কেন্দ্র করে।"

যে সময় আমরা তিস্তা পুলে অবস্থান নিয়ে কুড়িগ্রাম মহকুমার বিস্তীর্ণ মুক্ত এলাকায় বেসামরিক প্রশাসন গঠন এবং নানা সমস্যা–জর্জরিত কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তখন অর্থাৎ ২ ডিসেম্বর ভুরুঙ্গামারী থেকে বি.এল.এফ সদস্য আব্দুল খালেককে ভারতের সাহেবগঞ্জে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন নওয়াজিশের নির্দেশে ই.পি.আর সদস্যরা সাহেবগঞ্জে নিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ ও কয়েকজন ই.পি.আর সদস্য খালেককে একদিন আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন চালায় এবং অস্ত্র রেখে ছেড়ে দেয়। বি.এল.এফ সদস্যরা কোন সংঘর্ষে না জড়িয়ে আমার কাছে সংবাদ প্রেরণ করে। আমি ভুরুঙ্গামারী এসে এই ঐতিহাসিক ৬ ডিসেম্বরে খালেককে সাথে নিয়ে সকাল আটটায় সাহেবগঞ্জে ক্যাপ্টেন নওয়াজিশের ঘাঁটিতে গেলাম। ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ আমাকে দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। আমি তাঁকে শান্ত হয়ে ভালভাবে কথা বলার জন্য অনুরোধ করলাম। এতে তিনি আরো বেশি ক্ষেপে

গেলেন। এক পর্যায়ে আমাকে গুলি করার জন্য রিভলবারে হাত দেয়ার সাথে সাথে আমিও তড়িৎ গতিতে আমার রিভলবার নওয়াজিশের বুক বরাবর তাক করে ধরলাম। এই অবস্থায় সুবেদার মালেক চৌধুরী, শহীদ মোখতার এলাহীর বড় ভাই নেভীর সদস্য মঞ্জুর এলাহী এবং অন্যান্য ই.পি.আর সদস্য ছুটে এসে আমার ও নওয়াজিশের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে তিরস্কার করতে থাকেন। এ সময় এস.এস.বি ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসার এসে এই অপ্রীতিকর, অবাঞ্ছিত ঘটনা সৃষ্টি করার জন্য ক্যাপ্টেন নওয়াজিশকে আরো এক চোট তিরস্কার করলেন। আর একটু হলেই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হতো। অবশেষে ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী ও ই.পি.আর সদস্যদের মধ্যস্থতায় ঘটনার নিষ্পত্তি হলো। খালেকের কাছ থেকে নেয়া অস্ত্র ফেরত নিয়ে আমি ভুরুঙ্গামারী হয়ে কুড়িগ্রাম ফিরে এলাম। সাহেবগঞ্জ থেকে চলে আসার সময় ক্যাপ্টেন নওয়াজিশের আচরণে বোঝা গেল এই অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য তিনি অনুতপ্ত এবং মানসিক অনুশোচনায় ভুগছেন।

১৪ ডিসেম্বর হত্যার কালো তারিখ

নিজেদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ভেবে বাঙালি জাতিকে শিক্ষা-সাংস্কৃতিক দিক থেকে পঙ্গু করে দেয়ার জন্য পাকিস্তানের সামরিক জান্তা এবং এদেশের ঘৃণ্যতম আলবদর-আল শামস বাহিনী ও ইসলামের নামে অনৈসলামের ধ্বজাধারী স্বাধীনতা-বিরোধী শত্রুরা স্বাধীনতার সপক্ষের সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করার নীল নকশা প্রণয়ন করে। এই নীল নকশা অনুযায়ী আলবদর-আল শামস বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে হত্যা করতে থাকে। ১৪ ডিসেম্বর রাতে এই নরপশু শয়তান বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের দ্রুত হত্যা করার জন্য তাদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে হাত-পা-চোখ বেঁধে রায়ের বাজার, মিরপুর ও অন্যান্য বধ্যভূমিতে হত্যা করে। এই মরণজয়ী বাংলার কৃতী সন্তানদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, ডঃ সন্তোষ গুপ্ত, ডঃ খায়ের, ডঃ রশিদুল হাসান, ডাঃ ফজলে রাব্বি, শহীদুল্লা কায়সার, ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, আলতাফ মাহমুদ প্রমুখ বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী। বাঙালির ইতিহাসে যোগ হলো আর একটি নৃশংসতম শোকাবহ দিন ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বর।

১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস

চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, যশোর, কুমিল্লা, রংপুর এবং ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী পাকিস্তানী শত্রু বাহিনীকে অবরোধ ও কোণঠাসা করে রেখেছে। শয়তানদের খাদ্যসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে। এমন সময় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বন্ধু চীন, সৌদী আরব, আমেরিকা জাতিও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নতুন কৌশল বিস্তার করে। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী অপপ্রচারে মেতে ওঠে তারা এবং হানাদার শত্রু বাহিনীকে সাহায্য ও উদ্ধার করার জন্য আমেরিকা তার সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শোষিত মানুষের বন্ধু ও আমাদের

স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থক এবং সক্রিয় সাহায্যদাতা বিশ্বের অন্যতম প্রধান মহাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূরভিসন্ধি বানচাল করে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য তার ২০তম নৌবহর প্রেরণ করে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর ওপর আঘাত হানা ও পাকিস্তানী শত্রু বাহিনীকে সরাসরি সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এর আগে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে পাকিস্তানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া পর পর তিনবার ভেটো প্রয়োগ করে জোরালোভাবে মুক্তিকামী বাঙালি জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন জানায়।

এমনি এক সন্ধিক্ষণে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনীর ঘৃণ্য অধিনায়ক লেঃ জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী বাহিনীসহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, সেই জায়াগায় মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর যৌথ অধিনায়ক যথাক্রমে জেনারেল অরোরা ও মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান অধিনায়ক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

পাকিস্তানী বাহিনীর এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে টাঙ্গাইলের মুক্তিযোদ্ধা অধিনায়ক কাদের সিদ্দিকীও উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্তানী শত্রু বাহিনীর আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়ে আমরা রক্তলাল বিজয় ছিনিয়ে আনলাম। বর্বর পাকবাহিনীর নৃশংস অত্যাচার ও নির্যাতন এবং বাঙালি জাতির ওপর চেপে বসা চব্বিশ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের অবসান হলো। প্রতিষ্ঠিত হলো ঐতিহ্যবাহী গর্বিত স্বাধীন বাঙালি জাতি। বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম নিলো স্বাধীন একটি দেশ, সার্বভৌম বাংলাদেশ।

হানাদার পাকবাহিনী ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ ঢাকায় করলেও রংপুরে তারা মিত্র বাহিনীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আত্মসমর্পণ করে ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর। রংপুর ডিসি অফিসে আমাদের সেক্টর ও সাব-সেক্টর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করা হলো। পাক হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে দখল করা জীপ, ট্রাক, মর্টারগান, ট্যাঙ্ক ও কামানসহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ডিসি অফিস সংলগ্ন কালেক্টরেট মাঠে জমা করা হলো। সেক্টর কমান্ডার এম. কে. বাশার রংপুর ওয়াপদা রেস্ট হাউসে, ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ, ক্যাপ্টেন দেলোয়ার ও অন্যান্য অফিসার রংপুর এবং ক্যাপ্টেন নজরুল হক, লেঃ মতিউর রহমান, ফ্লাইট অফিসার ইকবাল রশিদ নীলফামারীতে এবং সুবেদার বোরহান লালমনিরহাটে অবস্থান গ্রহণ করেন। ই.পি.আর সুবেদার আরব আলী, সুবেদার শামছুল হক, সুবেদার মজাহার হোসেনসহ আমি কুড়িগ্রামে অবস্থান গ্রহণ করলাম এবং কুড়িগ্রাম মহকুমার সর্বত্র বেসামরিক প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা গ্রহণ করলাম। এ সময় আমাকে কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলো। ফলে ই.পি.আর সুবেদারদের সাথে আমার ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় সংঘর্ষের সূত্রপাত হতে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় সমূহ বিপদ বুঝতে পেরে সুবেদার আরব আলী, সুবেদার শামছুল হক প্রমুখ সুবেদার তাঁদের লোকজন নিয়ে কুড়িগ্রাম ছেড়ে লালমনিরহাট ও রংপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যাদেরকে নিয়ে প্রথমে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিলাম, মুক্তিযুদ্ধের সেই সাথী সাবেক ই.পি.আর সদস্যরা হঠাৎ কুড়িগ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই

বিষাদ অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল, যেন জন্মের সাথী ভাই আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেল।

পঁচিশ

রংপুর সেক্টর হেড কোয়ার্টারে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে আমাকে কয়েকবার রংপুর যেতে হয়েছে। ছোট ভাই আলমের খোঁজ তখন পর্যন্ত পাইনি। তার খোঁজে কয়েকবার নীলফামারী এবং পার্শ্ববর্তী নটকখানায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে রওশনকে সাথে নিয়ে গিয়েছি, যদি আলমের কোন খোঁজ পাওয়া যায় এই আশায়। কিন্তু ওর কোন খবর পাওয়া গেল না। এদিকে ব্যস্ততার জন্য বাড়িতে বাবা-মা'র কাছেও যেতে পারিনি। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, আলম বেঁচে নেই। আলমের সর্বশেষ খোঁজ নেয়ার জন্য '৭১-এর ২৭ ডিসেম্বর ভারতের শিলিগুড়ির পার্শ্ববর্তী এলাকা বাগডোগরা মিলিটারি হাসপাতালে আমি গেলাম। হাসপাতাল অফিসের কাগজপত্র দেখে কোন খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হলো না। কেবল রেজিষ্টারের এক জায়গায় একটা নাম দেখতে পেলাম--আলমগীর। এরপর কি হয়েছে, ওকে কোথায় প্রেরণ করা হয়েছে, তার কোন উল্লেখ নেই।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর দু'জন অফিসারসহ আমি হাসপাতালের প্রতিটি ওয়ার্ড ঘুরে ঘুরে আলমের খোঁজ করছিলাম। যুদ্ধে আহত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ড পূর্ণ। আহতরা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। একটি ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় একজন আহত ভারতীয় সৈন্য আমাকে দেখে হাতের ইশারায় যন্ত্রণাকাতর স্বরে তাঁর কাছে ডাকলেন। আহত সৈনিকটির কোমর থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত ব্যান্ডেজ করা। তিনি অর্ধশোয়া অবস্থায় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। আমি তাঁর কাছে যেতেই অত্যন্ত যন্ত্রণাকাতর মুখে কিঞ্চিৎ হাসি টেনে বললেন, "ভাই আপ মুক্তি ফৌজ হ্যায়?" আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠেই খুব কষ্টে আনন্দের রেশ টেনে বললেন, "আপকা জয়বাংলা দেশ আজাদ হোগিয়া না?" অপ্রত্যাশিতভাবে জীবনের এমনি এক পরম মুহূর্তে আমার মুখ থেকে কোন কথা বের হচ্ছিল না। আমার দু'চোখ দিয়ে কেবল পানি গড়িয়ে পড়ছিল। কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চোখের জল মুছে এই অকৃত্রিম যোদ্ধা বন্ধুর একটি হাত আমার দু'হাতের মধ্যে চেপে ধরে থাকলাম। তাকিয়ে দেখি আমাদের দেশের জন্য আহত এই বন্ধু যন্ত্রণায় চোখ বন্ধ করে রয়েছে। আমি তাঁর হাতে চুমু দিয়ে দ্রুত ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

হাসপাতালের কোন ওয়ার্ডে আলমকে পেলাম না। বিভিন্ন ওয়ার্ডে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের দেখলাম। পরিচিত কয়েকজনসহ অনেকের সাথে কথা বললাম। হাসপাতালে তাঁদের সুচিকিৎসা হচ্ছে। যত্নের কোন ত্রুটি নেই। আহত সাথী মুক্তিযোদ্ধারা, যারা প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে, তারা হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওরা জন্মভূমিতে ফিরে

নিজেদের রক্তের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনা স্বাধীন বাংলাদেশের চেহারা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। আলমের খোঁজ কেউই দিতে পারলো না। বিফল মনোরথ হয়ে হাসপাতাল থেকে চলে এলাম। কিন্তু এস.এস.বি সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত শিলিগুড়িতে আমাকে থাকতে হলো। জানতে পারলাম এই দিন সকাল দশটায় শিলিগুড়ি অথবা জলপাইগুড়িতে বি.এল.এফ আঞ্চলিক প্রধান সিরাজুল আলম খান আমাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হবেন। কিন্তু শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়িতে কাউকে পাওয়া গেল না। শিলিগুড়ি এস.এস.বি অফিস থেকে আমাদেরকে জানানো হলো, সিরাজুল আলম খান ও অন্যরা সড়কপথে ঢাকা চলে গেছেন।

আমি নিশ্চিত হলাম, আলম বেঁচে নেই, শহীদ হয়েছে। তাই ওর শহীদ হওয়ার সংবাদ বাড়িতে বাবা-মা'র কাছে প্রেরণ করলাম। এ সময় আমার পক্ষে বাড়িতে আব্বা-আম্মার কাছে যাওয়া সম্ভব হলো না। পাকিস্তানী জল্লাদ ইয়াহিয়া চক্রের ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাগ্যে কি ঘটেছে তার কিছুই জানা যাচ্ছে না। এ নিয়ে আমরা আতঙ্কিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। ৮ জানুয়ারি হঠাৎ করে জানা গেল, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের লায়ালপুর বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেয়ে সরাসরি লন্ডনে পৌঁছেছেন এবং ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলার মাটিতে ফিরে আসছেন। এই সংবাদ জানার পর আমাদের সে কী আনন্দ। সব বেদনা শোক আমরা মুহূর্তে ভুলে গেলাম। ৯ জানুয়ারি সারা রাত ঘুমুতে পারলাম না। ১০ জানুয়ারি সকাল আটটায় কুড়িগ্রাম পিটিআই ঘাঁটিতে গেলাম। এ সময় উল্লাসে এল.এম.জি. থেকে ছোঁড়া একটি ব্রাশ ফায়ার আমার মাথার কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে চলে গেল। যে মুক্তিযোদ্ধা গুলি ছুঁড়ছিল, সে হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সোজা রেডিও'র কাছে গেলাম। বঙ্গবন্ধু তখনও স্বাধীন বাংলার রাজধানী ঢাকায় পদার্পণ করেননি। শহরের প্রত্যেকটি দোকান, বাড়িতে এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটিগুলোতে রেডিও'র সামনে প্রচন্ড ভিড়। উৎসুক অধীর আগ্রহে প্রত্যেকে অপেক্ষা করছে সংবাদ শোনার জন্য, বঙ্গবন্ধু কখন ঢাকায় অবতরণ করবেন। সেই প্রতীক্ষার অবসান হলো, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত মহান নেতা বঙ্গবন্ধু তাঁর চিরস্বপ্নের স্বাধীন বাংলায় ফিরে এলেন। ৯ জানুয়ারি সারা রাত এবং ১০ জানুয়ারি সারাদিন আনন্দ উল্লাস করা হলো।

ছাব্বিশ

যেসব মুক্তিযোদ্ধা বাড়িতে ফিরে যেতে ইচ্ছুক তাঁদের অস্ত্র জমা নিয়ে রিলিজ করা হলো এবং মিলিশিয়া ক্যাম্প গঠন করে বাকি মুক্তিযোদ্ধাদের সেখানে নেয়া হলো। ইতিমধ্যে লক্ষ্ণৌ, রামগড়, ব্যারাকপুর ইত্যাদি ভারতীয় সামরিক হাসপাতাল থেকে চিকিৎসাশেষে যশোর এবং নীলফামারী হয়ে আলম বাড়িতে ফিরে এলো।

জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জনাব শামছুল হক চৌধুরী এম.পি.এ–এর মধ্যস্থতায় রিয়াজউদ্দিন আহমেদ ভোলা মিঞা সপরিবারে আসামের ধুবুরীস্থ তাঁর শ্বশুর বাড়ি থেকে সোনাহাট সীমান্ত দিয়ে কুড়িগ্রাম এলেন। এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে রংপুর সেক্টর হেড কোয়ার্টারে আহূত আমাদের এক সভায় অংশগ্রহণের জন্য কুড়িগ্রাম থেকে রংপুর গেলাম। এসময় রংপুরে এম.পি.এ, এম.এন. এ–সহ রাজনৈতিক ও সরকারি কর্মকর্তাদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুড়িগ্রাম থেকে সর্বজনাব শামছুল হক চৌধুরী এম.পি.এ, রিয়াজউদ্দিন আহমেদ ভোলা মিঞা এম.এন.এ, আওয়ামী লীগের নবাব আলী চৌধুরী ও আহমেদ হোসেন মোক্তার প্রমুখ নেতা রংপুর আসেন। সভাশেষে বিকেলে রংপুর ডিসি অফিস থেকে বের হচ্ছিলাম, এমন সময় ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ আহমেদ আমাকে জড়িয়ে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর ইতিপূর্বের অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং আমাকে ঐসব ভুলে যেতে অনুরোধ করলেন। তিনি জানালেন, প্রফেসর হায়দার ও ঠিকাদার তোসাদ্দেক হোসেন তাঁকে মিস্‌গাইড করেছে।

রংপুরে সভা চলাকালে আমাকে সংবাদ দেয়া হলো, আগামী ৩১ জানুয়ারি ঢাকা স্টেডিয়ামে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে বি.এল.এফ সদস্যদের যাবতীয় অস্ত্র জমা দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু নিজে এই অস্ত্র গ্রহণ করবেন। সে জন্য ৩০ জানুয়ারির আগেই সমস্ত অস্ত্রসহ বি.এল.এফ কর্মকর্তা ও সদস্যদের ঢাকায় পৌছুতে হবে।

কুড়িগ্রাম মহকুমার সকল বি.এল.এফ সদস্যকে ঢাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য মহকুমা প্রশাসকের দপ্তর থেকে লালমনিরহাট রেল কর্তৃপক্ষকে ৫টি রেলগাড়ির কামরা সংরক্ষণের জন্য পত্র দেয়া হলো। পাকবাহিনীর সদস্যরা তিস্তা পুল ভেঙে ফেলেছিল। তাই নদী পারাপারের জন্য নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত ড্রামের ভেলার ওপর বাঁশের চাটাই বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। এর ওপর দিয়ে এখন জীপ, মোটর সাইকেল, সাইকেল, গরু গাড়ি ইত্যাদি পার হতে পারে। শীত মৌসুম বলে নদী শীর্ণ ও পানি কম থাকাতে সুবিধা ছিল। তিস্তা পুলের কাছে ট্রেন থেকে নেমে আমরা নদীর ঢালে নেমেছি, এমন সময় ক্যাপ্টেন নওয়াজিশকে দেখতে পেলাম। তিনি লালমনিরহাট যাওয়ার জন্য জীপে করে রংপুর থেকে আসছিলেন। এই অবস্থায় হঠাৎ করে একটি নাটকীয় ঘটনার অবতারণা হলো। দেখলাম, খালেক, মোজাম্মেল ও এনামুলদের একটি দল জীপ থামিয়ে নওয়াজিশের ওপর গুলি চালানোর জন্য উদ্যত হয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে আমি দ্রুত এনামুলদের বাধা দিয়ে নিবৃত্ত করলাম।

পাকিস্তানী সৈন্যরা যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে বলে বেশ বিলম্বে ফুলছড়ি ঘাট থেকে ফেরীতে নদী পার হয়ে অনেক কষ্টে ২৯ ডিসেম্বর সকালে ঢাকার কমলাপুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলাম। আগেই জানতে পেরেছি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির আহসানউল্যা হলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা রিক্‌শা ভাড়া ঠিক করছিলাম। কিন্তু কোন রিক্‌শাওয়ালা ভাড়া নিতে রাজি হচ্ছিল না। বিনা ভাড়ায় আমাদেরকে পৌছে দিবে আমরা মুক্তিযোদ্ধা বলে। তারা বলছিল, "আপনারা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন, জীবন দিতে গেছেন, একটি বার বিনা পয়সায়

আপনাদেরকে রিক্শায় ওঠাতে পারবো না? আমাদের রিক্শায় আপনাদের ওঠাতে পারলে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করবো।" অনেক লোকজন আমাদের ঘিরে রয়েছে। অনেকেই বিভিন্ন অস্ত্র সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে। কেউ কেউ জানতে চাইলেন, আমরা মিরপুর যাচ্ছি কি না? মিরপুর যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তারা বললেন, পাকবাহিনী ও আলবদর রাজাকারদের হাতে অপহৃত শহীদুল্লা কায়সারের খোঁজে তাঁর ছোট ভাই জহির রায়হান মিরপুর গেছেন। সেখান থেকে তিনি নিখোঁজ হয়েছেন, তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। মুক্তিযোদ্ধারা মিরপুর ঘিরে রেখেছে। মিরপুরে বিহারিদের মধ্যে পালিয়ে থাকা পাকবাহিনী এবং বিহারিদের গুলিতে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছে। যাহোক, আমরা আহসানউল্যা হলে এসে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে, শেষে জোর করেই প্রত্যেক রিক্শাওয়ালাকে একটাকা হিসেবে ভাড়া দিয়ে বললাম, আমাদের এই সম্মান দেয়ার জন্য আমরা গর্বিত। সেই সাথে তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম।

৩১ জানুয়ারি সকাল ন'টার মধ্যে আমরা স্টেডিয়ামের ভেতর ঢুকলাম এবং আমাদের অস্ত্র জেলাওয়ারী সার বেঁধে সাজিয়ে আমরা, মহকুমা কমান্ডার ও জেলা কমান্ডাররা নিজ নিজ সারির সামনে দাঁড়ালাম। স্টেডিয়ামের ভেতরে এবং বাইরে লক্ষ জনতার ভিড়। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। আনন্দে উদ্বেলিত মুক্তিযোদ্ধারা মুহুর্মুহু গুলি ফোটাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু সকাল দশটায় স্টেডিয়ামের ভেতরে দক্ষিণ পাশে সাজানো মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। বি.এল.এফ প্রধান যথাক্রমে শেখ ফজলুল হক মণি, আব্দুল রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, সিরাজুল আলম খান ও শ্রমিক লীগের আব্দুল মান্নান একে একে বঙ্গবন্ধুর হাতে এস.এম.জি তুলে দিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করলেন। বঙ্গবন্ধু মঞ্চ থেকে ধীরপদে আমাদের সারির সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন আর আমাদের গায়ে হাত বুলিয়ে কুশল জানতে চাইলেন।

আমাদের জীবন-মরণের সাথী, যারা আমাদের হাতের স্পর্শে কথা বলতো, ব্যূহ ভেদ করে সবকিছু নিস্তব্ধ করে দিত, সেই অকৃত্রিম বন্ধু, প্রাণের সাথী অস্ত্রগুলো ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল। বেদনায় বুকের পাঁজর যেন ভেঙে যাচ্ছিল। স্টেডিয়াম থেকে বের হওয়ার পথে সার বেঁধে রাখা অস্ত্রগুলোর দিকে বার বার পেছন ফিরে দেখছিলাম। ওরাও যেন বেদনায় জর্জরিত। মনে হচ্ছিল, অনেক কষ্টে ওরা মুখ থুবড়ে, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সাতাশ

মুক্তিযোদ্ধাদের মিলিশিয়া ক্যাম্প ভেঙে দিয়ে তাদের বাড়িতে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ পেলাম। এর আগে আমাদের সকল অস্ত্র জমা নেয়া হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের ভুখা-নাঙ্গা অবস্থায় এবং বিনা বস্ত্রে অসহায়ের মত তাদের নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে হলো। বিদায় দেয়ার সময় আমরা পরস্পর ডুকরে কাঁদছিলাম। একজন আর একজনকে জড়িয়ে

ধরে কাঁদছিল। আর অপলক দৃষ্টিতে এদিক–ওদিক তাকিয়ে দেখছিল। কোথায় যাবে, কি করবে, কি ভবিষ্যৎ আমাদের? শক্ত হাতে অস্ত্র চালিয়ে শত্রুকে নিধন করেছি আমরা, হাসিমুখে জীবন দিতে পিছপা হইনি, সাথীকে হারিয়ে চোখের পানি না ফেলে কঠিন হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, আজ দেশ শত্রুমুক্ত করে, স্বাধীনতার জয়গান গেয়ে আমরা অসহায় বোধ করছি, চোখের পানি ফেলছি। ছাত্র–কৃষক–শ্রমিক আর বাংলা মায়ের দামাল ছেলেদের কথা আমাদের কমান্ডার অধিনায়ক সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা ভাবলেন না। সাতজন বীর শ্রেষ্ঠ'র মাঝে প্রতিনিধি হিসেবে এই দামালদের একজনকেও স্থান দেয়া হলো না। তারা তাদের যোগ্য স্বীকৃতি পেলো না। এ ক্ষোভ কোথায় রাখি? শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতৃবর্গও আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ভুলে বসলেন। সব কিছুই আমরা মুখ বুজে মেনে নিলাম। বিদ্রোহ করলাম না! কী অপূর্ব আমাদের দেশপ্রেম! এ যেনো এক বিরল ঐতিহাসিক ঘটনা।

আমার সাথীকে, ভাইকে, পিতাকে যারা হত্যা করলো, আগুন জ্বালিয়ে ছারখার করলো গ্রামের পর গ্রাম, মহল্লার পর মহল্লা, নির্বিচারে নির্মম পৈশাচিকতার সঙ্গে হত্যা করলো বাংলার অযুত সন্তানদের, আমার বোনের–মায়ের ইজ্জত নিয়ে দীর্ঘদিন যারা পাশবিক অত্যাচার চালালো, গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর, মহল্লার পর মহল্লা লুটপাট করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুললো, সেই স্বাধীনতা–বিরোধীরা বাঙালির চির শত্রুরা পেলো অপার ক্ষমা। তাদেরকে ক্ষমা করা হলো। আমরা, মুক্তিযোদ্ধারা এইসব ঘাতক নরপশু আর ঘাতক পাক হানাদার বাহিনী, রাজাকার, আলবদর ও আল–শামস সদস্যদের বাংলার মাটি থেকে নির্মূল করতে পারলাম না। আর সেই বিচার করতে না পারায় অক্ষমতা থেকেই ওইসব দানবের দানবীয় গ্রাস আজ স্বাধীনতার ১৯ বছর পরেও আমাদের গিলে ফেলতে উদ্যত! এরই পরিণতিতে ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট রাতে আমাদের মধ্যেই ঘাপটি মেরে থাকা ক্ষমাপ্রাপ্ত স্বাধীনতার শত্রুরা বাঙালি জাতি ও বাংলার স্বাধীনতার শত্রু আমেরিকা, চীন, পাকিস্তান ও সৌদী চক্র গভীর ষড়যন্ত্র করে বাঙালির মহান নেতা, স্বাধীনতার স্থপতি, শ্রেষ্ঠতম বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে হত্যা করলো। নির্মমভাবে হত্যা করলো শিশু রাসেলসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের। ৩ নভেম্বর পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়ে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার চার নেতা, সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মনসুর আলী ও কামারুজ্জামানকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করা হলো।

বাঙালি জাতির প্রাণপ্রিয় মরণজয়ী ধ্বনি "জয় বাংলা" মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যুগিয়েছে শত্রুকে আঘাত হানার অসীম সাহস, শত অত্যাচার, পৈশাচিক শারীরিক নির্যাতন, দেহ থেকে অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করার পরও বর্বর নরপশু পাকিস্তানী পিশাচরা মুক্তিযোদ্ধাদের মুখ থেকে কেড়ে নিতে পারেনি যে শ্লোগান, ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্টের কালো রাত্রির পর সেই জীবন বাজি রাখা, হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করা বাঙালির প্রাণপ্রিয় "জয় বাংলা" ধ্বনি স্বাধীন বাংলার মাটি থেকে নির্বাসিত হলো। আর এই ধ্বনির নির্বাসনের ভেতর

দিয়ে বাঙালি জাতির শত্রু, স্বাধীনতার শত্রুদেরকে সমাজে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হলো। এরা এখন বাঙালিদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পরিহাস করে, হত্যাও করে অবলীলায়। '৭১-এর পরাজিত শত্রুরা মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে আমাদের ওপর নিচ্ছে চরমতম প্রতিশোধ।

বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার মন্ত্রকে বুকে লালন করে যুগ যুগ ধরে যে হাজার হাজার বাঙালি নিজের ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দিয়ে দুঃখ-ক্লেশকে বরণ করেছে, কারা-প্রকোষ্ঠে মৃত্যুর প্রহর গুণেছে, শারীরিক নির্যাতনে পঙ্গু হয়ে গেছে, পাগল হয়ে গেছে, জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় কাটিয়েছে কারার অন্তরালে, বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শহরে-বন্দরে, ঘরে ঘরে স্বাধীনতার মহান মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাখ লাখ দামাল ছেলেকে উদ্বুদ্ধ করলো, যাদের স্বল্প সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কাহিনী কিংবদন্তীর মতো আজো বাংলার মানুষের অন্তরে গাঁথা রয়েছে, তাদের নামগুলো কোথায় গেলো? কোন্ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলো? কোথায় সেইসব সাধারণ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস? স্বাধীনতা সংগ্রামের অকুতোভয় যুদ্ধের ইতিহাস কি কেবল সামরিক বাহিনীর মুষ্টিমেয় সদস্যের কৃতিত্বেই ভাস্বর? এই মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিস্তারিত তথ্যসহ নিরপেক্ষ ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে রচিত হলে দেখা যাবে, এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সামরিক বাহিনীর নিয়মিত সদস্যদের আত্মত্যাগের চাইতে বহু ক্ষেত্রেই সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের ঘটনা ও বীরত্বের ঘটনা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর, সেই সাথে দৃষ্টান্তস্থানীয়। আমি মুক্তিযুদ্ধের সেই নিরপেক্ষ ও নির্মোহ ইতিহাস রচনারই আজ জোর দাবি জানাই ইতিহাসবেত্তাদের কাছে। কেননা কোন ঐতিহাসিক ঘটনার নির্মোহ ও নিরপেক্ষ চিত্রায়ন ও বিশ্লেষণ-শূন্যতা একটি জাতির জন্য আত্মঘাতী প্রয়াসেরই শামিল।